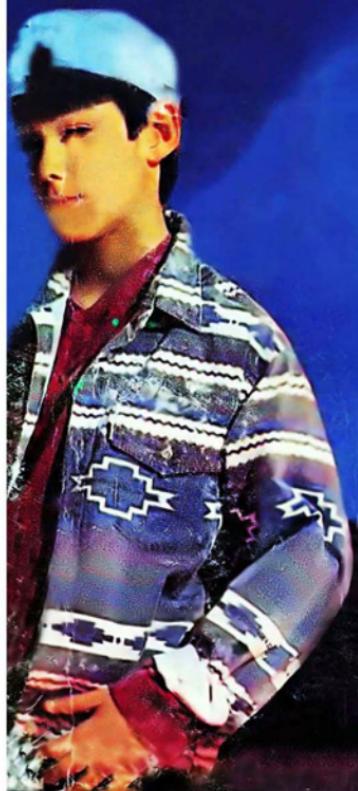
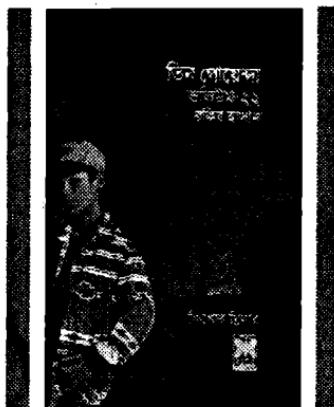


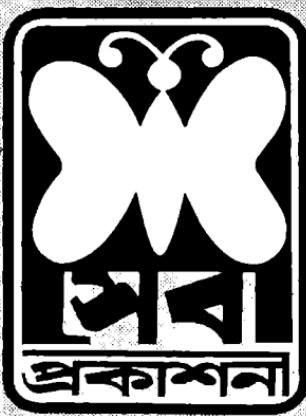
কিশোর প্রিলাই
তিনি গোয়েন্দা
ভলিউম ২২
রাকিব হাসান



ভলিউম-২২
তিন গোয়েন্দা
৭৬, ৭৭, ৭৮
রাকিব হাসান



সেবা প্রকাশনী
২৪/৮ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1288-7



একষটি টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেন্ট্রালগার্ড, ঢাকা ১০০০

সর্বসম্মত: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে

রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেন্ট্রালগার্ড প্রেস

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেন্ট্রালগার্ড, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেন্ট্রালগার্ড, ঢাকা ১০০০

দ্বরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪

মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩

জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক

প্রজাপতি প্রকাশন

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেন্ট্রালগার্ড, ঢাকা ১০০০

শো-কুমু

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-22

TIN GOYENDA SERIES

By: Rakib Hassan

চিঠা নিক্রদেশ ৫-৭২

অভিনয় ৭৩-১৪০

আলোর সঙ্কেত ১৪১-২১৬

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১ (তিন গোয়েন্দা, কক্ষাল ধীপ, ঝুগাণী মাকড়সা)	৬৬/-
তি. গো. ভ. ১/২ (ছায়াশ্বাপন, মিমি, রজন্দানো)	৬৬/-
তি. গো. ভ. ২/১ (প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	
তি. গো. ভ. ২/২ (জলদস্যুর ধীপ-১,২, সবুজ ভূত)	
তি. গো. ভ. ৩/১ (হারানো তিথি, মুভোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২ (কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১ (ছিলতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	
তি. গো. ভ. ৪/২ (জ্বাগন, হারানো উপত্যকা, শুহামানব)	
তি. গো. ভ. ৫ (ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগস্তক, ইন্দ্রজাল)	৫৮/-
তি. গো. ভ. ৬ (মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রঞ্জনোর)	
তি. গো. ভ. ৭ (পুরনো শক্তি, বোবেটে, ভূতডে সুড়ঙ্গ)	
তি. গো. ভ. ৮ (আবার সম্মেলন, ডয়ালগীরি, কালো জাহাজ)	৬০/-
তি. গো. ভ. ৯ (পেটায়, ঘড়ির শোলমাল, কানা বেড়াল)	৬১/-
তি. গো. ভ. ১০ (বাঙ্গাটা প্রয়োজন, বৌজডা গোয়েন্দা, অধৈ সাগর ১)	
তি. গো. ভ. ১১ (অধৈ সাগর ২, বুক্সির খিলিক, গোলাণী মুভো)	৬৫/-
তি. গো. ভ. ১২ (প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৬৩/-
তি. গো. ভ. ১৩ (ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্য)	
তি. গো. ভ. ১৪ (পায়ের ছাপ, তেপস্তর, সিংহের গর্জন)	৭১/-
তি. গো. ভ. ১৫ (পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৬৯/-
তি. গো. ভ. ১৬ (প্রাচীন মৃত্তি, নিশাচর, দক্ষিণের ধীপ)	৭২/-
তি. গো. ভ. ১৭ (ঈশ্বরের অঞ্চল, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৬০/-
তি. গো. ভ. ১৮ (খাবারে বিষ, ওয়ার্যানি বেল, অবাক কাণ্ড)	৬৮/-
তি. গো. ভ. ১৯ (বিমান দুর্ঘটনা, গোরাত্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	
তি. গো. ভ. ২০ (খুন, স্পেনের জাদুকর, বান্দেরের মুখোশ)	
তি. গো. ভ. ২১ (ধসের মেরু, কালো হাত, মৃত্তির হংকার)	৬৮/-
তি. গো. ভ. ২২ (চিঠা নিক্রদেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৬১/-
তি. গো. ভ. ২৩ (পুরানো কালান, গোল কোঢায়, ভাকিমুরো কর্পারেশন)	
তি. গো. ভ. ২৪ (অপারেশন কুকুরবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাভার প্রতিশোধ)	
তি. গো. ভ. ২৫ (জিনার সেই ধীপ, কুকুরথেকে ডাইনী, শুক্তর শিকারী)	৬৫/-
তি. গো. ভ. ২৬ (বামেলা, বিষাক্ত অক্ষিড, সোনার ঘোজে)	
তি. গো. ভ. ২৭ (এতিথাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বলি)	
তি. গো. ভ. ২৮ (ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাস্পায়ারের ধীপ)	৭১/-
তি. গো. ভ. ২৯ (আবেক ক্ষুজ্জনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৫১/-
তি. গো. ভ. ৩০ (নরকের হাজির, ভয়ঙ্কর অসহ্য, গোপন কর্তৃলা)	৫৮/-
তি. গো. ভ. ৩১ (মারাত্মক ভূল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৩২ (প্রেতের ছায়া, মাতি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৩৩ (শয়তন্ত্রের ধারা, পতঙ্গ ব্যবসা, জল নোট)	৬৩/-
তি. গো. ভ. ৩৪ (যুদ্ধ ঘোষণা, ধীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৫৫/-

তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মুক্তাব্দি, তিনি বিচা)	
তি. গো. ভ. ৩৬	(টকর, দক্ষিণ যাজা, প্রেট ক্ষিপনিয়োসো)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ প্রেট ক্ষিপনিয়োসো, নিষ্ঠোজ সংবাদ)	
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, টগবাজি, দীর্ঘির দানো)	
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ডয়, জলদস্যুর মোহর, টাদের ছায়া)	
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশঙ্গ লকেট, প্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৬১/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ হিন্তারই, পিশাচকল্প)	
তি. গো. ভ. ৪২	(এখনেও বায়েলা, দুর্গম কারাগার, ভাকাত সর্দার)	
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার আয়েলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছছবেলা সোয়েলা)	৮১/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসঞ্চান, নিষিঙ্ক এলাকা, জবরদস্থল)	
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিদ্যুল উধাও, টাকার খেলা)	
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রাবৰ বলছি, উকি রহস্য, নেকড়ের তথা)	
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন সি সি সি, যুক্ত্যায়া)	
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শাপদের ঢোক, পোরা ডাইনোসর)	৬১/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মুক্তভৌতি, উপ ফ্রিজ)	
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের অহরো, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	
তি. গো. ভ. ৫১	(পেটার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা হোরা)	
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমাত্তে সংবাদ, মুক্তভূমির আতঙ্ক)	৫১/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, ব্রগদীপ, টাদের পাহাড়)	৮৬/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোজে, বাল্লদেশে তিনি গোয়েলা, টাক রহস্য)	৮৬/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারাইজেন্ট, রাইডারহ্যান্ড, ইলেক্ট্রনিক আতঙ্ক)	৮০/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়লাদ দানব, বাণিরহস্য, ভূতের খেলা)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছাবরহস্য, সুরের মায়া)	৮৬/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের অক্তুনা, মেডেল রহস্য, নিপির ডাক)	৮০/-
তি. গো. ভ. ৬০	(উটকি বাহিনী, প্রাইম প্র্যাক্সেল, উটকি শক্ত)	৮২/-
তি. গো. ভ. ৬১	(টাদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুক্তের খোজে তি. গো.)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভৃত, ঝড়ের বনে, মোমপিস্টেরে জাদুর)	৮০/-
তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রকুলার রক্ত, সরাইখানার ব্যবস্থা, হানিবাড়িতে তিনি গোয়েলা)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৬৪	(যমাপথ, রাতের কার্তুজ, ড্রকুলা-দুশে তিনি গোয়েলা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৫	(বিড়ালের প্রুপগুণ+রহস্যগুণ তিনি গোয়েলা+ক্রেবাউনের কবরে)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৬	(পাখের বন্দু+গোয়েলা মোবাট+ক্লানি পশাচ)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৭	(ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+মাতিহার আতঙ্ক)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৬৮	(টারির দানো+বালি বাহিনী+উৎকি গোয়েলা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৬৯	(পাখের তুঁতখন+দুরী মানব+মুক্তির আতঙ্ক)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৭০	(কাকে পাখ+বিপদের গাঁথ+ছবির জাদা)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭১	(পিলাবুলিমি+রহস্যের সকালে+পিশাচের ধাবা)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭২	(ভিলদী বাজকুমার+সাপের বাসা+বিবেনের ভায়োরি)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৭৩	(পাখের বালের+ক্লেন ডাকতি+ভৃত্য ঘড়ি)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭৪	(কীভাওয়া হৈপের মুয়োখ+মহাকালের কিলোর+ব্রাউসভিলে গজগোল)	৫১/-
তি. গো. ভ. ৭৫	(কালো ডাক+সাই নিরক্ষেপণ+ক্যাটসিলিপ্ট)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৬	(মেঢ়ার মথে তিনি গোয়েলা+প্লেজবাড়ি রহস্য+লিলিপুট-রহস্য)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৭	(চোপ্পাইন গোয়েলা+চায়সকী+পাতাল ঘরে তিনি গোয়েলা)	৫০/-
তি. গো. ভ. ৭৮	(চোপ্পাইন গোয়েলা+সিলেট তিনি গোয়েলা+মায়াশব্র)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭৯	(শুকানো সোনা+পশাচের ঘাটি+হোলুর মানব)	
তি. গো. ভ. ৮০	(শুকেল মানব+অদ্যা রশ্মি+বালু শব্দ+সুমেরুর আতঙ্ক)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৮১	(কীলোপদার অস্তরগ্রে+ভয়াল শব্দ+সুমেরুর আতঙ্ক)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ৮২	(বনদস্যুর ক্বলে+গাড় চোর+পুতুল রহস্য)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ৮৩	(বনিতে বিপদ+গুহা-রহস্য+কিশোরের নোটুকু)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ৮৪	(মৃত্যুহর বশি+বিষাক্ত হোলন+উটকি রাজকুমার)	৪১/-



চিতা নিরুদ্দেশ

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৯৪

এয়ারপোর্ট থেকেই ট্যাক্সি নিল কিশোররা। আবার ইংল্যাণ্ডে বেড়াতে এসেছে ওরা। তিন গোয়েন্দা, জিনা আর রাফিয়ান।

পেছনের সীটে নড়েচড়ে বসল জিনা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ‘কথা বললেই তো আবার বলবে বাচাল। কিন্তু না বলেও পারছি না। আজকে যে আমার কি হলো। আসলে এত খুশি নাগচে কিছুতেই চুপ থাকতে পারছি না। পুরো পনেরো দিন কাটাব বিগ হোলোতে। এ কি যা তা কথা। এতদিন আর কখনও থাকিনি টকারদের বাড়িতে। ওদের লাইটহাউসটা দেখার আমার অনেক দিনের শখ। এবার পারব। ছুটিয়ে দারুণ কাটিবে আমাদের, তাই না? কারণ আংকেলের চিঠিটা পেয়ে তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি তিনি আমাদের দাওয়াত করেছেন। টকারই চাপাচাপি করে এটা করিয়েছে, বুঝলে। ইস্ত, এত আন্তে চলছে কেন গাড়িটা!'

যেন তার কথার সমর্থন জানাতেই ‘ঘাউ’ করে উঠল পাশে বসা রাফি। মাথা দোলাল।

‘কুণ্টাও বাচাল হয়ে গেছে আজকে,’ মুচকি হেসে বলল কিশোর।

অন্য কেউ এমন করে বললে মুহূর্তে রেগে উঠত জিনা। কিন্তু কিশোরের কথায় রাগ করে না। হাসল কেবল।

‘এটাই ভাল,’ জিনার পক্ষ নিল মুসা, ‘বাচাল হওয়া। ছুটিতে এসেছি, চুপ করে থাকব নাকি? তোমার মত সারাক্ষণ গভীর হয়ে থাকব?’

‘গভীর হয়ে আছে কি আর সাধে?’ ফোড়ন কাটল রবিন। ‘ও এখন প্রকৃতি দেখছে। প্রকৃতি প্রেমিক।’

‘দেখছে দেখুক, কে মানা করে? আমাদের কথায় বাধা না দিলেই হলো। এই রবিন, তোমার কি মনে হয়? টকারই তার বাবাকে রাজি করিয়েছে?’

রবিনের আগেই জিনা বলে উঠল, ‘নিশ্চয়। একা একা বাড়িতে থাকতে কত আর ভাল লাগে। আহা, বেচারার মা নেই। বাবা থেকেও নেই। খালি অছেন বই আর গবেষণা নিয়ে। একটা মাত্র ছেলে। তার দিকেও নজর দেয়ার সময় নেই।’

‘টকারকে আমার খুব ভাল লাগে,’ মুসা বলল। প্রায় খাড়া হয়ে উঠে গেছে এখানে পথ। একপাশে পাহাড়ের দেয়াল। একটা মুহূর্ত ‘সেদিকে তাকিয়ে থেকে রাফির দিকে ফিরল সৈ। ‘তোর দোষকে আবার দেখতে পাবি, রাফি। নটিকে।’

‘ঘাউ,’ করে আবার মাথা দোলাল রাফি।

লিটল হোলো ধাম পেরিয়ে এল গাড়ি। নতুন একটা নির্দেশক দেখা গেল। চিড়িয়াখানার দিকে নির্দেশ করছে। আগের বার যখন এসেছিল কিশোররা, এটা

দেখেনি।

বিগ হোলোতে ঢুকল গাড়ি।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল জিনা, ‘ওই যে টকার! গেটের কাছে। নিচয় আমাদের অপেক্ষা করছে।’

‘বানরটা কাঁধেই আছে,’ রবিন বলল।

‘থাকবেই তো। ও কি কাছছাড়া করে নাকি?’

‘না করে না,’ মুসা বলল। ‘তুমি যেমন রাফিকে করতে চাও না।’

গাড়ি দেখেই দরজা খুলে বেরোল টকার। প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। চিংকার করে বলল, ‘এত দেরি যে? সেই কথন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা সব ভাল’ তো?’

ট্যাঙ্কি থেকে নেমে তার সঙ্গে হাত মেলাল সবাই। অন্ত কাণ করল বানরটা। রাফির সঙ্গে হাত মেলাল। ট্যাঙ্কি বিদেয় করে দিয়ে যার যার ব্যাগ-স্যুটকেস হাতে তুলে নিল ওরা। অর্নাল কথা বলছে টকার। অনেক কথা জমা হয়ে আছে পেটে। একবারেই সব উগড়ে দিতে চায়।

বলল, ‘চমকে দেয়ার মত একটা জিনিস আছে,’ চোখে তার মিটিমিটি হাসি।

থমকে দাঁড়াল মুসা, ‘কি জিনিস?’

‘অত অস্ত্রি কেন? চোকোই না আগে গেটের তেতরে।’

তারি গেটটা ফাঁক হয়েই আছে। সবাই টোকার পর সেটা লাগিয়ে দিল টকার। এদিক ওদিক ঘূরতে থাকল গোয়েন্দাদের কৌতুহলী চোখ। কি এমন জিনিস, যেটা দেখলে চমকে যাবে ওরা?

সবার আগে দেখতে পেল রবিন। অশ্ফুট শব্দ করে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটা চাপা গর্জন। বিরাট বড় একটা জানোয়ার বেড়ালের মত রাফিয়ে এসে পড়ল বাগানের রাস্তায়।

‘যাইছে!’ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ‘এ কি?’

‘বলেছিলাম না চমকে যাবে,’ হাসতে হাসতে বলল টকার। বন্ধুদের অবাক হওয়া চোখের দিকে তাকাল একে একে। তারপর বলল, ‘ভয় নেই। টারকজ কামড়াবে না তোমাদের। পোষা। আর্বার এক বন্ধু আছেন, শিকারী। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোরও তার খুব নেশা। আফ্রিকায় সাফারিতে গিয়েছিলেন। সেখানেই একটা মরা বাঘনীর পাশে মিউ মিউ করছিল চিতার বাচ্চাটা। তুলে নিয়ে এসে পেলেপুষে বড় করেছেন। আবার চলে গেছেন দক্ষিণ আমেরিকায়। অনেক দিন থাকবেন। টারকজকে উপহার দিয়ে গেছেন আমাদের। খুব ভাল পাহারা দিতে পারে সে। কুকুরের চেয়ে কম না। এই টারকজ, আয়, এদিকে আয়।’

জিনার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে রাফিয়ান। সবার চোখ জানোয়ারটার দিকে। চিতাবাঘের মত হলদে চামড়া, তাতে কালো কালো ফুটকি।

‘চিতাবাঘ অর্থাৎ লেপোর্ড নয় এটা, চিতা,’ সঙ্গীদের বুঝিয়ে বলল রবিন। ‘দেখতে বেড়ালের মত হলে হবে কি, ও আসলে কুকুর গোষ্ঠীর প্রাণী। ফলে শুভাবতই কুকুরের মত আচরণ করে।’

‘কারও ক্ষতি করে না ও,’ টকার বলল। ‘কেউ ওর সঙ্গে লাগতে না এলে কিংবা চুরি করতে বাড়িতে না চুকলে ও কাউকে কিছু বলে না। রাফি, কি বলিস? তোর পছন্দ হয়েছে? ভয়ের কিছু নেই, বোকা ছেলে।’

খুব অবাক হয়েছে রাফি। সলিহান চোখে দেখেছে চিতাটাকে। কিন্তু নটি যখন নির্ভয়ে গিয়ে জানোয়ারটার কাঁধে চড়ে বসল, ওটাও তাকে কিছু করল না, তখন সাহস পেল। কয়েক পা এগিয়ে গেল। টারকজও তার দিকে এগোল কয়েক কদম। দীর্ঘ একটা মৃহৃত যেন টান টান হয়ে রাইল উজেজনা। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। তারপর ঠিক একই সময়ে দুজনে দুজনের দিকে গলা বাড়িয়ে শুক্তে শুক্ত করল।

‘ঘাউ! আন্তরিক ভঙ্গিতে প্রথম কথা বলল রাফি।

ঘরঘর আওয়াজ বেরোল টারকজের গলা থেকে।

নটি বুরুল কুকুরটার সঙ্গে চিতাটার ভাব হয়ে গেছে। টারকজের পিঠ থেকে এক লাফে মাটিতে নেমে মানুষের মত করে হাততালি দিল। আনন্দে ডিগবাজি খেলো করেক্বার।

হাসিতে ফেটে পড়ল জিনা। সবাই যোগ দিল তার সঙ্গে। টারকজকে আর সামান্যতম ডয় পাছ্ছ না কেউ।

বাগানে হটগোল শনে রান্নাঘর থেকে বেরোল প্রফেসর কারসওয়েলের হাউসকীপার ডোরা। মোটাসোটা, খাটো, মাঝবয়েসী মহিলা একসময় সুন্দরী ছিল বোঝা যায়। টকারকে খুব ভালবাসে। তিন গোয়েন্দা আর জিনাকে দেখে হেসে বলল, ‘ও মা, এসে গেছ! এসো এসো। কেমন আছ?’

‘ভাল,’ জানাল গোয়েন্দারা।

‘টারকজ তোমাদের ডয় দেখিয়েছে? ভয়ের কিছু নেই। ও খুব ভাল মানুষ। থাকলেই বুঝাবে। বেড়াল ছানার মতই গায়ে গা ঘষতে আসে।’

আরও কয়েকটা সাধারণ কথার পর ‘নাস্তা রেডি’ এই খবরটা দিল ডোরা। কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধূয়ে তৈরি হয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে আসার কথা বলে আবার চলে গেল ঘরের দিকে।

বস্তুদেরকে বাবার ঘরে নিয়ে এল টকার।

গভীর মনযোগে কাজ করছেন প্রফেসর। কোন দিকে খেয়াল নেই।

‘আব্বা, ওরা এসেছে,’ টকার বলল।

‘কারা? আমি তো কাউকে আসতে বলিনি,’ মুখ ফেরালেন না বিজ্ঞানী।

‘নিশ্চয় বলেছ। লিখিত ভাবে বলেছ। একেবারে চিঠি লিখে। ভুলে গেছ? জিনা আর কিশোরদেরকে আসতে বলোনি তুমি?’

কিশোর বলল, ‘গুড মরনিং, আংকেল।’

এতক্ষণে মুখ ফেরালেন কারসওয়েল। ‘আরি, কিশোর যে! জিনা তুমিও আছ! তোমার আব্বা কেমন আছে? নতুন আর কিছু অ্যুবিক্ষার করতে পারল? ওকে গিয়ে বলো, এসে যেন দেখা করে আমার সঙ্গে...’

জিনা জবাব দেবার আগেই টকার বলল, ‘এমন ভঙ্গিতে বলছ, যেন পাশের

গায়েই থাকেন পারকার আংকেল। তিনি তো আছেন আমেরিকায়...'

'তাই তো, তাই তো,' আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন প্রফেসর।
আবার কাজে মন দিলেন তিনি।

'ওরা এখানে থাকতে এসেছে, আব্বা। চিঠি লিখে তুমিই আসতে বলেছ।
পনেরো দিন থাকবে। তুমি সব ভুলে বসে আছ।'

'থাকবে, তাই না? তা থাকুক না। আমাকে বিরক্ত না করলেই হলো। এক
মাস থাকুক, দুই মাস থাকুক, যত দিন খুশি থাকুক।... তুই জানালার সামনে
দাঁড়ালি কেন? কিছু তো দেখতে পাওয়া না। কুত্তাটাকে সরা। চিতাটা গেল
কোথায়? বল না, এসে এটাকে তাড়িয়ে দিক। কুত্তার গায়ে উকুন থাকে।... খালি
এসে বিরক্ত করিস! কোন কাজ করতি দিস না!...'

'ওকে কুস্তা বলছ কেন আব্বা? ও তো আমাদের রাফি, জিনার কুকুর...'

'ও তাই নাকি? তা ঠিক আছে, তাড়াতে হবে না। কিন্তু রাফি হলেও কুকুর
তো, উকুন থাকবেই... যা খেলতে যা। আমাকে কাজ করতে দে।' আবার দিন-
দুনিয়া ভুলে গেলেন প্রফেসর।

তাঁকে আর বিরক্ত করল না ওরা। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। পেছনে দরজাটা
ভেঙিয়ে দিল কিশোর।

দুই

বেরিয়েই ফুসে উঠল জিনা, 'বিজ্ঞানীগুলোর মাথায় দোষ থাকে! এই যে আমার
আব্বাটাকে দেখো না। কি করে আর না করে। কি যে বলে তাই জানে না। ইস,
দুনিয়ায় কারও বাপ যেন আর বিজ্ঞানী না হয়!'

কেন খেপেছে জিনা, বুঝতে পারছে তিন গোয়েন্দা। রাফির গায়ে উকুন আছে
বলাতে রেগেছে।

রবিন বলল, 'কিন্তু তাঁদের মত ভাল মানুষ কজন আছে? একটু খামখেয়ালি এই
যা...'

'ওটাই তো আমার সহ্য হয় না। কেউ কথা বলতে গেলে যদি পাতা না দেয়
ভাল লাগে?'

তা লাগে না। তবে বিজ্ঞানীদের ওই 'কেউ' এর দলে না ফেলার জন্যে
জিনাকে অনুরোধ করল মুসা। জিনার বাগ ভাঙ্গতে বেশিক্ষণ নাগল না ওদের।
আবার হাসিখুশি হয়ে উঠল সে।

বাগানে খেলছে চিতা আর বানরটা। টকার বলল, 'টারকজকে সবাই
ভালবাসে। ডেরা বাসে, আমি বাসি, নটি বাসে। এমন কি আব্বারও মাঝেসাথে
মনে পড়ে যায় ওর কথা।'

নাস্তায় বসার আগে টারকজ আর নটিকেও ডেকে আনা হলো।

চমৎকার একটা দিন কাটল গোয়েন্দাদের। সারাদিন বাগানে, লনে ছুটাছুটি
করে খেলে বেড়াল তিনটে জানোয়ার। খুব ভাব হয়ে গেছে তিনটেতে।

সন্ধ্যায় ডোরার হাতের দাঁকণ সুশব্দ রান্না খেয়ে সকাল সকাল শতে গেল ছেলেমেয়েরা। দিনটা কেটেছে উত্তেজনার মাঝে। ক্রুস্তও হয়েছে ওরা। তাই শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘূম।

জিনার বিছানার নিচে কার্পেটে শয়েছে রাফি। মাঝারাতে তার গরগর শব্দে ঘূম ভেঙে গেল জিনার। ‘কি হয়েছে রাফি?’ জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল সে। কানে এল অন্তুত শব্দ। বাইরের বাগানে পা টিপে টিপে হেঁটে বেড়াচ্ছে কে যেন।

‘নিচ্য টারকজ,’ ভাবল জিনা। ‘বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।’ কিন্তু তবু কেন যেন খচখচ করতে থাকল মনের ভেতর। শেষে আর বিছানায় থাকতে পারল না। উঠে এসে দাঁড়াল জানালার কাছে।

প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না। বাইরের আবহা অঙ্ককার চোখে সয়ে আসতে দেখল নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে একটা ছায়া…না না, দুটো ছায়া। কি যেন একটা চুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে। তারপর চাপা একটা আওয়াজ, গলা টিপে ধরলে শ্বাস নিতে গেলে যেমন হাঁসফাস শব্দ হয় তেমনি। ঠিক এই সময় জোরে বাতাস বইতে শুরু করল। দুলে উঠল গাছের ডাল, পাতা। কান পেতে থেকেও আর কিছু শুনতে পেল না জিনা। আরও খানিকক্ষণ অঙ্ককারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেও কিছু দেখতে না পেয়ে আবার এসে শয়ে পড়ল বিছানায়। কিন্তু ব্যাপারটা মন থেকে তাড়াতে পারল না। বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল একসময়। এক ঘুমে পার করে দিল বাকি রাতটা।

পরদিন সকালে ঝরবারে শরীর মন নিয়ে ঘূম ভাঙল তার। রাতের ব্যাপারটা এখন কল্পনা বলে মনে হলো। হাতমুখ ধুয়ে খাবার ঘরে এসে দেখল ছেলেরা সব নাশ্তার টেবিলে বসে আছে। কিশোর বাদে বাকি তিনজনেই উত্তেজিত। কিশোর গভীর। কিছু ভাবছে।

টকার জানাল জিনাকে, কাল রাতে গায়েব হয়ে গেছে টারকজ।

মুসা হেসে বলল, ‘রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেছে আমাদের কিশোর মিয়া।’

টকার বলল, ‘ডোরা বলেছে, চিত্তাটা নাকি বাগানে নেই। নাশ্তার জন্যে ডেকে ডেকে সারা হয়েছে, জবাবই দেয়নি টারকজ। অথচ অন্য দিন একবার ডাকলেই চলে আসে। সমস্ত বাগান গিয়ে তন্ম তন্ম করে খুঁজে দেখে এসেছে ডোরা। চিহ্নই নেই চিত্তাটার।’

‘সে জন্যেই আমি বলছি বাগানে গিয়ে খুঁজে দেখার কথা,’ কিশোর বলল। ‘কোন সূত্র পেয়ে যেতেও পারি।’

রবিন বলল, ‘সূত্র আর কি? ওটা নটির চেয়ে কম দুষ্টু না। কাল তো দেখলামই কি কাওটা করল। শিওর বাগানের বাইরের ঝোপ বা গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে আছে। বরং ওখানে গিয়ে খোঁজা উচিত।’

প্রফেসর কারসওয়েল রয়েছেন তাঁর স্টাডিতে, কাজ করছেন। তিনি গোয়েন্দা ভেবে অবাক হয়, আদো তিনি ঘুমান কিনা। মাঝে মাঝে দিনের পর দিন ওঘর থেকে বেরোনাই না তিনি। কাউকে চুক্তে দেন না। নিতান্ত অসময়ে ডোরাকে ডেকে খাবার দিতে বলেন। ট্রেতে করে খাবার দিয়ে আসে ডোরা। ওঘরে একটা ক্যাম্প

চিতা নিরুদ্দেশ

বেড় আছে। কয়েক ঘণ্টা ওটাতেই শুয়ে ঘুমিয়ে নেন প্রফেসর। সর্বক্ষণ ডুবে থাকেন জরুরী গবেষণায়।

টারকজকে খুঁজতে বেরোতে তৈরি হলো সবাই। কিশোর বলল, ‘আগে ডোরাকে কয়েকটা প্রশ্ন করে নিই। তারপর বেরোব।’

বাম্পাঘরে পাওয়া গেল হাউসকীপারকে। কিশোরের প্রশ্নের জবাবে ফোস করে একটা নিঃখাস ফেলে বলল, ‘কি আর বলব, আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। কাল রাতে বাগানেই খাবার দিয়ে এসেছি ওকে। তখনও ছিল। আজ সকালে দেখি নেই। বাগানের চারপাশে শক্ত বেড়া দেখেছি তো। ওই বেড়া ভাঙতে পারবে না টারকজ। এত উঁচু, ডিঙ্গোতেও পারবে না। চিতাটাকে খুব ভালবাসেন প্রফেসর সাহেব। শুনলে রেগে যাবেন।’

‘এক্সুপি বলার দরকারও নেই,’ কিশোর বলল। ‘আমরা খুঁজতে বেরোচ্ছি। ভাববেন না। ধরে নিয়ে আসব।’

মাথা নেড়ে ডোরা বলল, ‘আমার মন বলছে এত সহজে পাবে না ওকে। সিরিয়াস কিছু হয়েছে ওর। নইলে এভাবে বাতাসে মিলিয়ে যেত না।’

বিশাল বাগানে তন্ম তন্ম করে খুঁজল সবাই মিলে। তাদের সঙ্গে রাফি আর নটিও রয়েছে। কোন লাভ হলো না। চিতাটাকে তো পাওয়া গেলাই না, তার কোন চিহ্নও রেখে যায়নি। কোন সূত্র নেই। কি ঘটেছে বোঝা গেল না।

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন কয়েকবার চিমটি কাটল কিশোর। ভুরু কঁচকাল। জিনার দিকে তাকাল, ‘জিনা, তুমি না বললে কাল রাতে একটা অদ্ভুত শব্দ শনেছ?’

মাথা ঝাঁকাল জিনা। ‘শনেছি। দুটো ছায়ামূর্তি দেখেছি।’ নাস্তা খাওয়ার সময় সব বলেছে, এখন আরেকবার গঠন্টা বলল সে।

‘আমার কি মনে হয় জানো?’ বন্ধুদের মুখের দিকে এক এক করে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। ‘টারকজকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। কোন ভাবে গেটের চাবি জোগাড় করেছে কেউ। কাল রাতে তালা খুলে চুকে ধরে নিয়ে গেছে চিতাটাকে।’

‘কিন্তু কেন?’ রবিনের প্রশ্ন। ‘একটা চিতাকে কিডন্যাপ করতে আসবে কেন কেউ?’

‘আমি বুঝতে পারছি,’ বলে উঠল মুসা। ‘ব্যাটারা চোর। এ বাড়িতে চুরি করতে চায়। টারকজ থাকলে সেটা করতে পারবে না। তাই তাকে আগে সরিয়ে নিয়ে গেছে। আমার মনে হয় আজ রাতে আবার আসবে ওরা, আসল কাজটা সারতে।’

মাথা নাড়ল জিনা, ‘আমার তা মনে হয় না। চুরি করার ইচ্ছে থাকলে কাল রাতেই করতে পারত। টারকজ কোন গোলমাল করেনি। সহজেই সেরে ফেলতে পারত ওরা।’

‘আচ্ছা! টারকজ তো চুপ থাকার বান্দা নয়। কিছু করল না কেন?’

‘করার সামর্থ্যই হয়তো ছিল না,’ জবাব দিল কিশোর। ‘ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তাকে।’

‘কিংবা বিষ?’ মুসা বলল।

‘সর্বনাশ!’ শিউরে উঠল টকার।

‘দাঢ়াও,’ তার কাঁধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল জিনা, ‘এখনই এত ভয় পেও না। এগুলো তো স্থাবনার কথা বলা হচ্ছে। হয়তো দেখা যাবে সবই আমাদের বেশি বেশি কর্ম। কোন বোপের মধ্যেই ওকে পেয়ে যাব।’ এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, ‘বিষ খাওয়ালে লাশটা সরাতে যেত না চোরেরা। বাগানেই মরে পড়ে থাকত ওটা।’

‘চিতার চামড়া খুব দামী, আমি শুনেছি,’ আশ্চর্ষ হতে পারল না টকার। ‘ওই চামড়া দিয়ে চোয়ার কিংবা সোফার গদি হয়। কাপেটও বানানো যায়।’

‘না,’ জোর দিয়ে বলল কিশোর, ‘বিষ ওকে খাওয়ানো হয়নি। ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই এসেছিল ওরা। নিয়ে গেছে। বাস।’

‘কিন্তু কেন?’ আবার একই প্রশ্ন করল রবিন।

‘স্টেটই জানতে হবে। তদন্ত করে দেব করব।’

ঝবর শুনে টকারের মতই ঘাবড়ে গেলেন তার আক্রাও। কিন্তু সেটা সামান্য সময়ের জন্যে। বললেন, ‘একটা কিছু করতেই হয়। তবে আজ তো পারছি না। এই কাজটা না সারলেই নয়। যা করার কাল করব।’

টকার বলল, ‘আক্রা, কাল দেবি হয়ে যাবে। আজই কিছু একটা করো।’

‘কিছু করার আগে আজকের দিনটা অস্তত দেখা দরকার। হয়তো গেছে কোথাও, খিদে পেলেই ফিরে আসবে। আজ রাতের মধ্যে না ফিরলে কাল পুলিশকে খবর দেব...’

জরুরী গবেষণায় ভুবে গেলেন আবার প্রফেসর। ঘরে যে লোক আছে ভুলেই গেলেন।

কিন্তু পরদিন সকালেও ফিরে এল না টারকজ। বরং নতুন আরেকটা ঘটনা ঘটল।

তিনি

রোজই সকালে ডাকবাজ্জ খোলে ডোরা। সেদিনও খুলন। প্রফেসর কারসওয়েলের নামে একটা চিঠি পেল। চিঠি আরও আছে। প্রচুর চিঠিপত্র আসে বিজ্ঞানীর নামে। কিন্তু এই বিশেষ চিঠিটা সে সব সাধারণ চিঠি নয়। ডাকে আসেনি। খামে ভরে কেউ ফেলে দিয়ে গেছে। তাতে ডাকঘরের ছাপ নেই, টিকিট নেই।

খামটা দেখেই ভুব কোঁচকাল ডোরা। অতি সাধারণ কাগজ, দোমড়ানো, ময়লা। তার ওপরে ক্যাপিটাল লেটারে প্রফেসর কারসওয়েলের নাম। হাতের লেখা খুব খারাপ।

প্রফেসরের কাছে খামটা নিয়ে গেল ডোরা। আনমনে সেটা হাতে নিয়ে ছিড়লেন তিনি। কিন্তু চিঠিতে চোখ বুলিয়েই খেপে গেলেন। চিঁকার দিয়ে বললেন, ‘এত বড় সাহস! আমাকে হমকি দিয়ে চিঠি লেখে! আমাকে!'

চেচামেচি শুনে দৌড়ে ঘরে চুকল ছেলেমেয়েরা। প্রফেসরকে শান্ত করার

চেষ্টা করছে ডোরা। কিন্তু তিনি কানই দিচ্ছেন না। রাগে হাত ছুঁড়ছেন। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করল টকার।

‘কি হয়েছে?’ আরেকবার চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। চিঠিটা ধরলেন ছেলের নাকের কাছে। ‘টারকজকে কিডন্যাপ করেছে ওরা! হমকি দিয়ে চিঠি লিখেছে আমাকে!’

বাট করে কিশোরের দিকে ঘুরে গেল চার জোড়া চোখ, মুসা, রবিন, জিনা ও টকারের। ঠিকই অনুমতি করেছিল গোয়েন্দাপ্রধান।

‘নিচয় অনেক টাকা চায়?’ জানতে চাইল জিনা।

‘টাকা না, টাকা না। তাহলে তো দিয়েই দিতাম। ওরা চায় অন্য জিনিস। নতুন একটা ফয়েলের ফরমূলা আবিষ্কার করেছি আমি। ওটাই দিতে হবে ওদেরকে। না দিলে…’ দুহাতে মাথা চেপে ধরলেন প্রফেসর।

‘কি করবে?’ শঙ্কা ফুটেছে টকারের চোখে।

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। ‘না খাইয়ে রাখবে টারকজকে। খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে যাবে বেচারা, আবার বুনো হয়ে উঠবে। তখন ছেড়ে দেবে ওকে। গাঁয়ে তখন কি রকম আতঙ্ক ছড়িয়ে দেবে ও কল্পনা করতে পারো? সোজা গিয়ে চড়াও হবে ফার্মের পোষা জানোয়ারের ওপর, ছাগল-ভেড়া মেরে একশেষ করবে। আর যেহেতু ওটা আমার পোষা চিতা ছিল, সব দোষ সব দায়-দায়িত্ব এসে পড়বে আমার ঘাড়ে। সমস্ত কিছুর ক্ষতি পূরণ আমাকে দিতে হবে। তা-ও না হয় দেয়া গেল, যদি সময় মত এসে আমাকে জানায়। কিন্তু যদি না জানায়? বিরক্ত হয়ে, বেরগে গিয়ে যদি চিতাটাকে শুলি করে মেরে ফেলে লোকে?’

আঁতকে গেল টকার, ‘শুলি করবে! টারকজকে! না না, সেটা কিছুতেই হতে দিতে পারি না আমরা!

‘না, পারি না!’ সমর্থন করল মুসা।

‘ভাবার জন্যে দুদিন সময় দিয়েছে আমাকে ওরা,’ প্রফেসর বললেন। ‘ইতিমধ্যে আমাকে আরেকটা চিঠি দেবে। কোথায় কিভাবে ফরমূলাটা পৌছে দিতে হবে সেটা জানিয়ে। ওটা দিলেই টারকজকে ফিরিয়ে দেবে ওরা।’

‘নিচয় দেবেন না আপনি?’ জিজ্ঞাসু চোখে কারসওয়েলের দিকে তাকাল জিনা।

‘জানি না। একটা সাংঘাতিক সমস্যায় ফেলে দিল। ডিসাইড করা কঠিন। না দিলে চিতাটাকে দিয়ে গাঁয়ের ক্ষতি করাবে ওরা। শেষমেষ মারা পড়বে জানোয়ারটা। আবার দিয়ে দিলে গেল এত পরিষ্ণমে করা এত দামী। একটা ফরমূলা। কষ্টটা করলাম আমি, মজাটা মারবে ওরা।’

‘কিন্তু আঁকেল, টারকজকে বাঁচানোর একট উপায় করতেই হবে। কৃতগুলো শয়তান লোকের লোভের জন্যে ওরকম সুন্দর একটা জানোয়ার মারা পড়বে, ভাবতেই পারি না। কিছু একটা করা দরকার।’

সেদিন সন্ধ্যায় খাবার টেবিলে বসার আগে আর প্রফেসরের দেখা পেল না

- গোয়েন্দারা। সারাটা দিন ব্যস্ত রইল ওরাও। পুরো বাগানটায় গরুখোঁজা করে খুঁজল। কিন্তু সামান্যতম সূত্র পেল না যা দিয়ে টারকজকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারে।

ওদেরকে আন্তরিক সাহায্য করল রাফি। কিডন্যাপারদের গন্ধ খুঁজে বের করল তার অসাধারণ ভীকু নাক। কিন্তু বাগানের ডেতরে কেবল পাওয়া গেল সেই গন্ধ। গেটের বাইরে বেরোলেই আর কিছু নেই। হারিয়ে যায়।

‘খব কড়া ঘুমের ওষুধ খাইয়োছল টারকজকে,’ অনুমানে বলল জিন। তাকে ঘুম পাড়িয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। সে জন্যেই গেটের বাইরে বেরিয়ে আর গন্ধ পায় না রাফি।

চুট্টি নটিও তার বস্তুকে খুঁজে বের করার জন্যে যতটা সাহায্য করা সভ্য করল, কিন্তু সে-ও কিছু বের করতে পারল না।

রাতের খাওয়ার সময় ওদেরকে জানালেন প্রফেসর, তিনি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

‘অনেক ভেবে দেখলাম, ফরমুলাটা ওদেরকে দেয়া একদম উচিত হবে না। টারকজের বিনিময়েও নয়। সরি, টাকার, এছাড়া আর কিছু করার নেই আমার। জিনিসটাতে আমার কোন ব্যাক্তিগত আগ্রহ নেই। এটা থেকে টাকা আয় করব না। যদিও ইচ্ছে করলে বিক্রি করে দিয়ে অনেক টাকা কামাতে পারি। কিন্তু সেটা করব না। ফরমুলাটা আমি দান করে দেব সরকারকে। আমার দেশের উপকার হবে, সারা দুনিয়ার মানুষের উপকার হবে। এরকম একটা জিনিস কতগুলো শয়তান লোকের হাতে পড়তে দিতে পারি না আমি।’

চোখ মিটিষ্ট করতে লাগল টকার। পানি ঠেকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তিন গোয়েন্দা আর জিনাও চোখ নামিয়ে রেখেছে। এক প্লেট পটেটো চিপস টেবিলে নামিয়ে রেখে আপনের খুট দিয়ে চোখ মুছল ডোরা। সবাই বুঝতে পারছে প্রফেসর যা করতে যাচ্ছেন সেটাই ঠিক, কিন্তু চিতাটার পরিণতিও মেনে নিতে পারছে না। বেচারার জন্যে ভীষণ দুঃখ হচ্ছে ওদের।

চুপচাপ খেতে লাগল সবাই। কারও মুখে কথা নেই। খাওয়ার পর ওদেরকে ল্যাবরেটরিতে ডেকে নিয়ে গেলেন প্রফেসর। বললেন, ‘এই জায়গায় বসে আমি আবিষ্কার করেছি ফরমুলাটা। অসাধারণ একটা আবিষ্কার বলতে পারো এটাকে। এরকম একটা জিনিস কারও একা ভোগ করার অধিকার নেই। চোরগুলোকে দিয়ে দিলে সেই কাজই করবে ওরা। এটা খাটিয়ে কোটি কোটি টাকা আয় করবে। কারও কোন উপকারে লাগবে না সেই টাকা, কেবল নিজেদের পকেট ভারি করবে। ত্জনেশ্বনে কি করে সেটা করতে দিই বলো?’

‘বুঝতে পারছি আপনার উদ্দেশ্য,’ জিন বলল। ‘মানবজাতির কল্যাণে একটা চিতার জীবন উৎসর্গ করতে চাইছেন।’

‘ঠিক। একেবারে শুভ্যিয়ে বলেছ কথাগুলো।’

এতক্ষণে মুখ খুলল কিশোর, ‘চোরগুলো আপনার নরম মনটার ওপর ভরসা করেছিল। ডেবেছিল, চিতাটাকে সাংঘাতিক ভালবাসেন আপনি। ওটার বিনিময়ে

যা চাষ তাই দিয়ে দেবেন। ভুল করেছে।'

'ওরা আরও ডেবেছিল, টকারের মুখ চেয়ে হলেও আমি চিঠাটার বিনিময়ে ওদেরকে ফরমুলাটা দিয়ে দেব। আমার মা-মরা একমাত্র ছেলেকে অসুখী করতে চাইব না।'

মাথা উঁচু করে দাঁড়াল টকার। 'কিছুতেই না। আব্বা, চোরগুলোর কাছে কিছুতেই মাথা নোয়াতে যেও না তুমি। দেশের চেয়ে, দুনিয়ার মানুষের চেয়ে একটা চিঠা কখনই বড় হতে পারে না আমার কাছে।'

'চিঠাটার জন্যে তোর চেয়ে কম দুঃখ হচ্ছে না আমার, টকার।'

'আমি বুঝতে পারছি। টাকা চাইলে, যত টাকাই হোক ওদেরকে দিয়ে দিতে তুমি, আমি জানি।'

কালো একটু মেঘ কেটে গেল যেন প্রফেসরের মুখ থেকে।

ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

ইজিনের ব্যাপারে খুব আগ্রহ মুসার। জিজেস করল, 'আংকেল, ফরমুলাটার বিশেষত্ব কি?'

'সাধারণ পেট্রলে একটা মোটর গাড়ি যতটা চলে এই তেলে চলবে তার চেয়ে পাঁচ—ছয় গুণ বেশি...'

'খাইছে! এই অবস্থা!'

মাথা বাঁকালেন প্রফেসর।

'সরকারকে জানিয়েছেন?'

'না। শেষবারের মত পরীক্ষা করছি। কোথাও কোন ঝটি রয়ে গেল কিনা দেখছি। ওই চোরগুলো কি করে জেনে গেল বুঝতে পারছি না...যাক, যা হওয়ার হয়েছে। তোমরা এখন যাও। আমি কাজ করব। চোরগুলোকেও একটা চিঠি লিখব, ওদের প্রশ্নাবে আমি রাজি নই।'

'আব্বা,' প্রায় ককিয়ে উঠল টকার, টারকজের মৃত্যু পরোয়ানা জ্ঞানি করার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না, 'আরেকটু অপেক্ষা করে দেখি না আমরা, ওরা কি করে? পুলিশকে জানাচ্ছ না কেন? ওরা চেষ্টা করলে হয়তো টারকজকে খুঁজে বের করতে পারবে।'

'সময় নেই, টকার। যত তাড়াতড়ি সম্ভব ফরমুলাটা শেষ করতে হবে এখন আমাকে। হমকি যখন এসেছে আর দেরি করার উপায় নেই আমার। আমি রাজি নই জানলে ওরা এসে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। তার আগেই আমি এটা জায়গামত পৌছে দিতে চাই। পুলিশকে খবর দিলে সময় নষ্ট হবে আমার।'

কিন্তু তাঁর কথায় সন্তুষ্ট হতে পারল না ছেলেমেয়েরা।

'বুঝতে পারছ না তোমরা।' বুঝিয়ে বললেন প্রফেসর, 'ওরা এলেই প্রশ্ন শুরু করবে আমাকে। প্রচুর মূল্যবান সময় নষ্ট করবে। চোরগুলোও জেনে যাবে পুলিশ তদন্ত করছে। তখন ওরা আর চুপ থাকবে না, যেভাবেই হোক ফরমুলাটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে আমার কাছ থেকে।...নাহ, তোমরা যাই বলো, পুলিশকে এখন জানাতে আমি পারব না। যেটা ঠিক করোছি সেটাই করব। এবং সেটা করাই

নিরাপদ। যাও, তোমরা এখন যাও।'

তারপরেও বেরোতে চাইল না জিনা। মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি মনে হয়, টারকজ সত্যিই মানুষের ক্ষতি করবে?'

'না, সরাসরি তা করবে না। হামলা চালাবে গরু আর ছাগল-ভেড়ার ওপর। মানুষের কোন ভয় নেই।'

'চোরগুলো যা বলেছে তা কি সত্যিই করবে বলে মনে হয় আপনার?'

'করবে। কারণ, এটা অনেক টাকার ব্যাপার। হাতছাড়া হয়ে গেলে সাংঘাতিক খেপে যাবে ওরা। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেও তখন টারকজকে বুনো বানিয়ে ছেড়ে দেবে। মোট কথা, চিতাটাকে শেষ করবেই ওরা।'

মুখ কালো করে ল্যাবরেটরি থেকে বেরোল ছেলেমেয়েরা। বাইরে এখনও দিনের আলো রয়েছে সামান্য, পুরোপুরি নেভেনি। বিশাল বাগানে এত গাছপালা আর ফুল, কিন্তু একেবারেই শূন্য মনে হলো টকারের কাছে। বাগানের পথে পথে টহল দিতে দেখা গেল না চিতাটাকে।

রাগ মাথা চাড়া দিতে শুরু করল তার মনে।

'কিছু একটা করতেই হবে আমাদের!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কিশোর, কত জনের জন্মেই তো কত কিছু করেছ তোমরা। টারকজের জন্যেও কিছু কোরো না। তোমাদের কাছে হাতজোড় করছি আমি!'

'হাতজোড়ের দরকার নেই। তুমি না বললেও সেটা করতাম। কি করে করব সেটা নিয়েই ভাবছি। পুলিশকে যখন খবর দিতে চান না আংকেল, আমাদেরই যা করার করতে হবে। এত সহজে ছেড়ে দেব শয়তানগুলোকে ডেবেছে?'

আশা বাড়ল টকারের। কিশোর পাশার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। চকচক করে উঠল চোখ। 'এমন ভাবে বলছ, যেন বেরই করে ফেলবে টারকজকে!'

'এখনও জোর করে কিছু বলতে পারছি না। তবে চেষ্টা তো করবই। পেয়েও যেতে পারি ওকে। এই এলাকা তো তোমার চেনা। তোমাকে নিয়ে বেরোব আমরা দল বেঁধে। গায়ের সবখানে খুঁজে দেব।'

'কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে রেখেছে বলে মনে হচ্ছে তোমার?'

'শিওর না।'

'কাল ভোরে উঠেই তাহলে বেরিয়ে পড়ব, কি বলো?' রবিন ঘল্ল, 'তদন্ত যখন করবই ঠিক করেছি দেরি করার কোন মানে হয় না।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'তা তো হয়ই না। তবে কাল ভোরে নয়, তার অনেক আগে থেকেই আমাদের কাজ শুরু হয়ে যাবে। এবং তার জন্যে এবাড়ির সীমানার বাইরেও যেতে হবে না আমাদের।'

কিশোরের এরকম রহস্য করে কথা বলার সঙ্গে অভ্যন্তর তার দুই সহকারী রবিন আর মুসা। প্রশ্ন করল না। কেবল তাকিয়ে রইল গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে।

চোখ মিটমিট করতে লাগল টকার।

জিনা ঘল্ল, 'বাগানে খোঁজার কথা বলছ তো? লাভটা কি? কোথাও কি বাকি রেখেছি নাকি? একটা ইঞ্চি বাকি রাখিনি।'

‘তা রাখিনি,’ সীকার করল কিশোর। ‘কিন্তু ওভাবে আর খুঁজতে যাচ্ছি না আমরা। কিডন্যাপারদের তালাশেও যাচ্ছি না, ওরাই আমাদের কাছে আসবে।’

‘আমাদের কাছে আসবে!’ কৌতুহল আর চেপে রাখতে পারছে না টকার। কি বলছ তুমি, কিশোর? ওরা আমাদের কাছে আসতে যাবে কেন?’

‘আসতে হবে ওদের। তোমার আরু কি বললেন ভুলে গেছ? আটচলিশ ফটা সময় দিয়েছেন তাঁকে কিডন্যাপাররা। ইতিমধ্যে তাঁকে জানাবে ওরা, কিভাবে কোথায় ফরমুলাটা পৌছে দিতে হবে।’

‘তা তো মনেই আছে, ভুলিনি। কিন্তু...’

‘আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। এমন হতে পারে, আরেকটা চিঠি লিখেই সেসব কথা তাঁকে জানাবে ওরা। সেই চিঠি ডাকে না পাঠিয়ে আজকে যে ভাবে লেটার বক্সে ফেলে গেছে...’

‘বুঝতে পেরেছি! চিত্কার করে উঠল রবিন। ‘সেটা ফেলার জন্যে আজও আসতে পারে ওরা!’

‘হ্যাঁ।’

‘তার মানে লুকিয়ে বসে...’ জিনা বলল। কিন্তু তাকে কথাটা শেষ করতে দিল না টকার। সে-ই শেষ করে দিল, ‘লেটার বক্সের ওপর চোখ রাখলেই যে ফেলে যায় তাকে ধরতে পারব।’

‘হয়তো।’

‘তাহলে আর কি?’ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুসার চোখ। বোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকব। চোরটা এলে আর কথা নেই...’

বাধা দিল কিশোর, ‘এক সঙ্গে বসব না সবাই। লোক বেশি হয়ে গেলে চোরটার চোখে পড়ে যেতে পারি�। তাছাড়া সারা রাত না ঘুমিয়ে থাকারও কোন অর্থ হয় না। অনেক লোক আছি আমরা। দুজন দুজন করে পালা করে পাহারা দিলেই চলবে।’

তার কথায় একমত হয়ে মাথা ঝাঁক্যন অন্যেরা।

চার

সে রাতটা অনেক দীর্ঘ মনে হলো ওদের কাছে। প্রথমে পাহারা দিতে বসল রবিন আর জিনা। অবশ্যই সঙ্গে রইল রাফি। সে যেখানে ইচ্ছে ঘুমাতে পারে। বোপের মধ্যে শুয়েও ঘুমাতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।

গেটের ধারে একটা ঘন বোপের মধ্যে বসে পাহারা দিতে লাগল ওরা। একজনের চোখ রাস্তার দিকে, আরেকজনের লেটার বক্সের ওপর। রাফির কানে সব শব্দই ঢোকে, তাই বিশেষ কোন দিকে নজর রাখার তাৰ দৰকার নেই।

ঘটার পর ঘন্টা কেটে গেল। কিছুই ঘটল না। ওদের পালা শেষ। বোপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুসা আর কিশোরকে ডেকে তুলন দুজনে। এক ডাক দিতেই বিছানায় উঠে বসল কিশোর। কিন্তু মুসার ঘূম ভাঙাতে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে

ধাক্কাধাকি করতে হলো। চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল মুসা, ‘উম্, কি হয়েছে!...
চোরটা এল?’

‘না। ওঠো।’ কিশোর বলল, ‘এবার আমাদের পালা।’

পা টিপে টিপে বাইরে বেরোল ওরা। প্রফেসর আর ডোরা যাতে না জেগে
যায় সে জন্যে। জেগে গেলে হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে। ওরা যে তদন্ত ওরু
করেছে, এটাও কারসওয়েলকে জানতে দিতে চায় না। অঘটন ঘটে যাওয়ার ভয়ে
তাহলে ওদেরকে তদন্ত করতে দেবেন না।

‘ওই ঝোপটাতে গিয়ে বসো তুমি,’ ফিসফিস করে মুসাকে বলল কিশোর।
‘রাফি, তুই আমার সঙ্গে আয়।’ বলে গেটের ধারের একটা বড় গাছের দিকে
এগোল সে। ‘এলে ব্যাটাকে ধরতেই হবে, বুবালি।’

গাছটার আড়ালে বসে সারতেও পারল না সে, লেটার বক্সের কাছে একটা
ছায়া নড়তে দেখল। মনে হলো, উঠে আসছে বাস্ত্রের ওপর দিকে। দম বক্ষ করে
ফেলল কিশোর। ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। তবে ছায়াটাকে হাতের মত লাগল
তার কাছে। ভাবল, দস্তানা পরা কোন হাত চিঠি ফেলতে এগোচ্ছে বাস্ত্রের দিকে।

হঠাৎ চোখের পলকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রাফি। ঘেউ ঘেউ করে দৌড় দিল
বাস্ত্রের দিকে।

ঝোপে বসে অবাক হয়ে গেল মুসা। এই তো সবে বসেছে, এক্ষুণি কি হলো?
কাঠ হয়ে বসে রইল সে। বেরোবে কি বেরোবে না ব্যাপতে পারছে না। কিশোরের
গলা শোনা গেল না। তার নির্দেশ ছাড়া কিছু করতে গিয়ে বকা শনতে চায় না।

আর নুকিয়ে থেকে লাভ নেই। ভুল যা করার করে ফেলেছে কুকুরটা। গাছের
আড়াল থেকে বেরিয়ে রাফির পেছনে দৌড় দিল কিশোর। যদি চোরটাই হয়ে
থাকে, সময় মত চেপে ধরতে হবে। মুসাকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না। বুবো
ফেলেছে দস্তানা পরা হাত মনে করেছিল যেটাকে সেটা কি?

বেড়াল। সে জন্যেই আটকে রাখা যায়নি রাফিকে। অচেনা বেড়াল দেখলেই
রেগে যায় কুকুরেরা, হঁশ থাকে না, রাফিও তার ব্যতিক্রম নয়।

গলা ফাটিয়ে চিংকার করছে রাফি। ভয়ে বাঁকা হয়ে গেছে বেড়ালটা। তবে
লেজ তুলে পালানোর বাল্পা নয়। তৈরি হয়ে আছে। কুকুরটা তাকে কামড়াতে
এগোলে থাবা মেরে নাক চিরে দেবে।

রাফি করছে হউ, হউ। বেড়ালটাও সমান তালে ফুসছে।

ধমক দিয়ে ওগুলোকে ধামানোর চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। কে শোনে
কার কথা। গওগোলে ঘূম ভেঙ্গে গেল কারসওয়েল আর ডোরার। জানালা খুলে মুখ
বের করল দুজনেই। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করল।

কি আর করে? বানিয়ে বলতে হলো কিশোরকে, বেড়ালের গন্ধ পেয়ে রেগে
গিয়ে তাড়া করেছে কুকুরটা। ভাগ্য ভাল, দুজনেই ঘুমের ঘোরে রয়েছে।
একজনেরও মাথায় এল না জিজ্ঞেস করার কথা, এত রাতে বাগানে কি করছে
কিশোর?

জানালা থেকে সরে গেল দুটো মুখই।

ধমক দিয়ে রাফিকে বেড়ালের কাছ থেকে সরিয়ে আনল কিশোর। বেড়ালটাও সুযোগ পেয়ে দুই লাফে হারিয়ে গেল অঙ্ককারে।

আবার এসে গাছের আড়ালে বসল কিশোর। রাফিকে সাবধান করে দিল, আর যাতে কোন গোলমাল না করে। কিন্তু তাতেও লাড হবে বলে মনে হলো না। চোরটা কাছাকাছি থেকে ধাকলে নিচয় বুঝে ফেলেছে লুকিয়ে বসে ওর জন্যে পাহারা দেয়া হচ্ছে। আর আসবে না।

যা ভেবেছে, তা-ই। অহেতুক বাকি সময়টা বসে থাকল ওরা। কয়েক ঘণ্টা পর বেরিয়ে এল টকার। এবার সে আর মুসা পাহারা দেবে। বেশিক্ষণ পাহারার ভার পড়েছে তার ওপর। তাতে মোটেও অখুশি নয় সে। বরং নিজেকে বেশ শুরুত্বপূর্ণ লোক মনে করছে।

ডোর পর্যন্ত পাহারা দিল মুসা আর টকার। আলো ফোটা শুরু হতেই উঠে এসে ঘরে ঢুকল। সারা বাড়ি যখন জেগে উঠেছে তখনও ওরা ঘুমিয়েই রইল।

দেরি করেই সেনিন নাতা থেকে বসল ছেলেমেয়েরা।

সব শুনে রাফিকে বকাবকি শুরু করল জিনা। মন মরা হয়ে রইল বেচারা কুকুরটা। বেড়ালের মত মহাশক্তিকে মারতে গেছে, এতে তার দোষটা কোথায় বুঝতে পারছে না।

কিন্তু দশটা বাজতেই জানা গেল, অথবাই দোষ দেয়া হয়েছে রাফিকে। তার চেঁচামেচিতে পালায়নি চোর। আসলে আসেইনি। ডাকে পাঠিয়েছে চিঠি। গায়ের পোস্ট অফিস থেকে পোস্ট করেছে। তেমনি সাধারণ খাম। দোমড়ানো। ময়লা। ওপরে ক্যাপিটাল লেটারে লেখা ঠিকানা।

চিঠিটা হাতে নিয়ে হাঁটু কাঁপতে লাগল ডোরার। না জানি আবার কি ডয়ঙ্কর কথা লেখা আছে! কিন্দন্যাপারদের পাল্লায় পড়েনি তো আর কখনও, ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে।

প্যাসেজে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ছেলেমেয়েদের। হাতের চিঠিটা দেখেই বুঝে ফেলল যা বোৰার।

‘কিন্দন্যাপারদের চিঠি?’ উন্নেজিত কষ্টে বলল টকার।

‘খাইছে! তার মানে সারারাত খামাকাই বসে বসে পিপড়ের কামড় খেলাম...’
বলেই চোখ পড়ল কিশোরের চোখে। থমকে থেমে গেল। সর্বনাশ! মনের ভুলে দিয়েছে ফাঁস করে।

সন্দেহ দেখা দিল ডোরার চোখে। সবার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই বুঝল না। নিরীহ মুখের ভঙ্গি করে রেখেছে সবাই। তবু সাবধান করে দেয়ার জন্যে বলল, ‘তোমরা যে গোয়েন্দা, জানি। খবরদার, ওসব ছেলেমানুষী করতে শিয়ে সব পও কোরো না। সাংঘাতিক রেঁগে যাবেন তাহলে প্রফেসর কারসওয়েল।’

চুপ করে রইল সবাই। হ্যাঁ-ও বলল না, না-ও বলল না। কারণ ওরা খুব ভাল করেই জানে, চিতাটাকে খুঁজে বের করার আগে ক্ষান্ত দেবে না কেউই। সে কথা বলল না ডোরাকে।

ল্যাবরেটরির দিকে এগোল ডোরা। পেছন পেছন চলল সবাই।

‘আধ মিনিট পরই বেরিয়ে এল ডোরা। তখন চুকল ওরা। আগে টকার, পেছনে অন্যোরা।

কাজে ডুবে আছেন প্রফেসর। টেবিলে পড়ে আছে চিঠিটা। খুলেনইনি। তার মানে পাতাই দিচ্ছেন না আর কিডন্যাপারদের।

টকার জিজ্ঞেস করল, ‘আরা, চিঠিটা পড়বে না?’

‘ও আর পড়ে কি হবে?’ লেখা থেকে চোখ না তুলেই জবাব দিলেন প্রফেসর। ‘ইচ্ছে হলে নিয়ে গিয়ে পড়োগে। যত যা-ই লিখুক, আমার জবাব হবে না, ব্যস।’

চিঠিটা তুলে নিল টকার।

ওটা নিয়েই তাকে বেরিয়ে আসতে ইশারা করল কিশোর।

বাড়ির পেছনে বৌপের ছায়ায় এসে বসল ওরা। চিঠিটা খোলার ভার পড়ল রবিনের ওপর। খুলে পড়তে লাগল সে। চুপ হয়ে আছে রাফি। নটি ও দুষ্টুমি করছে না। টকারের কাঁধে লঙ্ঘী হয়ে বসে আছে। ব্যাপার শুরুতর, বুরো ফেলেছে যেন।

সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে দুই বার করে পড়ল রবিন। মুখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে।

পুরো একটা মিনিট যিম মেরে বসে রাইল গোয়েন্দাপ্রধান। তারপর আনমনে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, ‘ইঁ, তাহলে আজ রাত দশটায় বনের ডেতর যেতে হবে ডোরাকে। একা। প্রফেসর কারসওয়েলের জবাব নিয়ে।’

‘বনের মধ্যে খোলা জায়গার কথা বলল।’ টকারের দিকে তাকাল মুসা, ‘চেনো নিচয় জায়গাটা?’

‘চিনি। ডোরাও চেনে।’

‘ওখানে শিয়ে দেখতে পাবে একটা ওক গাছের গুঁড়ি,’ চিঠিতে যা লেখা আছে তার পুনরাবৃত্তি করল জিনা। ‘তার ওপরে একটা পাখির খাচা রাখা থাকবে। জবাব লেখা কাগজটা রাখতে হবে তার মধ্যে। ফরমুলা দিতে যদি রাজি থাকেন কারস আংকেল, তাহলে ওটা হাতে পাওয়ার চরিষ ঘন্টা পর বাড়ি ফিরে আসবে টারকজ়।’

টকারের দিকে তাকাল মুসা। ‘রাতের বেলা একা যেতে ভয় পাবে না ডোরা?’

‘কি জানি। পাওয়ারই তো কথা। কিডন্যাপারদের ব্যাপারটা না থাকলে অবশ্য পেত না।’

‘আমার মনে হয় না ওর কোন ক্ষতি করবে ওরা,’ জিনা বলল। ‘শ্যাতানী যা করার তা জবাব পাওয়ার পর করবে।’

‘যেমন?’ কি করবে ওরা আন্দাজ করতে পারছে মুসা, তবু জিনার মুখ থেকে শোনার জন্যে পঞ্চটা করল।

‘প্রতিশোধ নেবে। বাড়ো যা যাওয়ার যাবে বেচারি টারকজের ওপর নিয়ে।’

কাদো কাদো হয়ে গেল টকারের চেহারা।

‘অত সহজে পার পেতে দেব না ব্যাটারে,’ কিশোর বলল। ‘শোনো, কি করব। আজ বিকেলে ডোরা যাওয়ার আগেই জায়গাটাৰ কাছে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকব আমরা। জবাবটা নিতে কেউ না কেউ আসবেই। তাকে অনুসরণ করবে

চিতা নিরুদ্ধেশ

রাফি। আমরাও যাব পেছনে। কোথায় যায় চিনে আসব। তারপর তোমার আর্দ্ধাকে বলে পুলিশকে খবর দেওয়াব। চিটাটাকেও উদ্ধার করব, চোরগুলোকেও ধরব।'

উজ্জ্বল হলো টকারের মুখ। 'তাই তো! এই সহজ কথাটা তো ভাবিনি!'
'এখনই গিয়ে পুলিশকে বলি না কেন?' জিনার প্রশ্ন।

'বোকা নাকি?' মুসা বলল, 'পুলিশ এলে কারস আংকেল বিরক্ত হবেন। কিন্তু আপাররাও জেনে যাবে, গোপনে কিছু একটা করা হচ্ছে ওদের বিরুদ্ধে। সতর্ক হয়ে যাবে ওরা। রেগে গিয়ে দেখা যাবে শুলি করে তঙ্গুণি মেরে ফেলেছে টারকজকে।'

কড়া চোখে মুসার দিকে তাকাল জিনা। তাকে বোকা বলেছে। যা তা কথা! সবাই ডয় পেয়ে গেল। বলার সময় বলে ফেলেছে মুসা, এখন সে-ও ডয় পেয়ে গেল।

সবার মনের ভাবটা বুঝে ফেলেছে বোধহয় জিনা। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে ফিক করে হাসল। বলল, 'ভেবেছিলে রেগে উঠব, তাই না? অকারণে রাণি না আমি। আসলেই বোকার মত কথা বলেছি।'

আবার হাঁপ ছাড়ল সবাই।

আগের কথার খেই ধরে রবিন বলল, 'বুদ্ধিটা ভালই হয়েছে। গিয়ে লুকিয়েই বসে থাকব। এলে পিছু নেবে।'

মুসা বলল, 'পিছু নৈয়ার দরকার কি? একজন হলে তো ধরেই ফেলতে পারি। আমাদের সঙ্গে একলা পারবে না। ধরে নিয়ে যাব পুলিশের কাছে। পুলিশ তার মুখ থেকে কথা আদায় করে নিতে পারবে।'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'একজন ধরা পড়লে দলের বাকি লোকগুলো পালাবে। টারকজকে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। তখন তাদেরকে ধরা মুশ্কিল হয়ে যাবে। একবারে ধরতে হবে সবগুলোকে। কোন মতেই সাবধান করে দেয়া চলবে না। কাজেই, আমি না বললে কেউ কিছু করতে যে-ও না।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'কাল রাতে ভাল করে ঘুমাতে পারিনি। দুপুরে খেয়েই শুয়ে পড়ব। ঘুমিয়ে নেব দু-তিন ঘণ্টা। বলা যায় না, আজও রাত জাগতে হতে পারে।'

পাঁচ

সন্ধ্যাবেলো দল দেখে বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা। রাফিকে সঙ্গে নিল, তবে নটিকে রেখে গেল বাড়িতে। ওকে নেয়া উচিত মনে করল না। ও চুপ থাকতে পারে না। জরুরী মুহূর্তে সব ভজষ্ট করে দিতে পারে।

গায়ের পথ ধরে সারি দিয়ে নৌরবে এগিয়ে চলল দলটা। পৌছে গেল বনের কাছে। গাছপালার ডেতর দিয়ে এসে দাঁড়াল খোলা জায়গাটার ধারে।

'ভাল ঝোপঝাড় আছে,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'লুকিয়ে বসলে কেউ দেখতে পাবে না। কিশোর, ওই ঝোপটাতে বসি, কি বলো?'

কিশোর তাকিয়ে আছে একটা কাটা গাছের গুঁড়ির দিকে।

টকার বলল, ‘ওটাই।’

‘বুঝতে পারছি। খাচাটা আছে।’

রবিন আর জিনাও দেখেছে খাচাটা। সরু শিক দিয়ে তৈরি খুবই হালকা জিনিস। ওপরে একটা গেল আঙ্গটা লাগানো। ধরার জন্যে।

‘কে যেন আসছে!’ কষ্টস্থর আরও খাদে নামাল মূসা।

ওরা যে পথে এসেছে সেদিকেই শোনা যাচ্ছে পদশব্দ।

‘জলদি লকিয়ে পড়ো সবাই,’ নির্দেশ দিল কিশোর।

কয়েক মিনিট পর গাছের আড়াল থেকে বেরোতে দেখা গেল ডোরাকে। এগিয়ে আসছে দ্রুতপায়ে। কর্ণনাই করতে পারছে না ছয় জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার ভাবভঙ্গিতেই বোৰা যায় ডয় পাচ্ছে। পাওয়ারই কথা। দোষ দেয়া যায় না।

খোলা জায়গাটায় বেরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ডোরা। এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজল গাছের গুঁড়টা। চোখে পড়ল। চিনতে পারল খাচাটা দেখে। এক মুহূর্ত দিখা করে সোজা এগিয়ে গেল সেদিকে। চিঠির জবাব লিখে দিয়েছেন প্রফেসর কারসওয়েল। খামটা বের করে ঢুকিয়ে দিল খাচার মধ্যে। তারপর আর একটা সেকেণ্ডও দোরি না করে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। আসার সময় যত তাড়াতাড়ি করেছিল তার চেয়ে দ্রুত। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল গাছের আড়ালে।

আরও কিছুক্ষণ শোনা গেল তার জুতোর আওয়াজ। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে।

ফিসফিসিয়ে কিশোর বলল, ‘এইবার আসছে আসল কাজ। সবাই ছঁশিয়ার থাকবে। জিনা, রাফিকে বলে দাও কোন কারণেই যেন শব্দ না করে।’

পাথর হয়ে বসে রইল সবাই। আশপাশের ঝোপ আর গাছগুলোর মতই শুরু। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। একটা পাখিও ডাকছে না। নিজেদের হৃৎপিণ্ডের শব্দই যেন বড় বেশি হয়ে কানে বাজছে। যে কোন সময় এখন এসে হাজির হতে পারে টারকজের কিডন্যাপার।

রাফির কলারে শক্ত হলো জিনার আঙুল। কি করতে হবে বুঝে গেছে বুদ্ধিমান কুকুরটা। চুপ হয়ে রইল সে। এমনকি লেজের ডগাও নাড়ল না।

সবার চোখ খাচাটার দিকে।

টকার ভাবছে, ‘সব কিছু এখন ভালয় ভালয় শেষ হলেই হয়। যদি আমাদের দেখে ফেলে? কি হবে?’

গোয়েন্দাগির তারও ভাল লাগে। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে কয়েকটা অ্যাডভেঞ্চার করেছে। আরও করার ইচ্ছে আছে। তাই কিশোর যা যা করতে বলে, ঠিক তা-ই করে।

রাফি বাদে দলের আর সবার চেয়ে মুসার কান আর চোখের ক্ষমতা দুটোই বেশি। তাই সে-ই আগে শুনতে পেল। কিশোরের কানে কানে বলল, ‘আসছে।’

তার আগেই কান খাড়া করে ফেলেছে রাফি। তাকিয়ে রয়েছে বনের উল্টো

দিকের খোলা জায়গার দিকে।

সবাই শুনতে পাচ্ছ এখন। কিছু একটা নড়ছে বনের ডেতর। গলা বাড়িয়ে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে সেনিকে তাকিয়ে আছে সবাই।

কেঁপে উঠল একটা ঝোপের পাতা। হঠাৎ করেই খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওটা। খুব সুন্দর ছোট জাতের একটা হরিণ।

ফোস করে নিঃশ্বাস ফেলল টকার। অনেরাও ফেলল। হতাশার। অস্থির হয়ে উঠেছে ওরা। চোরটা আসতে এত দেরি করছে কেন?

চলে গেল হরিণটা। আবার অপেক্ষার পালা।

ঘড়ি দেখল কিশোর। লুমিনাস ডায়াল ঘড়িতে দেখল অনেক রাত হয়েছে। কয়েক ঘন্টা সময় যে এভাবে পার হয়ে গেছে টেরই পায়নি উজ্জ্বলার কারণে। পৌনে দশটা বাজে। আর কতক্ষণ!

হঠাৎ আবার কানে এল শব্দ।

দম বন্ধ করে ফেলল সবাই। দেখা যাক এবার কি বেরোয়? বনের ডেতরে অঙ্গুকারে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে কেউ। শুকনো পাতায় পা পড়ে মচমচ শব্দ হচ্ছে। খুব সাবধানে ইঠেছে। পায়ের নিচে পড়ে মট করে ভাঙল শুকনো একটা ডাল। এবার আর চোরটা না হয়েই যায় না, আশা করল সবাই।

শব্দ শুনে মনে হয় না বড় মানুষ। সেই তুলনায় বেশি হালকা। কিশোর ভাবছে, ‘বড় মানুষ তো নয়ই, মেয়েমানুষও নয়। ছোট ছেলেটেলে হবে।’

সন্দেহের কথাটা কাউকে বলল না সে। কথা বলল না ভয়ে। যদি ফিসফিস করে বললেও শক্র কানে চলে যায়। তাদের অস্তিত্ব ফাস হয়ে যাবে। এতক্ষণ কষ্ট করে বসে যে থেকেছে তার কোন অর্থই হবে না আর।

কান খাড়া করে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে বসে রইল সে। ঠিক কোনখান থেকে আসছে শব্দটা বোঝার চেষ্টা করছে।

চাদ উঠেছে। হলদেটে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে বনের মধ্যে। আলো আঁধারির খেলা। রহস্যময় করে তুলেছে পরিবেশ।

খোলা জায়গাটার উল্লে দীকে একটা নিচু ঝোপের ওপর কিশোরের দৃষ্টি ছিল। ডালপাতা ফাঁক হয়ে সরে যাওয়ার অপেক্ষা করছে সে। বড় মানুষ বেরোবে না, জানে। বেরোবে ওদেরই বয়েসী কোন কিশোর। কিংবা তার চেয়েও ছেট শরীরের আরও কম বয়েসী কোন ছেলে।

কিন্তু তার ধারণা ঠিক হলো না। ডালপাতা সরে গিয়ে একটা ফাঁক দেখা গেল, সেখান দিয়ে বেরিয়েও এল প্রাণীটা, তবে কোন মানুষ নয়। একটা কুকুর। কালো একটা স্প্যানিয়েল।

কিশোরের পর পরই ওটাকে দেখতে পেল মুসা। ‘খাইছে!’ দারুণ নিরাশায় উজ্জিয়ে উঠল সে। ‘একের পর এক জানোয়ারই বেরোচ্ছে কেবল! মানুষ বেরোয় না কেন?’

ঝট করে এদিকে কান খাড়া করল কুকুরটা। কথা শব্দ কানে গেছে স্পষ্টত।

রবিন, জিনা আর টকারও হতাশ হয়েছে। সবাই কোন না কোন মতব্য করল।

কিন্তু কিশোর চুপ। আঘাত নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে কুকুরটার দিকে।

অস্তুত আচরণ করছে কুকুরটা। জিনাও লক্ষ্য করেছে সেটা। সে-ও চুপ হয়ে গেল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে স্প্যানিয়েলটার দিকে।

দাঁড়িয়ে গেছে ওটা। সামনের একটা পা তুলল। নাক তুলল আকাশের দিকে। বাতাস শুকছে।

হেসে নিচু গলায় খৌচা দিয়ে বলল রবিন, ‘প্রকৃতির প্রেমে পড়েছে। টাঁদ দেখছে...’

‘চুপ!’ থামিয়ে দিল তাকে কিশোর। তার কষ্টে চাপা উদ্দেশনা।

অস্ত্রির হয়ে উঠেছে রাফি। অপেক্ষা করছে জিনার ইঙ্গিতের। ইঙ্গিত পেলেই এখন ঘেউ ঘেউ করে ছুটে গিয়ে খাপিয়ে পড়বে কুকুরটার ওপর। কিন্তু তার নাকে আলতো টোকা দিল জিনা। চুপ করে থাকার ইঙ্গিত। ব্যাপারটা ভাল লাগল না রাফির। তবে নির্দেশ অমান্য করল না। জিনার বিরাগভাজন হতে চায় না সে কোনমতই।

কুকুরটার দিকে চোখ সবার।

হঠাৎ যেন মনস্তির করে ফেলল স্প্যানিয়েল। তিন লাফে ছুটে এসে থমকে দাঁড়াল কাটা গাছের ডাঁড়িটার কাছে। এক লাফে উঠে পড়ল ওপরে। খৌচার ওপরের আঁটাটা কামড়ে ধরে আর একটা মুহূর্তও দেরি না করে আবার লাফিয়ে নেমে সোজা ছুটল যেদিক দিয়ে বেরিয়েছে সোনিকে।

এরকম কিছু ঘটবে আশা করেনি কেউ। বোকা হয়ে গেল। কয়েকটা সেকেও নড়ার কথাও মনে হলো না কারও। কিছু বলল না।

সবার আগে কথা ফুটল মুসার। চিন্তকার করে বলল, ‘খাইছে! নিয়ে গেল তো! খৌচাটা চুরি করল...’

‘না, চুরি করেনি,’ গলা কাঁপছে কিশোরের। ‘ওটার মালিক নিচয় চোরেরা। ওরাই পাঠিয়েছে। ইস্ত, আমি একটা গাধা! এরকম কিছু ঘটতে পারে আগেই ভাবা উচিত ছিল।’

কাঁদো কাঁদো গলায় টকার বলল, ‘আর কোন আশা নেই! পিছুও নিতে পারব না, আর ধরতেও পারব না চোরগুলোকে!’

সূম ডেঙে জেগে উঠল জিনা। প্রায় চিন্তকার করে বলল, ‘পারব না মানে? এত সহজেই ছেড়ে দেব! রাফির গলায় আলতো চাপড় দিতে দিতে বলল, ‘এই রাফি, ওঠ। যা, কিছু কাজ দেখা। কুভাটার পিছে পিছে যা। খবরদার, ঝাঙড়া করবি না। চুপে চুপে দেখে আসবি কোথায় যায় ওটা। আমরা বইলাম এখানে। যা। জলদি।’

‘হউ! করে উঠে দাঁড়াল রাফি। পাকা ট্রেনিং পাওয়া। জিনার সব কথাই বোঝে যেন মানুষের মতই।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে গেল সে। কয়েক লাফে খোলা জায়গাটা পেরিয়ে চুকে গেল ওপাশের বনে। তাকে হারিয়ে যেতে দেখল গোয়েন্দারা।

টকারের অপরিচিত নয় রাফি। ও যে কৃত্বান্বিত বৃক্ষিমান, জানে। তবু বিশ্বাস করতে পারল না। জিনার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তোমার সব কথা বুবল ও? ঠিক

ঠিক করতে পারবে?’

মুচকি হেসে জিনা বলল, ‘দেখোই না পারে কিনা।’

‘কি জানি। আমার মনে হচ্ছে বেশি বিশ্বাস করে ফেলেছ ওকে।’

‘তোমার মূখে একথা মানায় না। জানোয়ার পোষা তোমার শখ। ভাল করেই জানো, যতটা বোকা ওদেরকে ভাবা হয় আসলে ততটা নয়।’

‘তা ঠিক। তবে পিছু নিয়ে গিয়ে জায়গা চিনে আসার কথাটা বিশ্বাস করতে পারছি না। বড় জোর গিয়ে স্প্যানিয়েলটাকে ধরে ঝাঙড়া শুরু করবে।’

‘মোটেও তা করবে না। ও আমার কথা বুঝতে পারে। প্রচুর ট্রেনিং দিয়েছি। দেখবে, যা যা বললাম ঠিক করে আসবে।’

এ ব্যাপারে তিন গোয়েন্দা কেন মন্তব্য করল না। রাফিকে ওরা চেনে। জিনা যা বলেছে ঠিকই বলেছে। রাফির বুদ্ধি ওদেরকেও অবাক করেছে বহুবার।

কিশোর বলল, ‘বেশি অস্থির হয়ে পড়েছ বলেই তোমার দুষ্টিতা যাচ্ছে না, টকার। রাফি পারবে। যা বলেছে, করে আসবে।’

‘তাহলে কি শুধুই বসে থাকব আমরা এখন?’

হেসে বলল রাবিন, ‘তাহলে আর কি করবে?’

‘ক্রতৃক্ষণ থাকব?’

কিশোর জবাব দিল, ‘সেটা নির্ভর করে স্প্যানিয়েলটা কত দূরে যায় তার ওপর। তবে বেশিক্ষণ লাগবে বলে মনে হয় না। খাঁচাটা যত ছোটই হোক, একটা কুকুরের জন্যে কম ভারি নয়। কামড়ে ধরে ছুটতে ছুটতে একটা সময় চোয়াল ব্যাখ্যা হয়ে যাবে কুকুরটার। যত ট্রেনিং পাওয়াই হোক, জিরানোর জন্যে থামতে ওকে হবেই। খাঁচাটা নামিয়ে রাখবে মাটিতে। তারপর আর তুলে নেবে কি নেবে না, সন্দেহ আছে। তার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে সেটা। কাজেই তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করবে না কিডন্যাপাররা। ওর চোয়াল ব্যাখ্যা হওয়ার আগেই খাঁচাটা নিয়ে নিতে চাইবে। আর তা করতে হলে বেশি দূরে থাকা চলবে না ওদের।’

‘না থাকলেই ভাল।’

চুপ হয়ে গেল টকার।

আর ঘোপে বসে থাকার কোন দরকার নেই। বেরিয়ে এল ওরা। খোলা জায়গায় বেরিয়ে ঘাসের ওপর আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বসল। সময় কাটানোর জন্যে গল্প শুরু করল।

টকার তাতে ভাল করে যোগ দিতে পারল না। সে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ঘোপের দিকে।

সময় কাটছে। আসছে না রাফি।

আস্তে আস্তে দৈর্ঘ্য হারাচ্ছে সবাই। ওরাও এখন বার বার তাকাচ্ছে ঘোপের দিকে। রাফিকে দেখার আশায়।

ভাবনাটা রবিনের মাথায়ই এল প্রথম। বলল, ‘তয় লাগছে, বুঝলে? রাফি যদি আর না ফেরে?’

ঝাঁট করে তার দিকে চোখ ফেরাল জিনা, ‘মানে? ফিরবে না মানে? ভাল

করেই জানো, আমার কথা কখনও অমান্য করে না সে...'

'না, সে কথা বলছি না, জিন। আমি ভাবছি অন্য কথা। যদি কিউন্যাপারদের চোখে পড়ে যায় ও? ওরা তার ক্ষতি করে?'

তাই তো! একথাটা তো তেবে দেখা হয়নি। চোরগুলোর কথা কিছুই বলা যায় না। ওরা ওকে শুনি করেও মেরে ফেলতে পারে। অন্তির হয়ে উঠে দাঢ়াতে গেল জিন।

হাত ধরে তাকে টেনে বসিয়ে দিল মুসা। 'চুপ করো! একটা শব্দ শুনলাম।' কান খাড়া করল সবাই।

আবার হলো শব্দ। শুকনো পাতায় পা পড়েছে কারও।

অধীর হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রাইল সবাই।

কয়েক সেকেণ্ডের বেশি অপেক্ষা করতে হলো না। ঝোপের ডেতর থেকে বেরিয়ে এল রাফি।

ছেলেমেয়েদেরকে দেখতেই হউ! হউ! করে লম্বা ডাক ছেড়ে ছুটে আসতে লাগল তাদের দিকে।

আনন্দে লাফ দিয়ে উঠে তার দিকে দৌড় দিল জিন।

অন্যেরাও বসে রাইল না। উঠে জিনার পেছন পেছন এগোল।

ছয়

আধ মিনিট পরেই রাফির পেছন পেছন আবার বনে চুকল দলটা। ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সে। আশায় আনন্দে দুলছে ওদের বুক। রাফি কথা বলতে পারে না। কাজেই ওদেরকে বলতে পারল না কিউন্যাপারদের আস্তানা দেখে এসেছে কিনা। তবে স্প্যানিয়েলটা কোথায় গেছে এটা যে দেখেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সারি দিয়ে চলেছে ওরা। সবার আগে, অর্থাৎ রাফির ঠিক পেছনেই রয়েছে টকার। টারকজকে দেখার জন্যে আর তর সইছে না। কাঁটা ডালে ঘষা লেগে হাত-মূখের চামড়া ছড়ে যাচ্ছে যে খেয়ালই করছে না। টারকজকে ফিরে পেতে যে কোন কাজ করতে সে রাজি। মারাত্মক বিপদের মুখোমুখি হতেও পিছ পা হবে না।

ছুটে চলেছে রাফি। তার সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সবাই। দুবার শেকড়ে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টকার। দুবারই তাকে টেনে তুলল মুসা। বলল, 'দেখে হাঁটতে পারো না?'

বনের পথে এত তাড়াতাড়ি চলতে সবারই অসুবিধে হচ্ছে। রাফিকে আরেকটু আস্তে চলতে বলল জিন।

বেশিক্ষণ লাগল না, বন থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

এদিক ওদিক তাকাতে লাগল রবিন, 'এবার কোন দিকে?'

'কোন দিকে, রাফি?' জিজেস করল জিন।

ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। সাগরের দিকে নেমে

গেছে ঢাল। চাঁদের আলোয় সাগরের পানিকে তরল রূপার মত লাগছে। ওদের পেছনে বন। তার ওধারে বিগ হোলো ধাম। সামনে শুধু সাগর আর আকাশ।

সাগরের দিকে নেমে চলল রাফি। একটা পথ চলে গেছে পানির দিকে।

চারপাশে তাকিয়ে শিস দিয়ে উঠল মুসা। ‘আমাদেরকে সৈকতে নিয়ে চলেছে কেন ও? বাড়ি নেই ঘর নেই, চ্যাটো সৈকত। জিনা, রাফি ভুল করেনি তো?’

‘তুমি করতে পারো, রাফি করবে না,’ ফুঁসে উঠল জিনা। রাফির সামান্যতম সমালোচনা সইতে পারে না সে, যে-ই করুক। ‘দেখোই না কি করে?’

‘কিন্তু চোরগুলোর কোন জায়গা তো দেখতে পাচ্ছি না?’

‘কথা না বলে হাঁটো ওর পেছন পেছন,’ বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর।

সৈকতের কোমল মিহি বালিতে এসে এক মৃহূর্তের জন্যে থামল রাফি। তারপর মাটির দিকে নাক নামিয়ে উঁকতে উঁকতে এগোল। একটা জায়গায় এসে চুক্ক দিয়ে ঘূরতে লাগল, একই জায়গায়।

‘কোন কিছুর গন্ধ পেয়েছিস?’ জিজেস করল জিনা।

জবাব দিল না রাফি। একই ভাবে ঘূরছে।

পকেট থেকে টর্চ বের করে জুলল কিশোর। বালিতে আলো ফেলে দেখল। প্রায় একই সঙ্গে অশ্ফুট শব্দ করে উঠল অন্য চারজন।

রাফি কি উঁকছে দেখতে পেয়েছে সবাই। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট হয়নি, তাই বুঝতে পারেনি। টর্চের আলোয় পরিষ্কার।

‘পায়ের ছাপ!’ চাপা গলায় বলল রবিন।

‘মানুষের,’ জিনা বলল। ‘দেখো, পাশাপাশি গেছে আরেকটা কুকুরের পায়ের ছাপ।’

‘দুজন লোক,’ দেখতে দেখতে বলল মুসা। ‘দুই ধরনের জুতো। গামবুটের সোলের মত লাগছে।’

‘কিন্তু গেছে তো সাগরের দিকে।’

‘হ্যা।’ কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। জানতে চায়, এবার কি করবে?

কি ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কারও।

কিশোর বলল, ‘নৌকা নিয়ে এসেছিল ব্যাটারা। নিজেরা এখানে থেকেছে। স্প্যানিয়েলটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে খাচাটা তুলে আনার জন্যে। কুকুরটা ওটা নিয়ে ফেরার পর ওকে আবার নৌকায় তুলে নিয়ে চলে গেছে।’

‘সে তো বুঝেইছি,’ রবিন বলল। ‘এখন কি করব?’

নৌকা নিয়ে গেছে। কোন দিকে গেছে কে জানে? অনুসরণ করার উপায় নেই। হতাশ হয়ে মুসা বলল, ‘উপকূলের যে কোন গায়ে গিয়ে উঠতে পারে। বের করব কি করে?’

জিনা বলল, ‘ধারেকাছে কোন শুহায় গিয়েও চুক্তে পারে। পাহাড় যখন আছে, শুহাও নিচয় আছে। তাতে চিতাটাকে লুকিয়ে রাখাও সহজ।’

মুসা বলল, ‘থাকলেই কি? এখন সেটা খুঁজে বের করতে পারব না। এখানে থেকে আর কি করব? চলো, যাওয়া যাক। টকার, যাবে না?’

কিন্তু এভাবে খালি হাতে বাড়ি ফেরার কোন ইচ্ছেই নেই টকারের। বিছানার
গুয়েও কোন লাভ নেই। ঘূমাতে পারবে না।

টর্চ নিয়ে দিল কিশোর। টকারের মতই তারও খালি হাতে বাড়ি ফিরতে
ইচ্ছে করছে না। বলল, ‘একটা কিছু করা দরকার।’ নিজেকেই প্রশ্ন করল, ‘কিন্তু
কি করব?’

কেউ উপায় বাতলাতে পারল না।

‘এসো, আলোচনা করে দেখি। বুদ্ধি একটা বেরিয়েও যেতে পারে।’

সবাই ঘিরে এল তাকে।

‘নৌকা নিয়ে এসেছিল ওরা, রাইট?’ কিশোর বলল। কারও জবাবের
অপেক্ষায় না থেকে নিজেই বলল, ‘এর দুটো কারণ হতে পারে। একটা তো
বুঝতেই পারছি, যাতে কেউ পিছু নিতে না পারে সে জন্যে। আরেকটা কারণ
হলো, কাছাকাছিই থাকে ওরা। এই কথাটা গোপন রাখতে চায়।’

‘হঁম, এটা সম্ভব,’ মাথা দোলাল রবিন।

‘আর যেহেতু নৌকা নিয়ে এসেছে, কাছাকাছিই কোথাও সেটা ভেঙ্গাতে হবে
ওদের। কারণ জোয়ার আসছে। সৈকত পুরো ঢেকে যাবে। ডাঙায় উঠতে হলে
তাড়াতাড়ি করতে হবে। নইলে পানির জন্যে নামতে পারবে না। আমাদেরও
তাড়াতাড়ি করতে হবে। কোথায় নেমেছে ওরা, জোয়ারের আগে সেটা বের
করতে না পারলে পরে আর পারব না। পানিতে সব দাগ আর চিহ্ন ধূয়ে মুছে
যাবে।’

‘কোনখানে যেতে চাও তুমি?’ বুবাতে না পেরে জিজেস করল মুসা।

‘কাছেই দুটো ছোট ছোট খাড়ি আছে। দিনের বেলা ম্যাপ ঘাঁটাঘাঁটি
করেছিলাম যে, তখনই দেখেছি। আমার বিশ্বাস ওগুলোরই কোনটাতে নৌকা নিয়ে
চুক্ষে ওরা। তাড়াহড়ো করতে পারলে হয়তো আজ রাতেই চিতা রহস্যের
একটা কিনারা করে ফেলতে পারব।’

‘খাড়ি দুটো আমি চিনি,’ প্রায় চিন্তকার করে বলল টকার। আবার আশার
আলো দেখতে পেয়েছে। ‘চলো, জলনি চলো। শর্টকাটেই নিয়ে যেতে পারব।’

‘তাহলে তো ভালই। চলো।’

কিন্তু মুসার মনে হলো এভাবে গিয়ে সুবিধে হবে না। বরং বিপদে পড়ার
সন্তান। বলল, ‘সোজা গিয়ে বাঘের মুখে পড়ব না তো? লোকগুলো বড়
হঁশিয়ার।’

‘অপরাধীরা হঁশিয়ারই হয়,’ কিশোর বলল। ‘নাথিৎ ডেনচার, নাথিৎ উইন।
আর অত ভয় কিসের? অনেক লোক আমরা। রাফিকে নিয়ে সাতজন।’

‘সাতজন দেখলে কোথায়? ছয়জন।’

‘আমাদের উবল ক্ষমতা রাফিক। কাজেই তাকে দুজন ধরছি। কামড়াকামড়ির-
হিসেবটা ধরলে আরও বেশি...’

‘ব্যস ব্যস হয়েছে, আর দরকার নেই,’ দুই হাত তুলে নাড়তে নাড়তে মুসা
বলল। ‘তোমার সঙ্গে কথায় যে পারব না সে তো জানিই। তা-ও বলতে
গিয়েছিলাম। চলো, কোথায় যেতে হবে।’

‘টকার, এগোও,’ কিশোর বলল।

সাগরের দিকে পেছন করে হাঁটতে শুরু করল টকার। টিলাটক্করে ডরা একটা জংলা জায়গা পেরিয়ে ঘুরে আবার বেরিয়ে এল সৈকতে। বালির চেয়ে পাথরই বেশি এখানে। ক্রমাগত ঢেউয়ের ঘষা খেয়ে খেয়ে মসৃণ চকচকে হয়ে গেছে পাথরগুলো। তার ওপর দিয়ে হাঁটতে অসুবিধে হয়।

তবু থামল না ওরা। এসে দাঁড়াল প্রথম খাঁড়িটার পাড়ের ছোট সৈকতে।

‘এই, তোমরা সব দাঁড়াও এখানে,’ কিশোর বলল। ‘আমি আর মুসা গিয়ে উকি দিয়ে দেখে আসি খাঁড়িগুলোতে। একদম নড়বে না।’

‘আমি আসব তোমাদের সঙ্গে,’ জেদ ধরল টকার।

‘দেখো, বেশি লোক গেলে বিপদ...’

‘আমি গেলে তোমাদের সুবিধে। কারণ এ জায়গা আমার চেনা, তোমাদের অচেনা...’

‘ঠিক আছে, এসো। তবে শব্দ করবে না। এই রাফি, আয়।’

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিশোরদের চলে যেতে দেখল জিনা আর রবিন।

টর্চ জ্বাললে ভাল হত, পায়ের ছাপ থাকলে দেখা যেত, কিন্তু ঝুঁকি নিল না কিশোর। কাছাকাছি থাকলে আলো দেখে ঝুঁশিয়ার হয়ে যাবে চোরেরা।

‘রাফি, মাটি শুঁকে দেখ, গন্ধ পাস নাকি,’ বলে তার মাথায় আলতো একটা চাপড় দিল কিশোর।

ইঙ্গিতটা বুলবুল রাফি। নাক নিচু করে শুঁকতে শুরু করল। কিন্তু কিছুই পেল না। এদিকে মনে হয় আসেনি লোকগুলো।

শেষ পর্যন্ত টর্চ জ্বালার ঝুঁকিটা আর না নিয়ে পারল না কিশোর। মাটিতে ছাপ থাকলে আলো ছাড়া দেখা যাবে না।

কিন্তু একটা ছাপও নেই। আগের দিন জোয়ারের পরে আর কেউ আসেনি এদিকটায়।

হতাশ হয়ে রবিন আর জিনার কাছে ফিরে এল ওরা।

‘দ্বিতীয় খাঁড়িটায়ও দেখব,’ অতটা আশা আর করতে পারছে না কিশোর, তবু হাল ছাড়তে রাজি নয়।

এবারও পথ দেখিয়ে আগে আগে চলল টকার।

নাহ, দ্বিতীয় খাঁড়িটার কাছে এসেও কোন সুবিধে করা গেল না। পায়ের ছাপ আছে এখানকার সৈকতে, প্রচুরই আছে, কিন্তু কোনটা যে চোরগুলোর বোৰার উপায় নেই। লিটল হোলো গায়ের লোক এখানে নিয়মিত আসে সাতার কাটতে। বালিতে তাদের পায়ের ছাপ।

আর কিছু করার নেই। বড়ই নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে চলল গোয়েন্দাদের দলটা। মুখ নিচু করে রেখেছে টকার। অনেক কষ্টে চেপে রেখেছে চোখের পানি। তার প্রিয় টারকজকে পাওয়া গেল না। মনে মনে ফুঁসছে সে—যদি খালি ধরতে পারতাম ব্যাটাদের...

পা টিপে টিপে বাড়িতে চুকল ওরা। প্রফেসরের ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে।

নিচয় তিনি কাজে ব্যস্ত । ভালই হয়েছে । নইলে ওরা যে এত রাত পর্যন্ত ঘরে ছিল
না জেনে যেতেন । কৈফিয়ত দিতে দিতে তখন জান বেরোত ।

কিন্তু ডোরা? ডোরা কি করছে? নিচয় ওদের দেরি দেখে ঘুমিয়ে পড়েছে ।
সকালে খুব একচোট বকা খেতে হবে । বুরুক, যত খুশি । কেয়ার করে না ওরা ।
কেবল কারস আংকেলকে বলে না দিলেই হলো ।

ভীষণ গভীর হয়ে আছে কিশোর । এভাবে যে ওদের উপর টেক্কা দেবে
চোরগুলো, কল্পনাই করতে পারেনি । তাহলে অন্য কোন একটা বুদ্ধি করেই
বেরোত । কে ভাবতে পেরেছিল নিজেরা না এসে একটা কুকুরকে পাঠাবে চিঠি
তুলে নিয়ে যেতে!

বেশ, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর, চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করলাম আমি
তোমাদের । এর একটা বিহিত যদি না করি আমি, আমার নাম কিশোর পাশা নয়!

সাত

পরদিন উজ্জল রোদ উঠল । একরতি মেঘ নেই আকাশে । সাগরের দিক থেকে
আসা উষ্ণ কোমল একবালক বাতাস বাগানের গাছগুলোর মাথা দুলিয়ে দিয়ে গেল ।
গ্রীষ্মের চমৎকার একটা দিন । এমন দিনে বিগ হোলোর লোকের মনে খুশির আমেজ,
ফুরফুরে মেজাজ । কেবল কয়েকজনের বাদে । তারা বিষণ্গ । প্রকৃতি তাদের মনে
দাগ কাটতে পারেনি । আর তারা হলো আমাদের কিশোর গোয়েন্দারা ।

ভাবি মন আর মেঘে ঢাকা মুখ নিয়ে যেন ঘুম থেকে উঠল ওরা । টকারের চোখ
লাল । নিজের ঘরে একলা শয়ে শয়ে অনেক কেঁদেছে । কারও দিকে তাকাতে
পারছে না । তার অবস্থা দেখে তেতরে তেতরে রাগে ফুসছে জিনা আর মুসা ।
মুসার তো বার বার মুঠোবন্ধ হয়ে যাচ্ছে হাত । সামনে পেলে ঘুসই মেরে বসত
কিডন্যাপারদের নাকে ।

ডোরাও মন খারাপ । থেকে থেকেই ফোস ফোস করে নিঃশ্বাস ফেলছে ।
মুখ গোমড়া করে রেখেছে । টকারের দুরবস্থা দেখে, রাতে কোথায় গিয়েছিল সে
কথা আর জিজেস করতে ইচ্ছে হলো না ।

সব বিষণ্গতার মাঝেও কেবল প্রফেসর কারসওয়েলই স্বাভাবিক রয়েছেন ।
টারকজ আর কিডন্যাপারদের একেবারে দূর করে দিয়েছেন মন থেকে । ফরম্বুলা
ছাড়া আর কোন ব্যাপারেই মাথা ঘামাচ্ছেন না । খুব শীঘ্ৰই শেষ হয়ে যাবে কাজ,
সেই আনন্দ আর উজ্জেবন্য মশগুল তিনি ।

তাড়াতড়া করে নাস্তা সেরে উঠে চলে গেলেন প্রফেসর ।

বস্তু তার বাবাকে হাদয়হীন ভেবে বসতে পারে একথা মনে করে টকার
বলন, ‘আৰুৱাৰ মন নেই একথা বলা যাবে না । খুবই আছে । অনেক মানবের চেয়ে
অনেক বেশিই আছে । আসলে কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না তো । দুনিয়াৰ আৱ
কোন দিকেই খেয়াল থাকে না ।’

‘সেটা আমরা জানি,’ জিনা বলল ।

এত মানসিক চাপ সইতে না পেরে মেজাজ খারাপ হয়ে আছে ডোরার। ঝাঁজাল কষ্টে বলল, 'তোমাদের খাওয়া হয়ে গিয়ে থাকলে এখন দয়া করে ওঠো। মুখগুলোকে ওরকম করে রেখো না। বাইরে চমৎকার আবহাওয়া। বাগানে গিয়ে খেলতে পারো। ইচ্ছে হলে সাইকেল নিয়ে দূরেও কোথাও যেতে পারো। যা করো করো, কেবল ঘরে বসে থেকে আমাকে জ্বালিও না।'

ঘরে বসে থাকার ইচ্ছে যেমন নেই ওদের, সাইকেল নিয়ে বেরোতেও ভাল লাগছে না। পিকনিক কিংবা হাসি-আনন্দ এই মুহূর্তে ভাল লাগছে না ওদের। ডোরাকে বিরক্ত না করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

'আমাৰ কিছু কৰতে ইচ্ছে কৰছে না,' টকার বলল।

'একটা সূত্র-টুত্র পাওয়া গেলে খুব ভাল হত,' আনমনে বলল কিশোর। 'চিতাটাকে খুঁজতে যেতে পারতাম...'

সবাইকে চমকে দিয়ে চিংকার করে উঠল রবিন। হাঁটতে হাঁটতে গেটের কাছে চলে এসেছে ওরা। তার চোখ পড়েছে ডাক-বাঙ্গাটার ওপর। সাদা একটা খামের কোণা বেরিয়ে আছে। কিডন্যাপাররা যে খামে করে চিঠি দিয়েছে, সেই একই রকম খাম।

'চিঠি! বলতে বলতে ছুটে গেল সে।

অন্যেরাও দৌড় দিল সেদিকে। সবার আগে পৌছল টকার। বাঞ্ছ খুলে বের করল চিঠিটা। কিডন্যাপারদেরই চিঠি, কোন সন্দেহ নেই। খাম দেখেই বোৰা যায়।

বাগে কালো মুখ আৱারও কালো হয়ে গেল মুসার। বাতাসে মুঠো তুলে ঝাঁকাতে লাগল। ভয় পেয়ে গিয়ে টকারের ঘাড়ে মুখ শুভল নটি।

'হায় হায়, কি গাধামিটাই না কৱলাম!' আফসোস করতে লাগল কিশোর। 'কাল রাতে লেটার বক্সে চোখ রাখার কথা মনে হয়নি একটিবাৰও। রাখলে ধৰে ফেলতে পারতাম।'

মাথা নাড়তে নাড়তে জিনা বলল, 'চিঠি যে দেবে সেটা তো আৱ জানতে না। এমনও হতে পাৰে, আমৰা যখন সৈকতে গিয়ে ওদেরকে খোঁজাখুঁজি কৱছি তখন ফেলে গেছে।'

'মনে হয় না। তখন সময় পায়নি। চিঠিটা নিয়ে গিয়ে পড়েছে। এৱপৰ কি কৱা যায় সেটা নিয়ে আলোচনায় বসেছে। আৱেকটা চিঠি লিখেছে। তাৱপৰ ফেলতে এসেছে বাঞ্ছ। ফেলেছে আমৰা আসাৰ পৰ। যদি খালি একটিবাৰ মাথায় আসত কথাটা, ইস...কাল চোখ রাখলে ঠিক ধৰে ফেলতে পারতাম।'

লাখি মেৰে খোয়া বিছানো পথ থেকে একটা ইটের টুকুৰো ছুঁড়ে ফেলল টকার। অধৈর্য কষ্টে রবিনকে বলল, 'কি লিখেছে জানা দৱকাৰ। চলো, আৰ্বাৰ কাছে নিয়ে যাই।'

খামটা উল্টো কৰে ধৰে রেখেছিল এতক্ষণ রবিন। নাড়াচাড়া কৰতে গিয়ে চোখ পড়ল ঠিকানাটার ওপৰ। চিংকার কৰে উঠল, 'আৱি! তোমাৰ আৰ্বাৰ নয়, তোমাৰ নাম! তোমাকে লিখেছে চিঠিটা!'

একটান দিয়ে রবিনের হাত থেকে খামটা প্রায় কেড়ে নিল টকার। ফড়াৎ করে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলন খামের মুখ। কাঁপা হাতে ডেতরের কাগজটা খুলতে গিয়ে হাত থেকে ফেলে দিল।

দেরি আর সহ্য হচ্ছে না কিশোরের। নিচু হয়ে টকারের আগেই তুলে নিল চিঠিটা। বলল, 'তোমার যা অবস্থা, পড়তেই পারবে না। আমিই পড়ি।'

সবাই ঘিরে এল তাকে। গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে হাতের কাগজটায় কি লেখা আছে। কিছু একটা ঘটছে আন্দাজ করে ফেলেছে রাফি আর টকার। ওরাও গলা বাড়িয়ে দিয়েছে।

জোরে জোরে পড়ল কিশোর, 'তোমার আব্দা আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়নি। কাজটা ভাল করেনি। আমরা জানি চিতাটাকে তুমি কতটা ভালবাস। তাই আরেকটা সুযোগ দিছি।...'

থেমে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। সবাই উন্মেষিত। শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছে। টকারের তো চোখ যেন চেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে।

আবার পড়তে লাগল কিশোর, 'যদি চিতাটাকে আবার দেখতে চাও, তোমার আব্দা ফরমুলাটা চুরি করে এনে দেবে আমাদেরকে। ল্যাবরেটরিতে ঢোকা তোমার জন্যে সহজ। এবার আমাদের কথা না শুনলে আর জ্যান্ট দেখবে না চিতাটাকে। সেই সঙ্গে তুমি তো বটেই, তোমার বক্সরাও বিপদে পড়বে। ভীষণ বিপদ। সুতরাং যা বলছি করো। ফরমুলাটা নিয়ে আসবে বনের ডেতরের খোলা জায়গায়। যেখানে আগের বার রেখে গেছিল তোমাদের হাউসকীপার। বিষ্ণুৎবার রাতে আসবে। একা। সাবধান, একথা কাউকে কিছু বলবে না। তাহলে খুব খারাপ হবে।'

চিঠির নিচে সই নেই। ধাকবে আশাও করেনি কিশোর।

'একই জ্ঞান্যায় রাখতে বলেছে,' বিড়বিড় করল মুসা।

'কিন্তু কোন কিছুর বিনিময়েই আব্দা জিনিস চুরি করতে পারব না আমি,' টকার বলল।

'তা তো করবেই না,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'ভেব না। চার দিন সময় পেয়েছি হাতে। একটা না একটা বুদ্ধি বেরিয়েই যাবে।'

'তো?' কিশোরের দিকে তাকাল জিনা, 'এখন কি করব? হাত-পা শুটিয়ে বসে তো আবার ধাকতে পারব না। একটা কিছু করা দরকার।'

'তা তো করবই। চারটে দিন যখন পেয়েই গেলাম, পুরোদমে তদন্ত চালিয়ে যাব।'

টারকজ এখনও বেঁচে আছে, সুস্থ আছে জেনে মেঘ কেটে গেছে টকারের মুখ থেকে। আবার সজীব হয়ে উঠেছে। বলল, 'চার দিন ব্যাটাদের ধরার জন্যে অনেক সময়।'

তর্জনী নাচাল কিশোর, 'শোনো কি করব। প্রথমে বিগ হোলোতে খুঁজব আমরা। কিছু না পেলে তারপর যাব লিটল হোলোতে। চিতাটাকে লুকিয়ে রাখা

যায় এরকম কোন জ্ঞান বাকি রাখব না। এই দুটো গায়ে না পেলে চলে যাব
পাশের গায়ে। রাফি আমাদের সাহায্য করবে। টকার, টারকজ কোথায় ঘুমাত,
চলো তো দেখি। ভাল করে তার গায়ের গন্ধটা রাফিকে ঝঁকিয়ে নিই।'

আট

দশ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা। দিনের বেলায় এখন
নটিকে নিতে কোন অসুবিধে নেই। বলা যায় না, কাজেও লেগে যেতে পারে।
তাই তাকে সঙ্গে নিল টকার।

প্রথমে একটা পরিত্যক্ত পুরানো খামারে সবাইকে নিয়ে এল সে। চিতার মত
একটা জানোয়ারকে ওখানে সহজেই লুকিয়ে রাখা যায়।

তেতরে চুকে দেখার প্রয়োজন পড়ল না। বিশেষ ভাবে নির্দেশ দিয়ে নটিকে
ছেড়ে দিল টকার। উচু দেয়াল, গাছের ডাল, ঘরের চাল আর জানালায় উঠে ভাল
করে খুঁজে এল বানরটা। টারকজকে দেখতে পেল না। দেখলে চেঁচামেচি শুরু
করত। নেমে এসে টকারের কাঁধে চড়ল আবার।

একটু পর পরই টারকজের গন্ধ মেশানো এক টুকরো কাপড় ধরা হয় রাফির
নাকের সামনে। সেই গন্ধের মালিক কোথায় আছে খুঁজে বের করতে বলা হয়
তাকে।

'এভাবে হবে না, বুঝলে,' কিশোর বলল। 'সারা গায়ে তো আর চিতার গন্ধ
ছড়িয়ে নেই যে বের করবে। সন্দেহজনক জ্ঞানগুলোতে গিয়েই কেবল ওকে
খুঁজতে বলা উচিত।'

'ওর ভুল হচ্ছে না তো?' মুসা বলল।

'রাফি করবে ভুল?' রেগে উঠল জিনা। 'ও কঙ্কনো ভুল করে না।'

বিগ হোলোর কোন জ্ঞান বাদ দিল না ওরা। লিটল হোলোরও অর্ধেক
খোঁজা শেষ। নিরাশা আবার চেপে ধরতে আরম্ভ করেছে টকারকে।

'পাব তো?'

'অত তাড়াতাড়িই আশা ছাড়ার কিছু নেই,' দৃঢ়কষ্টে বলল কিশোর। 'নিচয়
পাব।'

খোঁজাখুঁজি চলতে থাকল।

পুরানো একটা গোলাবাড়ির দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল রাফি। পান্তার
নিচের দিকের কাঠ পচে নরম হয়ে গেছে। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে ঝঁকতে
আচমকা গরগর শুরু করল সে। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেল।

'খাইছে!' চাপা গলায় বলল মুসা। 'পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে!'

ছোট একটা খামারের মধ্যে ঘরটা। খানিক দূরে উঠানে করকর, ক্যাককেঁক
করছে অনেকগুলো মুরগী। শস্য ছিটিয়ে দিচ্ছে এক মহিলা। সেগুলো খাওয়ার জন্যে
তার চারপাশে ঘুরঘুর করছে মুরগীগুলো।

মুরগীর ডাকাডাকি ছাড়িয়ে একটা ঘরের ওপাশ থেকে শোনা গেল একটা

বিরক্তি মেশানো কর্কশ পুরুষকষ্ট, ‘ধরে ফেলেছিলাম আরেকটু হলেই। পালাল। কেৰায় যে লুকাল বুঝতে পাৱলাম না। ব্যাট। ধৰতে পাৱলে আজ মুৱগী চুৱি বৈৰ
কৰতাম।’

‘একটা কৃতা দৱকাৰ আমাদেৱ, টম,’ চাষীৰ স্তৰি বলল। ‘সোৱাৱটা মৱাৰ পৱ
থেকেই তো চোৱেৱ উৎপাত। আজ এটা, কাল সেটা, নিয়েই তো চলেছে।
তোমাকে কত বলছি একটা কৃতা আনতে, কানই দাও না।’

ফিসফিস কৰে টকার বলল, ‘তনলে? মুৱগী চুৱি হচ্ছে। নিক্ষয় কিডন্যাপারৱা।
টারকজকে খাওয়ানোৰ জন্যে ধৰে নিয়ে যাচ্ছে।’

‘কিন্তু খাওয়ানোৰ তো কথা নয়,’ রবিন বলল। ‘ওৱা বলেছে ওকে না থাইয়ে
ৱাখবে, যাতে বুনো হয়ে ওঠে। জিনা, রাফিটা কিসেৰ গন্ধ পেয়েছে কিছু বুঝতে
পাৱছ?’

রাফিৰ ‘নাকে হাত রেখে ওকে চুপ কৱতে বলল জিনা। যা দেখে উত্তেজিত
হয়েছে সেটাকে খুঁজে বেৰ কৱতে বলল।

নিৰ্দেশ পেয়ে পান্নার নিচেৰ কাঠ অঁচড়াতে শুক কৱল রাফি। কয়েকটা
অঁচড় দিয়েই তলাৰ মাঠ খুড়তে লাগল।

‘সাবধান রাফি,’ মুসা বলল, ‘কিডন্যাপারৱা ভেতৱে থাকতে পাৱে।’

‘কিংবা টারকজ,’ বলল টকার।

‘ওৱা নেই,’ অধৈৰ্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিশোৱ। ‘এখানে কিডন্যাপারৱা
থাকতে পাৱবে না। টারকজকেও লুকিয়ে রাখা সন্তোষ নয়। দেখছ না, কাছেই মানুষ
থাকে। অন্য কিছু আছে।’

‘সেটাই দেখব,’ মুসা বলল। ‘কাছাকাছি তো কাউকে দেখছি না। দৱজা
ভেঙ্গে ঢুকব নাকি?’

বীধা দিতে গেল জিনা, ‘না না, চাষীৱা কাছাকাছিই আছে। শব্দ শুনে চলে
এলে...’

কিন্তু জিনার কথা শেষ হওয়াৰ আগেই দৱজাৰ গায়ে কাঁধ লাগিয়ে ঠেলতে
আৱশ্য কৱল মুসা। কিশোৱ তাকিয়ে রইল পথেৰ দিকে। কেউ আসছে কিনা
দেখছে। এলে হাশিয়াৰ কৰে দেখে মুসাকে।

পুৱানো পান্না। কজাঙ্গলোও মৱচে পড়া, পুৱানো। প্ৰচণ্ড চাপ সইতে না পেৱে
মড়মড় কৱে খুলে এল কাঠ থেকে। বাটকা দিয়ে খুলে গেল দৱজা। ভেতৱে শিয়ে
হাড়ি খেয়ে পড়ল মুসা। স্থুপ কৱে রাখ্য আছে বাগান কৱাৰ আৱ চাষেৰ যন্ত্ৰপাতি।
ওগুলোৱ ওপৱে পড়ে যে জথম হলো না সে এটাই আশ্চৰ্য।

দৱজা ভাঙাৰ আৱ যন্ত্ৰপাতি পড়াৰ বিকট শব্দ হলো। ওদেৱ মনে হলো, পুৱো
গীয়েৰ লোক শুনে ফেলেছে এই শব্দ।

‘মুসা, ব্যাধা পেয়েছি! চেঁচিয়ে উঠল জিনা।

‘না...ঠিকই আছে...’

প্ৰচণ্ড ঘেউ ঘেউ কৱে দাঁত খিচিয়ে ঘৱেৱ কোণে ছুটে গেল রাফি।

ওকে ধৱাৱ জন্যে ছুটে এল জিনা। দেখে, ঘৱেৱ কোণে জড়সড় হয়ে আছে

একটা লোক। মানুষের এত রোমশ শরীর আর দেখেনি সে। লম্বা লম্বা চুল, গৌফ-দাঢ়ি, যেন একটা বনমানুষ। ডয়ে কাপছে। দুহাত পেছনে নিয়ে গিয়ে কি যেন লুকানোর চেষ্টা করছে।

পারল না। দেখে ফেলল গোয়েন্দারা। দুটো মুরগী। গলা মুচড়ে মেরে ফেলেছে। যাতে কঁক কঁক করতে না পারে।

‘বাহ, তাহলে এই কাও,’ মুচকি হাসল মুসা। হাত উলছে। ছড়ে গেছে জায়গাটায়।

‘খবরদার, নড়বে না,’ লোকটাকে ধরক দিয়ে বলল জিনা। ‘গলা কামড়ে ধরতে বলব কিন্তু কুকুরটাকে।’

‘সরাও...সরাও ওকে!’ ককিয়ে উঠল লোকটা। ভীষণ তয় পাছে রাফিকে। ‘কামড়ে দেবে তো।’

গোলাঘরের বাইরে ভারি পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। এত গওগোল কিসের দেখতে এসেছে চাষী আর তার এক সহকারী।

‘এই, কি হচ্ছে?’ চাষী বলল। ‘ও, এই ব্যাপার। এখানেই এসে লুকিয়েছে তাহলে। তাই তো বলি, গেল কোথায়? ভাবতেই পারিনি এত কাছে এসে লুকাবে।’

‘আমার কুকুরটা ওর গন্ধ পেয়েছে,’ গর্বের সঙ্গে বলল জিনা। ‘নইলে কি আর আমরাই ধরতে পারতাম। নিন, ধরুন। নিয়ে গিয়ে পুলিশে দিন। রাফি, হয়েছে। চুপ কর।’

জিনার দিকে তাকিয়ে হাসল চাষী। তার সহকারী গিয়ে চোরটার কলার চেপে ধরল। জবুত্ব হয়ে গেছে লোকটা। একেবারেই ছিকে চোর।

‘একটা কাজের কাজই করে দিলে তোমরা,’ গোয়েন্দাদের প্রশংসা করতে লাগল চাষী। ‘প্রায়ই মুরগী চুরি হচ্ছিল। কোনমতেই ধরতে পারছিলাম না। চোরের পেছনে সারাদিন তো আর পাহারা দিয়ে বেড়াতে পারি না। আরও হাজারটা কাজ থাকে। এই খানিক আগেও তাড়া করেছিলাম। পালাল। এখানে এসে যে চুকে বসে থাকবে কল্পনাই করিনি।’

ওদেরকে অনেক ধন্যবাদ দিল চাষী।

সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর। বলল, ‘একটা চিতাকে খুঁজছি আমরা। আপনি কি দেখেছেন?’

‘চিতা! আবাক হলো লোকটা। আরপর হেসে উঠল, ‘সে তো চিড়িয়াখানায় থাকে। গাঁয়ে নতুন একটা চিড়িয়াখানা হয়েছে। যাও। ওখানে গেলে পেয়ে যাবে।’

‘আমাদেরটা পোষা।’

আবাক চোখে কিশোরের দিকে তাকাল চাষী। ‘তাই নাকি? তাহলে আর বলতে পারলাম না। তবে জন্মজানোয়ারের ব্যাপারে কিছু বলা যায় না। হয়তো চিড়িয়াখানায় সঙ্গীর দেখা পেয়েছে। রয়ে গেছে ওখানে। এমন হতে পারে না?’

‘তা পারে।’

আর কথা বাড়াল না কিশোর।

চোরটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল চাবী আর তার সহকারী। গোলাঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে গোয়েন্দাৰা।

‘নাহ, কোন কাজই হচ্ছে না,’ রবিন বলল। ‘সবই কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে।’

‘চলো না চিড়িয়াখানাতেই যাই,’ মুসা বলল।

ভুকু কোঁচকাল কিশোর। ‘চিড়িয়াখানা?’ নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। অন্যমনশ্ব হয়ে গেছে।

‘হ্যাঁ। একটা কথা নিচয় মানবে, টারকজকে যে লোক চুরি করেছে সে জানোয়াৰ সামলাতে জানে। টকার, কদিন হলো চিড়িয়াখানাটা বসেছে?’

‘এই বছৰখানেক।’

‘তাহলে তো হয়েই গেল,’ সমাধান দিয়ে দিল মুসা। ‘কারস আংকেল যে বিজ্ঞানী এটা জানার জন্যে প্রচুর সময়। চিড়িয়াখানার মালিকও কিডন্যাপার হতে পারে। কিংবা কীপার, দেখাশোনার ভার যাদের ওপর তারা।’

‘হ্যাঁ,’ মাথা দোলাল কিশোর, ‘মাঝে মাঝে সত্যিই বুদ্ধি খুলে যায় তোমার। ওখানকার লোক হলে চিতাটাকে লুকিয়ে রাখাও সহজ। কোন একটা খাঁচায় বেথে দেবে। লোকে কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।’ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মুখ। ‘মুসা, ভাল কথা মনে করেছ! চলো, চিড়িয়াখানাতেই যাই।’

রওনা হতে যাবে সবাই এই সময় বাধা দিল রবিন, ‘শোনো, একটা ব্যাপার ভাবিন। কিডন্যাপারৰ চিড়িয়াখানার লোক হলে টকারকে চিনে ফেলবে। সন্দেহ করতে পারে।’

‘তাই তো! আজ আমার হলো কি? একটা ভাবনাও যদি ঠিকমত ভাবতে পারতাম,’ বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর। ‘এখন যাওয়া উচিত হবে না। রাতে যাব। আকাশ পরিষ্কারই আছে। বৃষ্টিটিটি হবে বলে মনে হয় না। খাঁচাগুলোকে ঘরে নেয়ার প্রয়োজন মনে করবে না কীপারু। চিতাটা থাকলে সহজেই খুঁজে বের করে ফেলব।’

নয়

রাতে খাওয়ার পর ল্যাবরেটরিতে গিয়ে চুকলেন প্রফেসর কারসওয়েল। টুকটাক হাতের কাজ সেরে ঘূমাতে গেল ডোরা। সুযোগ বুঝে চুপি চুপি আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দাৰা।

চিড়িয়াখানায় পৌছতে বেশিক্ষণ লাগল না।

একটা খোলা মাঠে বসানো হয়েছে চিড়িয়াখানা। কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেৱা। টিকেট করে চুক্তে হয়। তাই নিদিষ্ট প্রবেশ পথ ছাড়া যাতে অন্য কোনখানা দিয়ে লোক চুক্তে না পারে সেদিকে নজর রেখেছে কৃত্পক্ষ। তবু খুঁজতে খুঁজতে বেড়ায় একটা ফোকুর পেয়ে গেল ওৱা। হামাগুড়ি দিয়ে সে পথে ভেতৱে চোকা সন্তুষ।

ঠিক হলো, বাইরে থেকে পাহারা দেবে একজন। কাউকে আসতে দেখলে ভেতরে যাবা যাবে তাদেরকে হাঁশিয়ার করে দেবে। রবিন থাকবে। তার সঙ্গে থাকবে রাকি।

এক এক করে বেড়ার ফোকর দিয়ে ভেতরে চুকে পড়ল অন্যেরা। অন্য পাশে এসে উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কেউ আছে কিনা। চাঁদের আলো আছে। থাকলে দেখা যাবে।

‘কে যেন আছে,’ ফিসফিস করে বলল টকার। ‘ডানে।’

আছে ঠিকই, তবে মানুষ নয়। ছোট্ট একটা জায়গা ধিরে খোয়াড় বানিয়ে তার ভেতরে রাখা হয়েছে দুটো উটপাখি। ঘুমিয়ে আছে পাখি দুটো। নড়ল না।

ডান দিকেই কিছু দূরে কয়েকটা খাঁচা চোখে পড়ল। সেদিকে হাত তুলে কিশোর বলল, ‘জানোয়ারের খাঁচা। এগোও।’

সাবধানে পা টিপে টিপে এগোল চারজনে। শব্দ না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখল।

প্রথম খাঁচাটায় ঘুমিয়ে আছে দুটো সিংহী ও একটা সিংহ। মানুষের সাড়া পেল কিনা বোঝা গেল না। কারণ একটা গোঁফও নাড়ল না।

‘বিড়িয় খাঁচাটার কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল টকার। একটা চিতা। ফিসফিসিয়ে ডাকল সে, টারকজ! টারকজ! উঠে আয়।’

আস্তে করে উঠে দাঁড়াল চিতাটো। এগিয়ে এসে খাঁচার শিক ঘেঁষে দাঁড়াল। টকার তাকে কৌতুহলী করেছে। কিন্তু চিনতে পারার কোন লক্ষণ দেখাল না।

ভাল করে দেখল জানোয়ারটাকে টকার। না, এটা টারকজ নয়।

‘তুমি শিওর?’ হতাশ হয়ে বলল মুসা।

‘হ্যা। টারকজের নাকের পাশে খানিকটা জায়গার লোম সাদা। দূর, কোন লাভ হলো না এসে।’

‘এখানে নেই, এ ব্যাপারে শিওর হওয়া গেল, এই আরকি,’ জিনা বলল।

‘অনেক জায়গা এখনও খোজা বাকি,’ বলল কিশোর। ‘পুরোটায় খুঁজে দেখব।’

ঘূরতে লাগল ওরা। আর একটা চিতাও নেই কোন খাঁচায়। অহেতুক সময় নষ্ট মনে হলো। নিরাশ হয়ে ঘূরে দাঁড়াল, বেরোনোর জন্যে। কিন্তু নটির যাওয়ার ইচ্ছে নেই।

অস্ত্রির হয়ে উঠেছে ছোট্ট বানরটা। হয়েছে অনেকক্ষণ থেকেই। কিন্তু চিতা খোজায় এতই মশাল ছিল টকার, খেয়ালই করেনি এতক্ষণ।

একটা খাঁচার সামনে আসতে হঠাৎ এক লাফ দিয়ে টকারের কাঁধ থেকে গিয়ে খাঁচার শিক ধরে ঝুলে পড়ল নটি। তীক্ষ্ণ কিচিরমিচির পুরু করল। ভেতরে আরও অনেক বানর। একটা নটিরই প্রজাতি। আকারে কিছুটা বড়।

‘এই নটি, আয়। আয় বলছি।’

কিন্তু টকারের ডাক যেন কানেই চুকল না বানরটার। শিকের গায়ে নাক চেপে ধরে হাত চুকিয়ে দিল ভেতরে। তার চেহারার বানরটাকে হাত নেড়ে নেড়ে ডাকতে লাগল।

ভেতরের বানরটাও আঘঢ়ী হলো । এগিয়ে এল কাছে ।

কিচিৰমিচিৰ কৱে প্ৰচুৰ কথা চালাচালি হলো দুটোতে ।

‘চলো, যাই,’ তাড়া দিল মুসা । ‘এখানে দেৱি কৱে লাভ নেই । টকার, ধৰো, বানরটাকে ধৰে আনো ।’

কিন্তু জাতে ওটা বানৰ । ধৰে আলো বললেই তো আৱ আনা যায় না । টকার ধৰতে যাওয়াৰ আগেই শিকেৰ ফাঁক দিয়ে মাথা টুকিয়ে দিয়েছে নটি । দেহটাকে মুচড়ে মুচড়ে চুকে গেল ভেতরে । শৰীৱটা ছোট বললৈ পাৱল । তাৱ সমান হলে ভেতরেৰ বানৰগুলোও এতদিনে খাচায় আটকে থাকত না, বেৱিয়ে যেত বাইৱে ।

ভেতরে ডাল সহ মৰা একটা গাছেৰ কাণ্ড পুঁতে দেয়া হয়েছে মাটিতে । তাতে ঝোলাবুলি শুড় কৱল বানৰদুটো । খেলা জুড়ল । তাড়া কৱে বেড়াতে লাগল একে অন্যকে ।

ধৰা পড়াৰ ভয়ে জোৱে চিঞ্চকাৰও কৱতে পাৱছে না টকার । ফিসফিস কৱে যতটা স্বত্ব ডাকতে লাগল নটিকে ।

কিন্তু খেলা পেয়ে গেছে বানৰ । মনিবেৰ ডাক কানেই তুলল না । চেঁচামেচিতে জেগে উঠল বাকি বানৰগুলোও । মজা পেয়ে ওৱাও খেলা জুড়ে দিল রাত দুপুৰে । সেই সঙ্গে চিঞ্চকাৰ । মৌৰব রাতে বহু দূৰ থেকে শোনা যাবে ওগুলোৰ চেচামেচি ।

ঘাবড়ে গিয়ে চাৰপাশে তাকাতে শুকু কৱল কিশোৱ । তাগাদা দিল, ‘টকার, জলদি বেৱ কৱো ওটাকে ! না পাৱলে থাক । কাল এসে নিয়ে যাব...’

কিন্তু বলতে দেৱি কৱে ফেলেছে । আৱও আগেই যাওয়া উচিত ছিল । বানৰেৰ হাঁকড়াকে জেগে গেছে দুজন-কীপাৱ । কি হয়েছে দেখতে আসছে । দুজনেৰ হাতেই টৰ্চ । একজনেৰ হাতে একটা শটগান ।

তীৰ আলো এসে পড়ল গোয়েন্দাদেৱ গায়ে ।

‘আৱি, পোলাপানগুলো এখনে কি কৱছে ?’ বলল একজন ।

‘বানৰ চুৱি কৱতে এল নাকি ?’ অন্যজনেৰ প্ৰশ্ন ।

ব্যস, গেল রেংগে জিনা । ‘দেখুন, বাজে কথা বলবেন না ! আমৱা চোৱ নই । রাত দুপুৰে আৱ কাজ পেলাম না, বানৰ চুৱি কৱতে এসেছি !’ গজগজ কৱতে লাগল সে ।

‘তাহলে কি জন্যে এসেছ ?’ কৰ্কশ কষ্টে জিজ্ঞেস কৱল কীপাৱ ।

‘আমৱা চোৱ নই,’ মুসা বলল ।

‘তাহলে এসেছ কেন ?’ ধৰক দিয়ে বলল অন্যজন ।

‘ওই ওটা... ওই বানৰটাকে ধৰাৱ চেষ্টা কৱছি...’ ব্যাখ্যা কৱে বোৱাতে গিয়ে আৱও গোল পাকিয়ে দিল মুসা ।

‘তাহলে শীকাৱ কৱছ বানৰ চুৱি কৱতে এসেছ ?’

মুসাৰ হাত চেপে ধৰল লোকটা ।

‘চলো, পুলিশৰ কাছে । যা বলাৱ ওদেৱকে বলো । কাণ্ড দেখো ! বানৰও আৱাৱ চুৱি কৱে !’

কাশি দিয়ে গলা পৰিষ্কাৰ কৱে নিল কিশোৱ । বলল, ‘দেখুন, আপনাৱা বুঝতে

পারছেন না, আপনাদের কোন জানোয়ার চুরি করতে আসিনি আমরা। ওই বানরটা আমাদের। ডেতরে চুকে গেছে। ডাকাডাকি করছি, তবু বেরোচ্ছে না। সত্যি বলছি।'

কিশোরের কথা বিশ্বাস করল না লোকগুলো। টিটকারির সুরে একজন বলল, 'তাই নাকি? তাহলে ডাকো না, ভাল করে ডাকো। তোমাদের হলে তো বেরিয়েই আসবে।'

মরিয়া হয়ে টকার বলল, 'বললাম না, শুনছে না। কত ডাকাডাকি করলাম, তাকায়ই না। নতুন বস্তু পেয়েছে তো...ওই দেখুন, কেমন গলা জড়াজড়ি করে আছে।'

দ্বিতীয় লোকটার কি মনে হলো কে জানে। বলল, 'অত করে যখন বলছে, দেখাই যাক। বের করি বানরদুটোকে। প্রমাণ হয়ে যাবে।'

একজনকে পাহারায় রেখে চলে গেল অন্য লোকটা। দুটো শেকল নিয়ে এল। এক মাথায় চামড়ার কলার লাগানো। খাঁচার দরজা খুলে ডেতরে চুকে বানর দুটোকে ধরে কলার পরিয়ে দিল গলায়। শেকল ধরে টানতে টানতে বের করে আনল। টকারকে বলল, 'ডাকো তোমার বানরটাকে।'

খেলার মাঝে এভাবে বাধা পড়ায় বিরক্ত হয়েছে অন্য বানরটা। নটি পেয়েছে ডয়। এরকম পরিস্থিতিতে আর পড়েনি সে। অচেনা কোন লোক তার গলায় শেকল পরায়নি আর। টকারকে ডাকতে হলো না। তার আগেই ছুটে গেল তার দিকে।

এগিয়ে এল টকার। তার কাঁধে চড়ে বসল নটি।

অন্য বানরটা মনে করল এটাও আরেকটা খেলা। সে-ও গিয়ে চড়ল টকারের কাঁধে।

হেসে উঠল মসা।

তার দেখাদোষ হাসতে শুরু করল কীপারেরাও।

কিন্তু কিশোর আর জিনা গষ্টার। আঁচ করে ফেলেছে বিপদ কাটেনি এখনও। প্রমাণিত হয়নি যে নটির মালিক টকার।

ব্যঙ্গের হাসি হেসে একজন কীপার বলল, 'এবার কি বলবে? দুটো বানরই তোমাদের?'

'না,' জবাব দিল টকার। 'এই ছোট বানরটা আমার।'

'প্রমাণ তো হলো না।'

চুপ হয়ে গেল টকার। বুঝতে পারছে না আর কি ভাবে প্রমাণ করবে।

কিশোর বলল, 'ডাকার আগেই ছোটটাকে ওর কাঁধে উঠতে তো দেখলেন। দ্বিতীয় বানরটা দেখাদোষ গিয়ে উঠেছে। এক কাজ করতে পারেন। আপনাদের নিচয় জানা আছে খাঁচায় কটা বানর ছিল। শুণে দেখুন। যদি সমান সমান হয়, তাহলে বুঝবেন আমরা মিথ্যে কথা বলছি। আর একটা বেশি হলে তো হলোই। ওটা আমাদের।'

কথাটা মনে ধরল কীপারদের। শুণে দেখল, খাঁচায় আঠারোটা বানর রয়েছে। থাকার কথা উনিষ্টা। বাইরের দুটোকে নিয়ে হয় বিশ্টা। একটা বেশি। তার

মানে ঠিকই বলছে ছেলেগুলো ।

এবার মেনে নিল ওরা ।^১

কড়া গলায় একজন জিজ্ঞেস করল, ‘তাহলে এখানে তুকলে কেন?’

এই প্রশ্নটা আসবেই জানত কিশোর, তৈরি ছিল, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, ‘রাতের বেলা জন্মজানোয়ারেরা কি করে দেখার খুব কৌতুহল হচ্ছিল। বলে তুকতে চাইলে তো তুকতে দিতেন না, তাই বেড়ার একটা ফোকর দিয়ে চুরি করে তুকেছি।’

দীর্ঘ একটা মূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। ছেড়ে দেবে কি দেবে না সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যেন। কিন্তু কোন অপরাধ প্রমাণ করতে পারেনি বলেই বোধহয় শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেয়াই ঠিক করল। নটির গলা থেকে কলার খুলে নিয়ে ধূমক দিয়ে বলল, ‘ঠিক আছে, এবারের মত মাফ করে দিলাম। আর যদি এভাবে এখানে দেখি, ভাল হবে না। যাও।’

এই লোকটার কথাবার্তা শুরু থেকেই পচন্দ হচ্ছিল না জিনার। রেংগে উঠতে যাচ্ছিল। সেটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরল কিশোর। লোকগুলোকে ধন্যবাদ দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে সরে এল সেখান থেকে।

বাইরে বেরিয়ে দেখল, ওদের দেরি দেখে অস্তির হয়ে পায়চারি করছে বিন। দেখেই বলে উঠল, ‘এত দেরি করলে? আমি তো ভাবলাম বিপদেই পড়েছ। রাফিকে পাঠাব ভাবছিলাম।’

‘বিপদেই পড়েছিলাম।’ কি হয়েছিল জানাল তাকে মুসা।

‘হ্যাঁ,’ হতাশ কষ্টে বলল বিন। ‘কোন ফন্দিই তো কাজে লাগছে না। কি করব এবার? টারকজকে পাওয়ার কোন পথ তো দেখছি না আর।’

‘বুদ্ধি একটা নিয়ম বেরিয়ে যাবে,’ অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয় কিশোর। ‘কালও তন্মাশি চালিয়ে যাব। না পেলে তখন অন্য বুদ্ধি করা যাবে।’

দশ

বুধবার দিন বিকেলে বাড়ির পেছনের মাঠটায় এসে বসল গোয়েন্দারা। জরুরী আলোচনা আছে। সবাই গভীর। যেখানে যেখানে খোঁজার কথা, সমস্ত জ্যায়গায় তন্মাশি চালিয়েও টারকজের কোন চিহ্নই পায়নি ওরা।

মাঠের ধার দিয়ে একটা নালা বইছে। তার কিনারে উপড় হয়ে শুয়ে পড়ে লম্বা ঘাসে মুখ ঢেকেছে টকার। ধরা গলায় বলল, ‘কোন দিন...কোন দিন আর ওকে খুঁজে পাব না আমরা। চিতার মত একটা জানোয়ারকে লকিয়ে রাখা সোজা কথা নয়। তার মানে...’ কথাটা শেষ করতে পারল না সে। কষ্ট কুন্দ হয়ে এল।

একটা ঘাসের ডগা দাঁতে কাটছিল কিশোর। ছুঁড়ে ফেলল।

‘দেখো টকার, বলেছিলাম, যদি এভাবে খুঁজে না পাই অন্য বুদ্ধি করব। কালকের মধ্যে টারকজকে পাওয়া না গেলে সেটাই করতে হবে।’

‘তার মানে একটা ফন্দি তুমি করেই রেখেছিলে,’ তিক্ত কষ্টে বলল মুসা। নিজে থেকে না বললে কোন কথাই কিশোরের পেট থেকে বের করা যায় না।

সময় না হলে বলেও না। 'তো এখন কি সময় হয়েছে? বলবে বুদ্ধিটা কি করেছ?'

দুই হাঁটু জড়ো করে বুকের কাছে টেনে নিল কিশোর। থুতনি রাখল তার ওপর। এক এক করে তাকাল সবার মুখের দিকে।

সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এমনকি রাফিও। যেন বুঝে ফেলেছ শুরুত্বশূণ্য কিছু একটা বলবে এখন গোয়েন্দাপ্রধান।

'আমাদের ভাগ ভাল,' নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করল কিশোর, 'বিগ হোলোতে আমাদের ইচ্ছে মত কাজ করতে পারছি আমরা। একেবারে স্বাধীন। বড়ো নাক গলাতে আসছে না। সেই সুযোগটাই নেব। কাল দিনের বেলা তো বটেই, দরকার হলে সারা রাত নজর রাখব। ডোরার ধারণা টারকজকে মেরে ফেলা হয়েছে। ওটার পিছু নিয়ে যে কিডন্যাপারদের ধরার চেষ্টা চালাছি আমরা, একথা কল্পনাও করবে না। আর কারস আংকেল তো এতদিনে নিচয় চিটাটোর কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। কাজেই তদন্ত চালাতে কোন বাধা নেই আমাদের।'

চোখমুখ বিকৃত করে ফেলল মুসা। 'সেইটাই তো করছি আমরা। আর কি করব?'

'করছি। অঙ্ককারে থেকে। কোন সূত্র নেই কিছু নেই। অঙ্কের মত চারদিকে হাতড়ে বেড়াছি। কাল এর সমাপ্তি ঘটাতে হবে।'

কি করতে চায় কিশোর, খুলে বলার জন্যে চাপাচাপি শুরু করল সবাই। কেন্দ্রখান থেকে কিভাবে নজর রাখবে?

ঘড়ি দেখল কিশোর। উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এসো আমার সঙ্গে। সাইকেল নিয়ে গেলে ডিনারের আগেই ফিরে আসতে পারব। সেখানে গিয়ে তারপর বলব সব কথা।'

'সেই জায়গাটা কোথায়? কোনখানে আমাদের নিয়ে যাচ্ছ?'

'নিটল হোলো। সেই জায়গাটায় যেখানে সৈকতে নেমেছিল কিডন্যাপাররা। কুভাটাকে পাঠিয়েছিল। এসো, সময়মত ফিরতে চাইলে তাড়াহড়া করা দরকার।'

জায়গাটা বেশি দূরে নয়। সাইকেলে যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

'জায়গা জায়গা করতে ভাল লাগে না। ঠিকমত বোঝানোও যায় না,' রবিন বলল। 'এর একটা নাম দেয়া দরকার।'

'ঠিক বলেছ।' সঙ্গে সঙ্গে নাম বলে দিল টকার, 'নাম রাখা হোক টারকজ বীচ।'

সবাই সমর্থন করল তাকে।

উপকূলের পাহাড়ী পথ ধরে টারকজ বীচের পাশ কাঢ়িয়ে এগোল ওরা। আরও দুটো ছোট ছোট সৈকত পেরিয়ে পৌছল লিটল হোলোতে।

সাইকেল থেকে নেমে অবাক হয়ে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা আর জিনা। গৌয়ের লোকেরা মূলত মৎস্যজীবী। পুরুষেরা সব মাছ ধরতে বেরিয়ে যায়। চুপচাপই থাকে সাধারণত গ্রামটা। নীরব। কিন্তু আজ যেন মৌচাকের মত ব্যস্ততা সেখানে। মৌমাছিদের মতই শুঙ্গন করে চলেছে। উচু মইয়ে চড়ে রাস্তার দুই ধারে নিশান লাগাচ্ছে পুরুষেরা। আরও নানা ভাবে সাজাচ্ছে। বন্দরের দেয়ালে দেয়ালে

রঙিন জাল ছড়িয়ে দিয়ে সাজাচ্ছে মেয়েরা। কিছু জেলে তাদের নৌকার পরিচর্যা
করছে। রঙ করছে। অলঙ্করণ করছে।

‘ব্যাপারটা কি?’ জিজ্ঞেস করল জিনা।

‘ও জানো না?’ জ্বান দেয়ার সূযোগ পেয়ে গেছে বইয়ের পোকা রবিন। ‘গায়ে
ফেটি উৎসব হবে। মূল অন্তর্নানগুলোর মধ্যে রয়েছে নৌকাবাইচ। শুরু হবে কাল
দুপুরের পর থেকে, রাত পর্যন্ত চলবে।’ বই পড়ে এসব কথা জেনেছে সে।

কিশোরও জানে এই উৎসবটার কথা। বলল, ‘হ্যাঁ, অনেক লোক আসবে
যাবে। নৌকার ভিড় হবে। নিশান ওড়াবে। আলো জ্বালাবে। একের পর এক
অনুষ্ঠান হবে। শেষ হবে বাজি পোড়ানো দিয়ে। প্রচুর হই হউগোল হবে। এই
সুযোগটাই কাজে লাগাব আমরা।’

‘আমি এখনও বুকালাম না কি করতে চাও তুমি?’ মুসা বলল।

‘কালকে পর্যন্ত সময় দিয়েছে টকারকে কিডন্যাপাররা, ভুলে গেছ?’

‘সে তো মনেই আছে,’ টকার বলল। ‘কিন্তু তুমি কি করতে চাও কিছু বুঝতে
পারছি না। তবে একটা কথা বলে দিচ্ছি, আর যা-ই করতে বলো, করব। কিন্তু
মরে গেলেও আম্বার ফরমুলা চুরি করে এনে দেব না ব্যাটাদের। টারকজ কেন,
কারও জন্মেই না।’

গলা কেঁপে উঠল তার।

টকারের কাঁধে আলতো চাপড় দিল কিশোর। ‘শান্ত হও।’

সবাইকে নিয়ে জেটির একধারে একটা নিরালা জায়গায় চলে এল সে। যাতে
আড়ি পেতে কেউ তাদের আলোচনা শনে ফেলতে না পারে। বলল, ‘সহজ একটা
বৃক্ষ করেছি। টকার, কাল বিকেলে তুমি চলে যাবে বনের মধ্যের খোলা
জায়গাটায়। গাছের শুভ্রিতে নিশ্চয় খাঁচাটা রেখে দেবে কিডন্যাপাররা। আশা
করবে তুমি তাতে ফরমুলাটা রাখবে। অবশ্যই তুমি তা রাখবে না। তার বদলে
রাখবে একটা মেসেজ...’

‘কি মেসেজ?’

‘একটা নোট। তাতে লিখে দেবে ওদের কথামত কাজ করতে তুমি এক পায়ে
খাড়া। ফরমুলাটা হাতানোর চেষ্টা করছ। কিন্তু সারাক্ষণ তোমার আম্বা
ল্যাবরেটরিতে থাকেন বলে পারছ না। সুযোগের অপেক্ষায় আছ। তোমাকে যেন
আরও কিছুটা সময় দেয় ওরা। ফরমুলাটা পেলে তোমার ঘরের জানালার বাইরে
একটা স্কার্ফ ঝুলিয়ে দেবে। তাতে ওরা বুঝতে পারবে ওটা তুমি...’

শুভিয়ে উঠল টকার, ‘কক্ষনো রাজি হবে না ওরা!’

‘না হলে নেই। ওদের রাজি হওয়ার জন্মে কোন মাথাব্যথাও নেই আমার।
আমাদের উদ্দেশ্য সফল হলেই হলো। মেসেজ নিয়ে তুমি চলে যাবে বনের
ভেতর...’

‘তা নাহয় গেলাম। মেসেজটা খাঁচায় রাখার পর কি করব? নজর রাখব?’

‘সোজা বাড়ি চলে যাবে। আর কিছু করার চেষ্টা করবে না। ফিরেও
তাকাবে না। যা বললাম, সোজা বাড়ি। মনে থাকবে?’

‘থাকবে। তোমরা কি করবে?’

‘আসল কাজটাই আমরা করব। আমরা থাকব এখানে। অনেক আগেই চলে আসব। টারকজ বীচে গিয়ে নজর রাখব, যেখান থেকে কুত্তাটাকে পাঠিয়েছিল কিডন্যাপাররা।’

সবার আগে বুঝতে পারল রবিন। তারপর জিনা। মুসা আর টকারের বুঝতে একটু সময় লাগল। কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বড় বড় হয়ে গেল সবার চোখ।

‘খাইছে!’ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ‘আর বলতে হবে না, বুঝে গেছি! কিডন্যাপারদের আসতে দেখব আমরা, কুত্তাটাকে পাঠাবে খাঁচাটা আনতে, তারপর...’

‘তার আর পর নেই,’ খুশি হতে পারল না জিনা। সৈকতে লুকানোর কোন জায়গা নেই, ভুলে গেছ? কোথায় বসে দেখব? দেখতে পারলেও পিছু নেব কি ভাবে? ওরা নৌকা নিয়ে আসবে, কুত্তা পাঠাবে, মেসেজটা নেবে, তারপর আবার নৌকা নিয়ে চলে যাবে। আমাদের আছে সাইকেল। সাগরের ওপর দিয়ে সাইকেল চলে না।’

‘তাই তো!’ যতটা খুশি হয়েছিল ততটাই মুষড়ে পড়ল আবার টকার। ‘একথাটা নিচয় তুমি ভাবনি, কিশোর?’

সামান্যতম মলিন হলো না কিশোর পাশার মুখ। মুচকি হাসল।

‘ভাবব না কেন?’ বলল সে। ‘সবই ভেবেছি। ওরা আসবে জলপথে, আমরাও পিছু নেব জলপথে। লুকাবও জলযানে। ঠিক আছে?’

জবাব দিল না কেউ। হাঁ করে তাকিয়ে কিশোরের পরবর্তী কথা শোনার অপেক্ষা করছে।

‘ছোট একটা মোটরবোট ভাড়া করব আমরা। টকারের নৌকাটা ব্যবহার করতে পারতাম। কিন্তু ওটার গতি বাড়ানো যাবে না। একটা মোটরবোট হলে লুকিয়ে থাকা থেকে শুরু করে শিছু নেয়া, সব করতে পারব। উপকূলের যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারব। কেউ কিছু সন্দেহও করবে না। ভাববে, উৎসবের দিনে আমরাও একটু আনন্দ করছি। নৌকা ভাড়া করে অনেকেই করে সেদিন। আর লোকের ডিঙ্গি আমাদের দিকে নজরও দেবে না কেউ। এত লোকের মধ্যে নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবে কিডন্যাপারাও। সতর্ক থাকার প্রয়োজন বোধ করবে না। কল্পনাই করবে না ওরা, আমরা নজর রেখেছি।’

‘চমৎকার!’ প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল রবিন, ‘আইডিয়াটা সত্যিই চমৎকার।’

এতদিনে একটা পথ পাওয়া গেল। আনন্দে নাচতে শুরু করল টকার। তার সঙ্গে যোগ দিল মুসা। গান ধরল জিনা। হাত তালি দিতে লাগল। রাফি ভাবল, এটা একটা মজার খেলা। আমিই বা বসে থাকি কেন? মুসা আর টকারের পাশে গিয়ে সে-ও লাফাতে শুরু করল।

ব্যাপারটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল কয়েকজন জেলের। কি হয়েছে দেখতে এগোল

ওরা ।

গোফেন্দারা বলল, ওরা পিকনিকে বেরিয়েছে। উৎসবের আগের দিন থেকেই ফুর্তি শুরু করেছে।

ওদের কথা পছন্দ হলো জেলদের। প্রথমে ওরা হাততালি দিল। তারপর গলা মেলাল জিনার সঙ্গে। কয়েকজন জেলেনী এগিয়ে এল। এলোমেলো পা ফেলছে টকার আর মুসা। তাদেরকে শিখিয়ে দেয়ার ছুতোয় নিজেরাই নাচতে শুরু করল।

দেখতে দেখতে জমে উঠল চমৎকার একটা ন্যান্যান্তান।

সুযোগটা কাজে লাগল কিশোর। থাতির করে ফেলল কয়েকজন জেলের সঙ্গে। ভাল একটা মোটরবোটের খোঁজ নিতে লাগল।

ওদের একজনের একটা বোট আছে। তবে একদল ছেলেমেয়ের কাছে ভাড়া দিতে রাজি হলো না প্রথমে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার আস্তা অর্জন করে তাকে বোট দিতে রাজি করিয়ে ফেলল কথা আর অভিনয়ের ওস্তাদ কিশোর পাশা।

বোটের মালিক মধ্যবয়সী। নাম হার্বার্ট জিম কলিনস। কিন্তু বুড়ো জিম নামেই বেশি পরিচিত। বলল, বোট নিয়ে হাজির থাকবে সে। কিশোররা যেন সময়মত চলে আসে।

আসার সময় মুখ গোমড়া করে ছিল সকলেই। বাড়ি ফেরার সময় এখন ফুরফুরে হয়ে গেছে হন্দয় মন। গান আর থামে না জিনা ও টকারের। সাইকেল চালানোর সময়ও ছেড়ে দিয়েছে গলা।

ওদের ধারণা, নতুন পরিকল্পনায় কাজ হবেই হবে।

এগারো

পরদিন দুপুরের খাওয়ার পর অভিযানে বেরোতে তৈরি হলো গোফেন্দারা। কি কি করতে হবে আরেকবার ভাল করে টকারকে বুঝিয়ে দিল কিশোর।

‘কি করবে মনে আছে তো?’ সকাল থেকে এই নিয়ে দশতম বার বলল সে, ‘ঠিক দশটায় বনের মাঝের খোলা জায়গাটায় পৌছবে। খাঁচার মধ্যে রাখবে মেসেজটা। তারপর একটিবারের জন্যেও পেছনে না তাকিয়ে হাঁটা দেবে। সোজা চলে আসবে বাড়িতে। মনে থাকবে?’

‘আরে বাবা থাকবে, থাকবে! কানে শুনি না নাকি আমি? হাঁদা ভেবেছ? এই কয়টা কথা মনে রাখতে না পারলে গাদা গাদা বই মুখস্ত করে আর পরীক্ষা পাস করা লাগত না।’

তার কথায় রাগ করল না কিশোর। মুচকি হাসল।

টকারের রাগের আসল কারণটা বুঝে গেছে সে। একা একা বনে যেতে ইচ্ছে করছে না তার। ওরা থাকবে উৎসবের জায়গায়, মোটরবোট নিয়ে সাগরে বেরোনোরও সন্তান আছে, আর তাকে একলা বসে থাকতে হবে বাড়িতে, এটা কিছুতে মেনে নিতে পারছে না। এছেড়া আর কিছু করার নেই বলেই কেবল

প্রতিবাদ করছে না।

আকাশ পরিষ্কার। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা। রওনা হলো লিটল হোলোতে।

সাইকেল চালাতে চালাতে কিশোর বলল, ‘এমন ভঙ্গি করতে হবে আমাদের যেন সাধারণ দর্শক আমরা।’

লিটল হোলোতে পৌছে বুড়ো জিমের বাড়িতে সাইকেলগুলো রেখে জেলে পল্লীতে ঘূরতে যাবে ঠিক করল। একেবারেই অকারণে ঘূরবে, তা নয়। ক্ষীণ একটা আশা আছে, পরিচিত কোন গন্ধ নাকে লাগতে পারে রাখিয়ানের।

সুতরাং গাঁয়ে পৌছে আগে বুড়ো জিমের সঙ্গে দেখা করল ওরা। আগের দিন মোটর বোটের অ্যাডভাস করে গিয়েছিল। আজ পুরো ভাড়া মিটিয়ে দিল।

জিম বলল, ‘বোটার নাম শার্ক। জেটিতে বাঁধা পাবে আটটা সময়। নিয়ে নিও। চালাতে পারবে তো?’

ঘাড় কাত করল জিনা, ‘নিচয় পারব। এর চেয়ে বড় বোটও চালিয়েছি।’

সাইকেল রেখে বেরোল ওরা। হেঁটে চলল গাঁয়ের পথে। পুরোদমে চলছে উৎসব। সবাই ব্যস্ত। আনন্দে উচ্ছ্বল। সন্দেহজনক কোন মুখ নজরে পড়ল না।

আসল সময়ের এখনও বহু দেরি। সময় কাটানোর জন্যে উৎসবে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। অনেক মজার মজার খেলা আর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে। সুইংবোটে চড়ল, এয়ারগান দিয়ে খেলনা হাঁসকে শুলি করল, আরও নানা রকম খেলা খেলল। কোনটাতে হারল, কোনটাতে পুরষ্কার জিতল। দারুণ কাটছে সময়।

সাতটা বাজল। হাসতে হাসতে রবিন বলল, ‘আমরা কি উৎসব করতেই এসেছি নাকি?’

‘না,’ গভীর হওয়ার ভান করে মুসা বলল, ‘আরও কাজ আছে। তার মধ্যে খাওয়া একটা। আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে কোন ম্যাকবারে চুকে পড়া দরকার। গায়ের শক্তি বজায় রাখতে হবে তো। কিডন্যাপাররা এলে কি হবে বলা যায় না। সারা রাতে আর কিছুই হয়তো মুখে দিতে পারব না।’

খিদে সবারই পেয়েছে। চুকে পড়ল একটা খাবারের দোকানে।

প্লেট ভর্তি করে ভাজা ভেড়ার মাংস আর চিপস খেলো। তারপর চকলেট কেক। সঙ্গে চলল বোতলের পর বোতল লেমোনেড। খাওয়া শেষ হলো স্ট্রবেরি আর ভ্যানিলা আইসক্রীম দিয়ে।

রাফি তো সে সব খেলই, বাড়তি পেল একটা বড় হাড়। দোকানের মালিক মহিলার পছন্দ হয়ে গেছে কুকুরটাকে। কাউন্টারের ওপাশ থেকে তাই হাড়টা ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

ঘড়ি দেখল কিশোর। জানাল, সময় হয়েছে।

‘এখন থেকে বেরিয়ে সোজা জেটিতে যাব,’ বলল সে।

‘এখন পানিতে পড়লে,’ রসিকতা করল মুসা, ‘পাথরের মত টুপ করে তলিয়ে যাব। কয়েক মন ভারি হয়ে গেছে পেট। শরীরের ভেতর কোথাও আর এক বিন্দু

বাতাস নাই।'

বোট্টা সহজেই ঝুঁজে পাওয়া গেল। আগে দাঁড়টানা নৌকা ছিল। অনেক পুরানো। রঙ আর কিছু মেরামতি করে ছোট একটা নতুন আউটবোর্ড মোটর বসিয়ে নেয়া হয়েছে।

বোটে উঠল ওরা। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই সাগরের ধারে বাস করেছে জিনা। পানির প্রতি একটা বিশেষ টান আছে। যখন তখন সাগরে ঝাপিয়ে পড়ে। সাঁতার কাটে। ছোটখাট যত রকমের বোট আছে, সব চালাতে পারে। জেলেদের সঙ্গে ভাব করে লঞ্চ আর ফিশিং বোটও চালিয়েছে দু-তিনবার। কাজেই এই বোটটা চালানো তার জন্যে কোন ব্যাপারই নয়।

তেলটেল আছে কিনা প্রথমেই দেখে নিল। ইঞ্জিনটায় হাত বোলাল। তারপর স্টার্টারের দড়ি ধরে দিল টান। একটানেই স্টার্ট হয়ে গেল। সমবাদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সে। পছন্দ হয়েছে। নৌকার বড়টা যেমনই হোক, ইঞ্জিনটা চমৎকার।

গীয়ার দিতেই কেঁপে উঠল বোট। পিছিয়ে জেটি থেকে বের করে আনল জিনা। নাক ঘুরিয়ে স্পীড দিতেই খেপা ঘোড়ার মত লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ওটা। গতি কমিয়ে দিল সে। আশেপাশে জলযানের অভাব নেই। বেধেয়াল হলে ধাক্কা লেগে যেতে পারে। ঝুঁকি নেয়া উচিত না। অন্যান্য নৌকার ফাঁকফোকর দিয়ে শার্ডাবিক গতিতে এগোল।

সারি দিয়ে ঘাটে নোঙ্গ করে রাখা আছে অসংখ্য নৌকা। রঙিন নিশানে সাজানো।

একটু পরেই ঘাট থেকে খোলা সাগরের দিকে রওনা দিল সাজানো নৌকাগুলো। ঊচু পদ্মায় মিউজিক বাজছে। বাইচ শুরু হতে দেরি নেই।

শার্ককেও রঙিন নিশান দিয়ে সাজানো হয়েছে। বাতাসে উড়ছে সেগুলো। ওদেরই মত আরও অনেকে নৌকা নিয়ে বেরিয়েছে যারা বাইচে অংশ নেবে না। প্রচুর লোক আসছে যাচ্ছে। সুতরাং নিরাপদেই টারকজ বীচে পৌছে গেল ওরা, কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে।

ওখানে যে খাঁড়িটা আছে তার মধ্যে নৌকা চুকিয়ে দিতে গেল জিনা।

বাধা দিল কিশোর, 'বাইরেই থাকো। এখানে নোঙ্গ ফেলব। সৈকতটা ও চোখে পড়বে, সাগরেরও তিন দিকই দেখতে পাব।'

মরচে পড়া পুরানো একটা নোঙ্গ আছে বোটে। সেটা তুলে নিয়ে পানিতে ফেলল মস্তা। ঘষা থেকে থেকে নেমে গেল শেকল।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল জিনা। ছোট ছোট টেউয়ে আলতো দোল থেকে থাকল শার্ক।

অন্ধকারে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

সময় বুব দ্রুত কেটে যেতে লাগল। লিটল হোলো বন্দরের আলো চোখে পড়ছে। বাজনাও কানে আসছে। ওদের সামনে দিয়ে নৌকার আসা-ফাওয়া চলছেই। প্রতিবারেই মনে হচ্ছে এই বুবি ওদের নৌকাটা এল, যেটার জন্যে বসে

আছে।

কিন্তু বার বার ওদের হতাশ করে দিয়ে চলে যাচ্ছে নৌকাগুলো। থামছেও না, এদিকে মুখও ঘোরাচ্ছে না। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

কোন দিক দিয়ে যে সময় পার হয়ে গেল টেরই পেল না ওরা। লিটল হোলোর শির্জার পেটা ঘড়িতে দশটা বাজার ঘটা শোনা গেল।

বুকের মধ্যে দুরুদুর শুরু হলো ওদের। দশটা বাজে! নিশ্চয় এতক্ষণে বনের মধ্যের খোলা জায়গায় পৌছে গেছে টকার। কিন্তু এখনও কিডন্যাপাররা আসে না কেন? আর কখন আসবে?

বিড়াবড় করল মুসা, 'টকার এখন খাঁচায় মেসেজ রাখছে।'

'কি করে রাখবে?' রবিন বলল, 'চোরগুলো আসেইনি এখনও। খাঁচা রাখল কখন?'

ভাবি গলায় কিশোর বলল, 'মনে হয় একটা ভুল করে ফেলেছি। জবাব যখন চেয়েছে, খাঁচাও ওরা নিশ্চয় রেখে এসেছে। হয় আমরা আসার অনেক আগেই রেখে দিয়ে এসেছে, নয়তো এদিক দিয়ে আসেইনি। অন্য কোন দিক দিয়ে শিয়ে রেখে এসেছে খাঁচাটা। তুলেও নেবে অন্যখান থেকে। গাধামী করেছি! এরকম কিছু ঘটতে পারে আগেই ভাবি উচিত ছিল।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

'ভাবলেই কি লাভ হত? কোন দিক দিয়ে যাবে ওরা আমরা জানি না। কয় দিকে নজর রাখতে পারতাম? বুক্কিটা ঠিকই করেছিলে, কিন্তু...'

'ব্যাটোরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি চালাক,' তিক্ত কঢ়ে কথাটা শেষ করে দিল কিশোর।

তার বাহুতে হাত রাখল জিনা। কোমল গলায় বলল, 'আসলে, এর বেশি আর কিছু করারও ছিল না আমাদের। অহেতুক মন খারাপ করছ।'

'টকার কি ভাববে বলো?'

'কিছুই ভাববে না। সে বোকা নয়।'

কিন্তু এই ভুলটার জন্যে টারকজের বিপদ আরও বেড়ে গেল। ফরমুলাটা পেল না কিডন্যাপাররা। সময় আর না-ও দিতে পারে। রেংগে শিয়ে এখন মেরে ফেলতে পারে চিতাটাকে।

'মারলে আমাদের কিছু করার নেই,' জিনার সঙ্গে সূর মিলিয়ে কিশোরকে সান্ত্বনা দিল রবিন। 'সেটা ওর ভাগ্য। আসলেই তো আমাদের আর কিছু করার ছিল না। কি করতে পারতাম?'

আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করল ওরা। যদি আসে কিডন্যাপাররা, এই আশায়। কিন্তু এল না ওরা।

লিটল হোলোর নৌকাবাইচও শেষ হয়েছে। বাজি পোড়ানো শুরু হয়েছে। আকাশ আলোকিত করে দিচ্ছে নানা রঙের বাজি। তুমুল শব্দে মিউজিক বাজছে বোধহয় জেটিতে, এখান থেকেও বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

'চলো, বাড়ি যাই,' ভোতা গলায় বলল মুসা। 'এখানে শুধু শুধু বসে থেকে

আর ঠাণ্ডা বাধিয়ে লাভ নেই। শিশির পড়ে ভিজে যাচ্ছে।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল জিনা। নেভের তুলন মুসা।

জেটিতে ওদেরই অপেক্ষায় রয়েছে বুড়ো জিম। ওদের দেরি দেখে অস্থির হয়ে পায়চারি করছে। দাঁতের ফাঁকে পাইপ। তার নৌকা-তাকে বুঁধিয়ে দিয়ে ডাঙায় নামল গোয়েন্দারা। সাইকেলগুলো নিয়ে রওনা হলো বাড়িতে।

বনের ধার দিয়েই গেছে পথ। সেখানে এসে কিশোর বলল, 'এক কাজ করি, দাঁড়াও। চট করে একবার জায়গাটা দেখে আসি।'

রবিন বলল, সে-ও যাবে সঙ্গে।

মুসা আর জিনাকে সাইকেলগুলোর কাছে পাহারায় রেখে রবিন ও রাফিকে নিয়ে বনে চুকল কিশোর। খোলা জায়গাটায় চুকে গাছের গুঁড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল। খাঁচা-টাচা কিছু নেই।

'তার মানে এখনও আসেনি ওরা,' নিচু স্বরে বলল রবিন।

'এসেছে তো বটেই। ফরমূলাটার জন্যে পাগল হয়ে আছে ওরা। খাঁচা না দেখলে গুঁড়ির ওপরই চিঠি রেখে গেছে টকার। এসে নিয়ে গেছে চোরেরা।'

মাঝারাতে বাড়ি ফিরল ওরা।

ওদের জন্যেই অস্থির হয়ে আছে টকার। বাগানেই রয়েছে। ওরা গেটের ডেতেরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল।

'খবর কি? ওদের পিছু নিতে পেরেছিলে? টারকজ কোথায় আছে? ভাল আছে? চিঠিটা খাঁচায় রেখে সোজা হাঁটা দিয়েছি। একটিবারও পেছনে ফিরে তাকাইনি। কি হলো, তোমরা...'

থেমে গেল সে। বুঝে ফেলেছে, খবর ভাল নয়।

বারো

ওরা মনে করেছিল এভাবে পরাজিত হয়ে এসে দুচোখের পাতা এক করতে পারবে না, কিন্তু মরার মত ঘুমাল সবাই। স্কুলের আগে জাগলাই না। কয়েক বার করে ডেকে ওদের ঘুম ভাঙ্গতে হলো ডোরাকে। অবশ্যে উঠে হাতমুখ ধুয়ে নাস্তার টেবিলে গিয়ে বসল ওরা।

'হয়েছে কি তোমাদের?' প্লেটে ডিম ভাজা দিতে দিতে জিজেস করল ডোরা। 'এত অলস ছেলেমেয়ে তো দেখিনি। বাজে ক'টা জানো? দশটা।'

সে তো আর জানে না, কত রাতে ঘুমাতে গিয়ে মোটেও ভাল নাগল না ওদের। কোন কিছুতেই মন বসাতে পারল না। ফলে একটা বিষণ্ণ দিন কাটল। ওদের শুকনো, চোখের কোণে কালি পড়া মুখগুলো দেখে ভাবনায় পড়ে গেল ডোরা। ফলে খাবারের টেবিলের সামনে কোমরে হাত দিয়ে গাঁপার হয়ে সকালের প্রশংস্তাই করল, 'কি হয়েছে?'

'কিছু না, কিছু না,' অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিলেন প্রফেসর কারসওয়েল, তিনি

মনে করেছেন তাঁকেই জিজ্ঞেস করেছে ডোরা। 'সব কিছু ভালই চলছে। ফরমুলাটা কপি করা প্রায় হয়ে গেছে। আর বড় জোর দু-তিন দিন। সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারব।'

বলে মনের ভূলে লবণের শিশিটা পকেটে ভরে, চশমাটা ঘরিচের গুঁড়োর শিশির পাশে ফেলে রেখে খুশি মনে উঠে চলে গেলেন তিনি।

কোনমতে কিছু গিলে নিয়ে বাগানে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। এক কোণে হাত-পা ছড়িয়ে বসল ঘাসের ওপর। খেলা জুড়ল রাফি আর নটি। কিন্তু তাদের দিকে দর্শকদের মন নেই দেখে খেলতে ভাল লাগল না।

একটু পরে গেটে দেখা দিল পোস্ট অফিসের পিয়ন। হাসি মুখে ডাক দিল, 'এই টকার, তোমার চিঠি।'

লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল টকার।

তার হাতে চিঠিটা ধরিয়ে দিয়ে শিস দিতে দিতে চলে গেল পিয়ন।

খামের ঠিকানার দিকে তাকিয়েই চিংকার করে উঠল টকার। তাকে ঘিরে এল তিন গোয়েন্দা আর জিনা।

আরেকটা চিঠি পাঠিয়েছে কিডন্যাপাররা।

'কি লিখেছে, পড়ো পড়ো,' জানার জন্যে আর তর সইছে না মূসার।

কাঁপা হাতে খামটা ছিড়ল টকার। ভেতরের কাগজটা বের করে ধরিয়ে দিল রবিনের হাতে, 'তুমই পড়ো।'

জোরে জোরে শাড়তে লাগল রবিন, 'মনে হচ্ছে ফরমুলাটা জোগাড় করার আঙ্গরিক ইচ্ছে আছে তোমার। সে জন্যেই তোমার এই অনরোধ রাখলাম। তবে এই শেষ, আর সময় বাঢ়াব না। আরও তিন দিন সময় দিলাম। তারপর আর সাবধান করব না। শেষ করে দেব চিতাটাকে। সোমবার রাত দশটায় বনের সেই জায়গাটায় ফরমুলাটা রেখে আসবে। খাঁচার মধ্যে আর কোন চিঠিটিঁ চাই না। শুধু ফরমুলাটা। মনে থাকে যেন।'

চোক পিলল টকার।

মুখ তুলল রবিন। 'বাস, এই। আর কিছু নেই।'

গভীর মুখে মুসা বলল, 'এইবার আর কোন ফাঁক রাখেনি। হয় ফরমুলাটা দিতে হবে নয় তো....'

চোখ ছলছল করছে টকারে। ফিসফিস করে যেন নিজেকেই বলল, 'আর কোন দিন টারকজকে দেখতে পাব না!'

জিনও মুখ কালো করে ফেলেছে। চোখে আগুন। এখন হাতের কাছে চোরগুলোকে পেলে মেরেই বসত, তার যে রাগের রাগ।

সবাই তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে। একটা জবাব আশা করছে।

গভীর ভাবনায় ডুবে আছে গোয়েন্দাপ্রধান। নিচের ঠোঁটে তার ঘন ঘন চিমটি কাটা দেখেই বোঝা যায়।

হঠাৎই উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। হাসি ফুটল। বন্ধুদের উৎকৃষ্টিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যতক্ষণ প্রাপ্ত ততক্ষণই আশা। এখনও মারা যায়নি টারকজ।'

‘কি বলতে চাও?’ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল টকার, ‘নিশ্চয় আরেকটা ঝুঁকি বের করে ফেলেছ?’

‘করেছি। এবং এটা আগেরটার চেয়ে অনেক ভাল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঝুঁকি আছে। তবু চেষ্টা না করে ছাড়ব না।’

‘বুলিয়ে রেখেছ কেন?’ জিনা বলল, ‘বলে ফেলো না।’

‘দোহাই তোমার, কিশোর,’ অনুনয় করল মুসা। ‘তোমার এই পেটে কথা রেখে দেয়া সহ্য হয় না। এইবারটি অন্তত মাপ করে দাও ভাই। শাস্তি দিয়ো না। বলো, কি ডেবেছ?’

‘বুব সহজ। শোনো, ওদের অন্ত আমরা ওদেরকেই ফিরিয়ে দেব। কিডন্যাপারদের ধরতে যখন ব্যবহী হলাম, আমরাই কিডন্যাপার হয়ে যাব...’

‘আগামে,’ কপাল চাপড়ল মুসা, ‘আর পারি না! মঙ্গল ঘৃহের ভাষা!’

‘অপরাধীদের ধরতে না পেরে শেষে অপরাধী হয়ে যেত বলছ?’ ভুঁরু নাচিয়ে বলল জিনা।

‘আমার কথা শেষ করতে দাও। যেমন কুকুর তার তেমনি হবে মুশুর। কিডন্যাপারদের বোঝাতে হবে যে ওদের শিক্ষা আমরাও পেয়ে গেছি। ওরা করেছে আমাদের চিতা কিডন্যাপ, আমরা করব ওদের কুকুর। এই সোমবারেই করব।’

বোকা হয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। কিছুই বুঁঝতে পারছে না।

রবিন চুপ।

জিনা গভীর।

টকার হা।

‘ওদের কুকুরটাকে ছিনতাই করবে!’ অবশ্যে মুখ খুলল জিনা।

‘হ্যাঁ, করব। কিডন্যাপারদের নাগাল পাছি না আমরা, ওদের কুকুরটার তো পাব। কিছুতেই ফেরত দেব না ওটা। যতক্ষণ না ওরা টারকজকে ফেরত দেয়।’

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন, ‘কাজ হবে না। বুঝলে, কাজ হবে না। আমাদের কাছে চিতাটার যতটা দাম, ওদের কাছে কুকুরটার ততটা নয়।’

‘স্বাভাবিক ভাবে তাই মনে হয়। কিন্তু এটা সাধারণ কুকুর নয়। অনেক সময় অনেক কষ্ট করে ওটাকে ট্রেনিং দিতে হয়েছে। কিডন্যাপারদের কাছে তাই ওটার অনেক দাম। একটা সাধারণ চিতার কোন মূলাই নেই ওদের কাছে। কিন্তু ওরকম একটা কুকুরের আছে। ওদের শয়তানীতে সাহায্য করার জন্যে ওরকম একটা কুকুরের ওদের ভীষণ দরকার।’

তর্কের খাতিরে রবিন বলল, ‘কিন্তু ফরমুলাটার চেয়ে দামী নয়।’

‘যদি শিওরু হত, তাহলে। কিন্তু ওরা তো শিওরই হতে পারছে না ওটা পাবে কি পাবে না। অহেতুক ঝুঁকি নিতে যাবে না কুকুরটার ওপর। কোন না কোন ভাবে ওটাকে ফেরত নেয়ার চেষ্টা করবেই।’

আশার আলো দেখা দিল আবার টকারের চোখে। ‘বেশ, না হয় কুকুরটাকে কিডন্যাপ করলামই আমরা। কিন্তু তার মালিককে খুঁজে বের করব কি করে? কি করেই বা জানাব যে স্প্যানিয়েলটাকে ধরে ফেলেছি আমরা?’

‘কুকুরটার গলায় রশি বেঁধে তাকে বাড়ি যেতে বলব,’ মূসা বলে উঠল।
‘তারপর তার পিছু নিলেই তো হয়ে গেল...’

‘না, অত সহজ হবে না,’ কিশোর বলল। ‘কুকুরটাকে ধরলেই চোরেরা
ঘাবড়ে যাবে। ধরে নেবে ওদের ঘাটির খৌজ করতে পারি আমরা। সেই জায়গা
থেকে তখন সরে যাবে। কিন্তু কুকুরের মালিককে খুঁজতে যাব আমরা কোন
দুঃখে? তারই গরজ বেশি। সে-ই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমরা যে
খরেছি কুকুরটাকে সেটা জানানোও খুব সোজা। খাঁচার মধ্যে ফরমুলা দেব না
আমরা। দেব একটা চিঠি। জানিয়ে দেব, টারকজকে না দিলে কুকুরটা ফেরত
দেয়া হবে না।’

কিশোরের ঘ্যানটা পছন্দ হলো সবারই। অবশ্য এছাড়া আর করারও কিছু
নেই।

কি করে কুকুরটাকে ধরা হবে, সেটা নিয়ে আলোচনা চলল এরপর।

মূসা বলল, ‘যৌগের মধ্যে লুকিয়ে থাকব। এলেই ধরব।’

‘আমাদের গায়ের গন্ধ পেয়ে যায় যদি?’ রবিনের প্রশ্ন।

‘বাতাসের বিপরীতে বসব আমরা। তাহলেই আর পাবে না,’ জিনা বলল।
‘কিন্তু কথা হলো, ধরব কি করে?’

‘সেটাও ডেবে রেখেছি,’ কিশোর বলল। ‘কুকুরটা এলেই... আচ্ছা, কুকুর
কুকুর না করে ওটার একটা নাম তো দিতে পারি আমরা?’

‘কুরিয়ার,’ সঙ্গে সঙ্গে বলল টকার। ‘সব সময়ই চিঠি বয়ে নিয়ে যায় তো,
তাই।’

‘হঁ, মন্দ না। ঠিক আছে, কুরিয়ারই সই। যেই আসবে সে, অমনি গিয়ে
ঝাপিয়ে পড়বে রাফি।’

‘রাফিকে এতে জড়াবে?’

‘কেন নয়?’ বলে উঠল জিনা। ‘ও তো আমাদেরই একজন। ওর কাছ থেকে
সাহায্য পেলে নেব না কেন? কুকুরের বিরুদ্ধে কুকুর, খুব মানানসই হবে।’

সন্দেহ দেখা দিল মুসার চোখে। ‘কুরিয়ারের চেয়ে রাফি কিছুটা বড়, গায়েও
নিচয় জোর বেশি। কিন্তু ওটা যদি বেশি ক্ষিপ্ত হয়? যদি ধরার আগেই পালায়?
এমন কিছু ভাবতে হবে আমাদের, যাতে শিওর হতে পারি, ধরা পড়বেই কুকুরটা।’

তুড়ি বাজাল রবিন, ‘আমি একটা বুদ্ধি পেয়েছি! একটা সিনেমায় দেখেছিলাম
কুকুর ধরতে। জাল ছড়ে। জালের অসুবিধে হবে না। বুড়ো জিমের কাছে গিয়ে
একটা শক্ত জাল চেয়ে আনব। আমার বিশ্বাস, দিয়ে দেবে। না দিলে ভাড়া দেব।
তবে মনে হয় এমনিতেই দিয়ে দেবে। নৌকাটা ভাড়া নিয়ে ঠিকঠাক মত টাকা
দিয়েছি আমরা, ওটার কেন ক্ষতি না করে ফিরিয়ে দিয়েছি। আমাদের ওপর বিশ্বাস
জন্মে যাওয়া স্বাভাবিক। জাল নিয়ে লুকিয়ে বসে থাকব আমরা। রাফি গিয়ে
কুকুরটাকে বেড় দিলেই ছুটে গিয়ে জাল ছড়ে যাবে। ধরা না পড়ে যাবে কোথায়।’

‘ঠিক বলেছ! চমৎকার বুদ্ধি!’ কিশোর বলল। টকার চলো, চিঠিটা লিখে
ফেলা যাক। ভাল মত হ্মকি দিয়ে লিখতে হবে।’

কয়েক মিনিট পর। ডেক্সে এসে বসল টকার। তার চারপাশে ঘিরে কসল সবাই। কি লিখতে হবে, বলে দিতে লাগল কিশোর, সে লিখতে লাগল।

দু-তিন বার লিখে মন মত হয়নি বলে ছিঁড়ে ফেলা হলো। শেষ পর্যন্ত একটা লেখা পছন্দ হলো। তার মধ্যে কাটাকাটি আছে। দেখে দেখে স্পষ্ট করে ওটার নকল করল টকার। ভাঙ্জ করে খামে ভরল।

বিষণ্ণতা কেটে গেছে ওদের। আবার হাসি ফুটেছে মুখে।

পরদিন সকালে ঘূম ভাঙতে আর আগের দিনের মত দেরি হলো না। নাস্তা খেয়েই বেরিয়ে পড়ল সাইকেল নিয়ে। লিটল হোলোতে যাবে, বুড়ো জিমের কাছে, একটা জাল চেয়ে আনতে।

ওদেরকে দেখে খুশি হলো জিম। দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ না সরিয়েই ফক ফক করে ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে জানতে চাইল ওরা কি জন্যে এসেছে। তাকে জানানো হলো। জাল তো দিতে রাজি হলই বুড়ো, বোটে করে ওদেরকে মাছ ধরতে যাওয়ার দাওয়াতও দিয়ে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল মুস। একপায়ে খাড়া। জিনাও রাজি। অন্যদেরও আপত্তি নেই। হাতে আর কোন কাজ নেই। একটা কিছু করে সময় কাটাতে পারলে বরং ভালই হয়। সোমবারের দোরি আছে।

তেরো

শনিবার, রোববার পেরিয়ে গেল। নতুন আর কিছু ঘটল না। সোমবার সকাল থেকেই উত্তেজিত হয়ে পড়ল গোয়েন্দারা। কখন বিকেল হবে সেই অপেক্ষা। সময় যেন আর কাটে না। যতই আসল সময় এগিয়ে আসতে থাকল, আশা, আনন্দ, শঙ্কায় ভারি হয়ে উঠল ওদের মন।

বিকেল হলো। আরও সময় পেরোল। সকাল সকালই রাতের খাওয়া সেরে নিল। ওদের হাবভাব দেখে অবাক হলো ডোরা। কিন্তু কিছু বলল না। ছেলেমেয়েরা খুশি থাকলেই সে খুশি। মুখ গোমড়া করে রাখলে ভাল লাগে না।

খাওয়ার পর পরই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা। উপকূলের পথ ধরে এগোল। রাফিকে সঙ্গে নিয়েছে, কারণ তাকে নিতেই হবে। আসল কাজটা তারই। তবে নটিকে নেয়নি। ওকে বিশ্বাস নেই। দুষ্টুমি করে সব পও করে দিতে পারে।

বনে চুকে ঘন ঝোপের মধ্যে সাইকেলগুলো লকিয়ে রাখল ওরা। তারপর টকারকে ওখানে রেখে নিঃশব্দে এগোল খোলা জায়গাটাৰ দিকে।

গাছের গুঁড়ির ওপর দেখা গেল খাঁচাটা। কিডন্যাপারুৱা রেখে গেছে।

বাতাস কোন দিক থেকে বইছে পরীক্ষা কৰাব জন্যে থু-থু দিয়ে আঙুলের মাথা ভিজিয়ে ওপর দিকে তুলে ধরল কিশোর। তারপর আরও শিওর হওয়ার জন্যে একমুঠো বালি তুলে বুরুবুর করে ছাড়ল।

আগের দিন স্প্যানিয়েলটা যেদিক দিয়ে বেরিয়েছিল সে দিকটা দেখিয়ে বলল সে, 'মনে হয় ওখান দিয়েই বেরোবে। যেদিক দিয়েই বেরোক, আমরা থাকব এই

ଝୋପେର ମଧ୍ୟେ ।' କାଟୋ ଗୁଡ଼ିର କାହାକାହି ଆରେକଟା ଝୋପ ଦେଖିଯେ ବଲଲ, 'ମୁସା, ଜାଲ ନିଯେ ତୁ ମି ଓଟାତେ ଗିଯେ ବସୋ । ରାଫି କୁରିଆରକେ ବେଡ଼ ଦେଯାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗିଯେ ଜାଲ ଛୁଡ଼ବେ । ଖବରଦାର, କୋନ ଭାବେଇ ଯେନ ନା ଫ୍ସକାଯ । ଧରା ଚାଇଇ ଚାଇ । ଆର ଆମରା ତୋ ଆଛି । ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାହାୟ କରବ ।'

କାଜଟା ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ନ ହେଁଲେ ମୁସାର । ଅକଥକେ ସାଦା ଦାଁତ ବେର କରେ ହାସଲ । 'ମାନୁଷ ଜାଲ ଦିଯେ ମାଛ ଧରେ । ଆମ ଧରବ କୁକୁର । ଭାରି ମଜା ।'

ଫ୍ସ କରେ ବଲେ ଫେଲଲ ରବିନ, 'ଜାଲ ଦିଯେ ଶ୍ରୀ ମାଛ ନୟ, ପାଖି, ଖରଗୋଶ ଆର ଆରା ଅନେକ କିଛୁ ଧରା ହୟ...'

'ସୁଯୋଗ ପେଲେଇ ଖାଲି ବିଦ୍ୟା ବାଡ଼ାର ତାଳେ ଥାକେ...'

'ବିଦ୍ୟା ବାଡ଼ାମ କୋଥାୟ? ତୁ ମି ଏକଟା ଭୁଲ କଥା ବଲଲେ, ତାଇ ଶଧରେ ଦିଲାମ...'

'ଓ ତୋ ଏକଟା କଥାର କଥା ବଲଲାମ...'

'ଥାକ', ବାଧା ଦିଲ କିଶୋର । 'ଏଥନ ତର୍କ କରାର ସମୟ ନୟ । ଯାଓ, ଝୋପଟାର ମଧ୍ୟେ ଗିଯେ ଢୋକୋ । ଆମରା ରାଫିକେ ପାଠାନୋର ଆଗେ କିଛୁତେଇ ବେରୋବେ ନା, ମନେ ଥାକେ ଯେନ ।'

ଦଶଟା ନାଗାଦ ଏଲ ଟକାର । ଚିଠିଟା ଥାଚାୟ ରେଖେ ଚଲେ ଗେଲ ।

ଏମନିତେଇ ଚୁପଚାପ ଛିଲ ଗୋମେନ୍ଦ୍ରାରା, ଏଥନ ଏକେବାରେ ନିଖର ହୟ ଗେଲ । ରାଫିର କଳାର ଧରେ ରେଖେଛେ ଜିନା । ଟାନଟାନ ହୟ ଆଛେ ଶାୟ । ତାର ଏହି ଅବସ୍ଥାଟା ଆଁଚ କରେ ଫେଲେଛେ ରାଫି । ବୁଝାତେ ପେରେଛେ, ତାକେ ଦିଯେ ଜରୁରୀ କିଛୁ କରାତେ ଚାଯ । କି ସେଟା ଜାନେ ନା । ତବେ ତୈରି ଆହେ ସେ । ଜିନା ତାକେ 'ଯା ରାଫି, ଧର!' ବଲାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗିଯେ ଝାପିଯେ ପଡ଼ିବେ ।

ଓଦିକେ ଝୋପେର ମଧ୍ୟେ ଘାପଟି ମେରେ ବସେ ରଯେଛେ ମୁସା । ସେ-ଓ ଜିନାର ମତଇ ଉତ୍ତେଜିତ । ଜାଲେର ଦକ୍ଷି ଶକ୍ତ କରେ ଧରେ ରେଖେଛେ । କୋନ ଭାବେଇ ଯେନ ମିସ ନା ହୟ ସେ ଜନ୍ମେ ତୈବି ।

ରବିନ ଆର କିଶୋର ଚୁକେଛେ ଆରେକଟା ଝୋପେର ମଧ୍ୟେ । ଛଡ଼ିଯେ ଛିଟିଯେ ବସେଛେ ଓରା ଇଚ୍ଛ କରେଇ । କୁକୁରଟାକେ ଯାତେ ଚାରପାଶ ଥେକେ ଯିରେ ଫେଲତେ ପାରେ । ଏଲେ ଆର ପାଲାତେ ଦେଯା ହବେ ନା ।

ହଠାତ୍ କାନ ଥାଡା କରେ ଫେଲଲ ରାଫି । ଶକ୍ତ ହୟ ଗେଲ ଜିନା ।

ରାଫିର ପର ପରଇ ମୁସାର କାନେ ଚୁକଲ ଶଦ୍ଦଟା । ମଟ କରେ ଏକଟା ଶୁକନୋ ଡାଳ ଭେଙ୍ଗେଛେ ।

ଏକଟୁ ପର ଆବାର ଶୋନା ଗେଲ ଶଦ୍ଦଟା । ଏବାର ସବାଇ ଶୁନତେ ପେଲ ।

ଝୋପେର ଭେତର ଥେକେ ଉକି ଦିଲ ସ୍ପ୍ଯାନିୟେଲଟାର ମାଥା ।

ଟେଟୋ କାମଡେ ଧରେଛେ ଜିନା । ରାଫିର କଳାରେ ଯେନ ଆଟକେ ଗେହେ ଆଞ୍ଚଳ । ଟାଇମିଙ୍ଗେ ଭୁଲ କରା ଚଲିବେ ନା । ସମୟର ସାମାନ୍ୟ ଏକଟୁ ହେରଫେରେଇ ସବ ଭେଣ୍ଟେ ଯେତେ ପାରେ ।

ନାକ ଉଚ୍ଚ କରେ ବାତାସ ଶୁକଲ କୁରିଆର । ସନ୍ଦେହଜନକ କିଛୁର ଗନ୍ଧ ପେଲ ନା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗିଯେ ଆସତେ ଶୁରୁ କରି ଗୁଡ଼ିଟାର ଦିକେ । କାହେ ଏସେ ଲାଫିଯେ ଉଠିଲ ଓପରେ । ହା କରେ ଥାଚାର ଆଙ୍ଗଟା କାମଡେ ଧରତେ ଯାବେ, ଏହି ସମୟ ବଲେ ଉଠିଲ ଜିନା, 'ଯା ରାଫି,

যা! ধৰ!’

বিউগল বাজিয়ে যেন সবাইকে সতর্ক করে দিল জিনার কষ্টস্বর। প্রাণ ফিরে পেল সবাই। চোখের পলকে লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল রাফি। কি করতে হবে তাকে পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন তার কাছে। কুকুরটার ঘাড় ধরে মাটিতে শইয়ে ফেলতে হবে।

অবাক হয়ে মাথা তুলন কালো কুকুরটা। এমন কিছু ঘটবে আশা করেনি। রাফিকে ছুটে আসতে দেখেই বিপদ আঁচ করে ফেলল। খাচার ওপর থেকে আগ্রহ হারাল। কেউ করে লাফ দিয়ে নামল শুভ্রির ওপর থেকে। ধাক্কা লেগে কাত হয়ে গেল খাচাটা। সেদিকে ফিরেও তাকাল না সে। পালানোর জন্যে ঘূরে দৌড় দিল।

কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। তার গায়ের ওপর এসে পড়ল রাফি।

দাঁতমুখ খিচিয়ে খাউ খাউ করে উঠল কুরিয়ার। হামলা ঠেকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু রাফি তার চেয়ে অনেক বড় আর শক্তিশালী। তার সঙ্গে পারল না সে। মাটিতে পড়ে গেল। চেপে ধরল তাকে রাফি।

মুচড়ে মুচড়ে নিজেকে বের করার চেষ্টা চালাল কুকুরটা। হয়তো বেরও করে ফেলত, রাফিকে ফাঁকি দিয়ে পালাত, যদি সময়মত দৌড়ে না আসত মুসা আর বাবি।

মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে দুটো কুকুর। তাদের ওপর জাল ছড়িয়ে দিল মুসা। টেনে টেনে পাশগুলো আরও ছড়িয়ে দিল রবিন। জালে আটকা পড়ে অবাক হয়ে গেল দুটো কুকুরই।

লড়াই থামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রাফি।

দৌড়ে আসছে জিনা। চিৎকার করে বলল, ‘থাম রাফি, থাম! কাজ হয়ে গেছে! আর দরকার নেই! ভয় নেই। এক্ষুণি ঝুলে দেয়া হবে তোকে।’

মুক্তি পাওয়ার জন্যে ছটফট করল না রাফি। চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু স্প্যানিয়েলটা টানাটানি শুরু করল। জাল ছাড়াতে না পেরে খট! খট! করে চেঁচাতে লাগল। মুসা আর রবিন তাকে ধরতে যেতেই কামড়ে দিতে চাইল। জালের জন্যে পারল না।

এগিয়ে এসে তার পাশে বসে পড়ল জিনা। নরম গলায় কথা বলতে বলতে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। একটু অবাক হয়ে গেল কুকুরটা। চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

কোমল গলায় বলে চলেছে জিনা, ‘ভয় নেই, কুরি। ওভাবে তাকিয়ে কি দেখিস? আরে আমি জিনা! তোর কোন ক্ষতি করা হবে না! চুপ কর। কোন ভয় নেই।’

বড় বড় চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে স্প্যানিয়েলটা। কুকুর বশ করার অসাধারণ ক্ষমতা জিনার। দেখতে দেখতে শাস্ত হয়ে গেল কুরিয়ার।

জাল থেকে বের করে আনা হলো তাকে। আর কামড়ানোর চেষ্টা করল না। সঙ্গে করে কলার নিয়েই এসেছে। সেটা তার গলায় পরিয়ে দিল মুসা।

কথা বন্ধ করছে না জিনা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুকুরটার নাম যে ওরা

কুরিয়ার রেখেছে এটা বুঝিয়ে ফেলল। পক্ষে থেকে বিস্তৃত বের করে দিয়ে বলল, ‘নে, খা। আরও চাইলে আরও দেব।’ রাফির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ‘কি রে, তোর হিংসে হচ্ছে নাকি? হিংসের কিছু নেই। একটু পরই তো বন্ধু হয়ে যাবি, জানি। নে, তুইও নে।’ রাফিকেও বিস্তৃত দিল সে।

বিস্তৃত খাচ্ছে কুরিয়ার, তার গা ঘেষে এল রাফি। বন্ধুত্ব করার ইচ্ছে। কিন্তু সন্দেহ গেল না স্প্যানিয়লের। খালিক আগে যে তাকে মারতে এসেছিল এখনও ভোলেনি। ভয় যায়নি। খউ খউ করে ধমক দিয়ে সরে গেল।

কাত হয়ে পড়ে থাকা খাঁচাটা আবার সোজা করে বসিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, ‘আর এখানে কোন কাজ নেই। চলো। অপেক্ষা করে করে যখন কিডন্যাপাররা দেখবে কুকুরটা যাচ্ছে না, কি হয়েছে নিজেরাই আসবে দেখতে।’

‘প্ল্যান মত এখন সব কিছু ঠিকঠাক চললেই হয়,’ রবিন বলল।

‘চিঠিটা পড়ে ব্যাটাদের মুখের অবস্থাটা কেমন হয় দেখতে ইচ্ছে করছে,’ মুসা বলল। ‘আচ্ছা, আমরা রয়ে গেলেও তো পারি? ওরা এলে ওদের পিছু নেব।’

‘বোকার মত কথা বোলো না,’ কিশোর বলল। ‘ওদের সাড়া পেলেই চিন্কার শুরু করবে কুরিয়ার। বিপদে ফেলে দেবে। প্ল্যান যা করেছি সব যাবে গড়বড় হয়ে। চলো, যাই।’

অস্ত্রি হয়ে ওদের অপেক্ষা করছে টকার। কুরিয়ারকে দেখে আনন্দে প্রায় লাফাতে শুরু করল। ‘বাহ, ধরা তাহলে পড়েছে। ভেরি শুড়। কিন্তু এটাকে রাখব কোথায়?’

প্রশ্নটা বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা দিল সবাইকে। তাই তো? একথাটা তো ভাবিনি। বোকা হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

‘খাইছে!’ কানের গোড়া চুলকাল মসা। ‘কোথায় রাখব? টকারদের বাড়িতে তো নয়ই। ওখানেই প্রথম খুঁজতে যাবে কিডন্যাপাররা।’

‘গেলে কিছু হত না,’ টকার বলল। ‘আমাদের ঘরে আটকে রাখতাম। কিছু করতে পারত না ওরা। কিন্তু পারব না ডোরার জন্যে। সন্দেহ করে বসবে সে। নানা রকম প্রশ্ন শুরু করবে। শেষে বলে দেবে আব্বাকে। আমাদের গোয়েন্দাগিরি বাদ হয়ে যাবে তখন।’

‘কিন্তু বাড়ি থেকে বেশি দূরেও রাখা যাবে না,’ জিনা বলল। ‘ওর ওপর নজর রাখতে পারব না তাহলে। তাছাড়া খাওয়ানোরও অসুবিধে হবে। পোষা জানোয়ারকে না খাইয়ে রাখাটা খুবই খারাপ। খুব কষ্ট হয় ওদের। আমার একদম পছন্দ না।’

‘দূর, আগেই ভাবা উচিত ছিল একখাটা! নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল কিশোর। ‘একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। কাছাকাছি পোড়ো বাড়ি তো আছে। সেগুলোর কোনটাতে রাখব কিনা ভাবছি।’

‘উচিত হবে না। আটকে থাকলে চেঁচাতে পারে কুরিয়ার। পাশ দিয়ে লোক গেলে শনে ফেলবে। ছেড়ে দেবে।’

‘এক কাজ করলে কেমন হয়?’ টকার বলল, ‘বনের মধ্যে কোথাও বেঁধে

রাখি। লোকে যেখানে কম যায়। একটা ঝুপড়ি-টুপড়ি বানিয়ে তাতে রেখে দেব। এসে এসে খাইয়ে যাব।'

'না, ওভাবে একা থাকতে পারে না কুকুর,' জিনা বলল। 'একলা থাকলে খুব কষ্ট পায়। বাঁধা থাকলে তো আরও খারাপ লাগে ওদের। এমন চেঁচানো শুরু করবে দশ মাইল দূর থেকেও শুনতে পাবে লোকে।'

মহা সমস্যায় পড়ল ওরা। কোন সমাধান বের করতে পারছে না। একেক জন একেক প্রস্তাব করছে। কোনটাই গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, এত কিছু করে এখন এই রাখার সমস্যাটার জন্যেই সব কিছু গড়বড় হয়ে যাবে।

পরম্পরের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে রাফি আর কুরিয়ার। এখনও সহজ হতে পারেনি স্প্যানিয়েলটা।

আচমকা হাত ভালি দিয়ে উঠল টকার। জায়গা ঠিক করে ফেলেছে। বলল, 'পেয়েছি! প্রথমেই মনে পড়ল না কেন? আশ্র্য!

'কোথায়! কোথায়!' প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল অন্য চারজন।

'নিরাপদ হবে তো?' মুসার প্রশ্ন।

'সব চেয়ে নিরাপদ। পালাতে পারবে না কুরিয়ার। হাজার চিক্কার করলেও তার ডাক শুনতে পাবে না কেউ। ওখানে তাকে খোজার কথাও মাথায় আসবে না তার মনিবদ্দের।'

'কোথায়?' অবৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর।

'আমাদের লাইটহাউসে।'

আলো জ্বলে উঠল কিশোরের চোখে। 'আসলে মাথাটা ইদানীং ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে আমার! আমিও ভাবলাম না কেন?'

'চলো, এক্সুপি চলো,' তাগাদা দিল টকার।

মুসা বলল, 'টকার, জায়গাটা সত্যিই নিরাপদ তো? বড় বেশি নড়বড়ে মনে হয় দেখে। ভেঙ্গেটেঙ্গে পড়বে না তো?'

হেসে ফেলল টকার। 'লোকে সেই ভয়েই ওটার ধারেকাছে যায় না। দেখলে মনে হয় বাতাস এলেই ধসে পড়বে। তবে ভেতরটা খুব শক্ত, আরো বলেছে। সহজে পড়বে না।'

ওদেরকে আরও নিশ্চিত করার জন্যে বলল সে, 'কেনার পর আর্দ্ধারও সন্দেহ হয়েছিল, তাই তার এক আর্কিটেক্ট বন্ধুকে এনে দেখিয়েছে। দেখেটোখে তিনি বলেছেন, ওটার ভিত, দেয়াল এখনও অনেক শক্ত। কিছুই হবে না।'

'ই,' মাথা দোলাল কিশোর। 'ঠিক জায়গাই বের করেছ। ওখানে নিয়ে যাওয়াই নিরাপদ।'

'কিন্তু এত রাতে যাবে?' মুসার মনে ভৃতের ভয় চুকেছে। 'শুনেছি পুরানো লাইটহাউসগুলো ভাল না। আর জায়গাটার কি নাম! ডেমনস রক! না জেনে তো নাম দেয়নি লোকে। নিচয় ভৃত্যাত কিছু দেখেছে। এই অস্ত্রকারে নৌকা নিয়ে যাওয়াও নিরাপদ নয়।' আমি বলি কি, আজকের রাতটা বাড়ির কাছেই কোথাও লুকিয়ে রাখি। কাল দিনের বেলা টকারদের নৌকায় করে নিয়ে গিয়ে রেখে আসব।'

‘তা নাহয় রাখা গেল,’ রবিন বলল। ‘কিন্তু ওরকম একটা নিরালা জায়গায় কি রাখা উচিত হবে? কষ্ট সহিতে না পেরে শেষে সাগরে ঝাপিয়ে পড়েই হয়তো সাঁতরে পালানোর চেষ্টা করবে।’

‘একলা ধাকবে না,’ সমাধান করে দিল জিনা। ‘রাফিকে রেখে দেব ওর সঙ্গে। মাত্র তো দুদিনের ব্যাপার। অসুবিধে হবে না।’

চোদ্দ

কুরিয়ারকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল ওরা। বাইরে কোথাও কিংবা বাগানের ছাউনিতে রাখলে কিউন্যাপাররা এসে নিয়ে যেতে পারে, তাই ওকে ঘরেই রাখার সিদ্ধান্ত নিল।

জিনা বলল, তার ঘরেই রাখবে। খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখবে। পাহারায় থাকবে রাফি। কোন ভাবেই আর পালাতে পারবে না কুরিয়ার। তবে পালানোর চেষ্টা যাতে না করে সেই ব্যবস্থাও করবে। খাওয়াতে খাওয়াতে পেট ভারি করে ফেলবে। পড়ে পড়ে তখন ঘুমাবে শুধু।

রাফির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে স্প্যানিয়েলটার। সুতরাং ওটাকে আটকে রাখতে খুব একটা অসুবিধে হবে বলে মনে হলো না জিনার।

‘রাফি,’ বলল সে, ‘তোর ওপরই ডরসা করছি আছি। বাইরে সামান্যতম শব্দ শুনলে কিংবা কোন কারণে তোর সন্দেহ হলেই ডাকবি আমাকে।’

‘হ্টু! করে যেন বোঝাতে চাইল রাফি, ‘আছা।’

তবু সে রাতে ভাল করে ঘুমাতে পারল না জিনা। বার বার ঘুম ভেঙে যেতে লাগল।

কুকুরটার ভাবনায় অন্যদেরও ঠিকমত ঘুম হলো না, বিশেষ করে টকারের।

পরদিন সকালে কুরিয়ারকে ঘর থেকে বের করে লাইটহাউসে নিয়ে যাওয়াটা একটা সমস্যা। প্রথম অসুবিধেটাই হবে ডোরাকে নিয়ে। দেখে ফেললেই ভুক্ত কোঁচকানো আর হাজারটা পশ্চ। সত্যি কথাটা বের না করে রেহাই দেবে না। টকারের আর্কাকে নিয়ে অবশ্য ভাবনা নেই। তাঁর সামনে দিয়ে তিনটে উঁট আর দশটা হাতি বের করে নিয়ে গেলেও খেয়াল করবেন না তিনি। আরেকটা ভয়, কিউন্যাপারদের নিয়ে। বাড়ির ওপর নজর রাখতে পারে ওরা। কুকুরটাকে দেখে ফেলতে পারে। সেটা কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না।

সমাধান করে দিল রাবিন।

‘এক কাজ করা যায়। এমন ভান করব, যেন লাইটহাউসে আমরা পিকনিক করতে যাচ্ছি,’ বলল সে। ‘বড় একটা ঝুড়িতে ভরে নেব কুরিয়ারকে। টেবলকুঠ দিয়ে ঢেকে দেব। ও শব্দ না করলে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। ভাববে ঝুড়িতে করে খাবার নিছি।’

‘টু শব্দও করবে না,’ আশ্বাস দিল জিনা। ‘এমন খাওয়ান খাওয়াব, ঝুড়িতে থেকে থেকে শুধু ঘুমানো ছাড়া আর কিছু করার কথা ভাবতে পারবে না। কাল

রাতেই দেখেছি ওটা সাংঘাতিক পেটুক আর অলস।'

আধ ঘণ্টা পর ঘাটে এসে দাঁড়াল গোয়েন্দারা। আজ নটিকেও নিয়েছে সঙ্গে। বড় ঝুড়িটা নিয়েছে মুসা। অন্যদের হাতও খালি নেই। দ্বিতীয় ব্যাগে প্রচুর খাবার ঠেসে নিয়েছে টকার—ট্যাটো স্যাউইচ, ডিম সেঙ্ক, ফ্রুট কেক, আর তাজা আপেল। জোরে জোরে পিকনিকের কথা বলছে ওরা, কেউ কান পেতে থাকলে শুনতে পাবে। সন্দেহ করতে পারবে না।

'আহ, লাইটহাউসে কি মজাটাই না হবে আজ,' জিনা বলল। 'এই চলো চলো, জলন্দি নামে সবাই। নৌকায় উঠতে হবে।'

তাড়াহড়ো করে বোটে উঠল সবাই। যেন লাইটহাউসে যাওয়ার জন্যে তর সইছে না। তাড়াটা আছে ঠিকই, তবে পিকনিকের জন্যে নয়, অন্য কারণে। যত জলন্দি সম্ভব কুরিয়ারকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলতে চায়। এখনও গোলমাল করেনি বটে, কিন্তু যদি করে বসে?

লাইটহাউসে পৌছতে বেশিক্ষণ লাগবে না। পানির নিচ থেকে উঠে আসা একটা পাথুরে টিলায় কয়েকশো বছর আগে তৈরি হয়েছিল এই লাইটহাউস। এদিকের সাগরে প্রায়ই ঝড় ওঠে, অশান্ত হয়ে ওঠে সমুদ্র। পাথুরে পাড়ে আছড়ে পড়ে কিংবা চোরাটিলায় ঘষা লেগে প্রাচীন কাঠের জাহাজ ঢুবে যাওয়ার ভয় ছিল। তাই ওগুলোকে সাবধান করে দেয়ার জন্যেই তৈরি হয়েছিল এই লাইটহাউস।

টকার খুব ভাল নাবিক। চমৎকার ভাবে নৌকাটাকে সামলাল। নিয়ে এল লাইটহাউসের কাছে। গোড়ায় পাথরের অভাব নেই। ওগুলোর ফাঁকে একটা জাফরা দেখাল টকার। সে আর মুসা মিলে বোটাকে বাঁধল সেখানে।

লাফিয়ে বোট থেকে পাথুরে তীরে নামল সবাই। আগে আগে চলল টকার। পাথরের ধাপ বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। অবাক হয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দা আর জিনা। এখানে পা দিয়েই কেমন অস্তুত একটা অনুভূতি হচ্ছে ওদের। মনে হচ্ছে, এক লাফে যেন কয়েকশো বছর আগের পৃথিবীতে চলে এসেছে।

হাঁপ ছাড়ল সবাই। এখন নিচিত। ঘূম থেকে জেগে উঠে চেঁচিয়ে যদি গলা ফাটিয়েও ফেলে কুরিয়ার, আর ভয় নেই। কেউ শুনতে পাবে না তার ডাক।

ঝুড়িটা বইছে এখন রবিন আর মুসা। ওপর থেকে টেবলকথ সরাল জিনা। নড়ে উঠল কুরিয়ার। অলস ভঙ্গিতে চোখ মেলল। হাই তুলল। শরীর ঝাকাল।

কিশোর আর টকার ততক্ষণে লাইটহাউসের দরজার কাছে পৌছে গেছে। বিরাট দরজার পান্নায় লোহার হাতল লাগানো। সেটা ঘুরিয়ে দরজা খুলতে হয়। বেশ জোর লাগে খুলতে।

টকার বলল, 'যাক, এলাম ঠিকমতই...'

কখা শেষ হলো না তাৰ। একটা চাপা ভয়াবহ গর্জন শোনা গেল। অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সে। কিশোর, রাফি, জিনা আৱ রবিন যেন পাথর হয়ে গেছে। আতঙ্ক ফুটেছে মুসার চেহারায়। ভূতের ভয়ে।

'কিসের শব্দ?' ফিসফিস করে জিজেস কৱল রবিন।

আবার শোনা গেল গর্জন। প্রথমবারের চেয়ে জোরাল আৱ ভীতিকৰ।

পাথরের সিঁড়িতে প্রতিধ্বনি তুলন গরগর শব্দ। রেগে যাওয়া কিংবা উত্তেজিত হয়ে ওঠা জানোয়ারের গলা থেকে ফেমন বেরোয়, তেমন।

হঠাতে বুঝে ফেলল টকার। ডয় দূর হয়ে গিয়ে চোখে দেখা দিল বিশ্বয়। আনন্দনেই বিড়বিড় শুরু করল, ‘অস্ত্রব! ইমপ্রিসিবল! এ হতেই পারে না! এ তো টারকজের গলা!’

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে যেন উড়ে নেমে এল ‘কালো আর হলুদ রঙের একটা বিলিক। বাঁপিয়ে এসে পড়ল ওদের পায়ের কাছে। কোন ভুল নেই, টকারের টারকজ। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে অবলীলায় সামনের দুই পা তুলে দিল বন্ধুর কাঁধে। আনন্দে গরগর করছে।

সেই ভার সামলাতে পারল না যেন টকার। ভাঁজ হয়ে এল হাঁটু। ধপ করে বসে পড়ল পাখুরে মেঝেতে।

তার গাল চেটে দিতে এল টারকজ। পারল না। মুখে মাজল পরানো।

একটানে ওটা খুলে দিল টকার। আবেগে উচ্ছিসিত হয়ে উঠল, ‘টারকজ, কেমন আছিস, টারকজ! কত জাফগায়ই না তোকে খুজেছি! অথচ বন্দি হয়ে আছিস আমারই লাইটহাউসে! কে ভাবতে পেরেছিল, বল?’

‘দেখো, গলায় কত লম্বা দড়ি’ রবিম বলল। ‘নিচয় আমাদের সাড়া পেয়ে ছাড়া পাওয়ার জন্যে অস্ত্রির হয়ে উঠেছিল। ছিড়ে ফেলেছে।’

‘ওকে এখানে পেয়ে যাব, বিশ্বাসই করতে পারছি না আমি!’ মুসা বলল।

টারকজকে পেয়ে নটি আর রাফিও খুশি। একজন গিয়ে তার পিঠে চড়ে বসেছে, আরেকজন গাল চেটে দিচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে জিনা বলল, ‘কি যে খুশি লাগছে আমার। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? স্বাভাবিক আচরণ করছে টারকজ। তার মানে কিডন্যাপাররা তাকে রীতিমতই খাবার দিয়েছে। না খাইয়ে রাখেনি।’

সবাই খুশি, যার যার মত কথা বলছে। হঠাতে কি মনে পড়ায় উদ্ধিষ্ঠ হয়ে বলল মুসা, ‘আনন্দ পরেও করা যাবে। এখন তাড়াতাড়ি পালাতে হবে আমাদের। সোজা এসে যে বাধের শুহায় চুকে পড়েছি সে খেয়াল আছে? দেখেছে এখানে কেউ আসেটাসে না, সে জন্যে লাইটহাউসটাকে হেডকোয়ার্টার বানিয়েছে কিডন্যাপাররা। যে কোন মৃহূর্তে এসে হাজির হতে পারে।’

‘মনে হয় না,’ যাথা নাড়ল রবিন। ‘কোন বোটটোট তো দেখলাম না।’

‘দেখিনি, তার মানে তখন কাছাকাছি ছিল না। এসে পড়তে কতক্ষণ। তাছাড়া সবাই যে চলে গেছে, এমন না-ও হতে পারে। একজনকে অস্তত পাহারায় রেখে যেতে পারে।’

গভীর হয়ে আছে কিশোর। বলল, ‘যাওয়ার আগে একবার তল্লাশি চালানো দরকার। একআধজন যদি থেকেই থাকে অত ভয়ের কিছু নেই। আমরা মানুষ কম না। তার ওপর রয়েছে টারকজ আর রাফির মত দুটো জীব। একজনের সঙ্গে পারব না এ হতেই পারে না।’

তার লাইটহাউস কতগুলো শয়তান লোক দখল করে বসে আছে এটা মোটেও মেনে নিতে পারছে না টকার। কিশোরের কথা শেষ হতেই টারকজকে

নিয়ে সিড়ির দিকে রওনা হল।

ওপরে ওঠার কয়েক সেকেণ্ট পরেই লাফাতে লাফাতে নেমে এল আবার সিড়ি বেয়ে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা।

‘ওরা আসছে!’ গলা কাঁপছে তার। ‘একটা মোটর লক্ষে করে। কি করব এখন? ওদের আসতে দেরি হবে না। আমাদের দাঢ় টান নৌকা নিয়ে ওদের সঙ্গে পারব না। ধরে ফেলবে।’

‘তখনই বলেছিলাম,’ গজগজ করতে লাগল মুসা। ‘কেউ পাওয়াই দিল না আমার কথায়... এখন বোবো মজা...’

‘যা হবার তো হয়ে গেছে। এখন কি করা যায় সেটা ভাবো,’ রাবিন বলল।

‘উপায় একটা বেরোবেই,’ কষ্টস্বর স্বাভাবিক রেখেছে কিশোর। ‘এত মাথা গরম করলে চলে না। শোনো, আমাদের নৌকাটা ছোট নৌকা। রেখেছি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে। ওদের চোখে পড়ার সঙ্গাবনা কম। কিছু জানা না থাকলে খুঁজতেও যাবে না। তার মানে আমরা যে এসেছি এটা বুঝতে পারার কথা নয় ওদের।’

‘কিন্তু এখানে চুকে তো আমাদের দেখে ফেলবে,’ মুসা বলল। ‘নুকানোর কোন জাফণা আছে বলেও তো মনে হয় না। যেখানেই থাকি, দেখে ফেলবে। আপাতত ওপর তলার কোন একটা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। এছাড়া আর তো কোন উপায় দেখি না।’

‘চলো, সিড়ির মাথায় উঠে যাব।’

‘সিড়ির মাথায়?’ ওখানে গিয়ে কি লাভ বুঝতে পারল না টকার। ‘ওটা শেষ হয়েছে চূড়ার বাতি রাখার ঘরে। ওখানে উঠলে আটকা পড়ে যাব। কোন দিক দিয়ে আর বেরোতে পারব না।’

‘তখন আর কি করব? ওপর থেকে সাগরে ঝাপিয়ে পড়ব,’ মুখ গোমড়া করে আরেক দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।

তার কথায় কান দিল না কিশোর। বলল, ‘আটকা পড়ব যদি কিউন্যাপাররা আমাদের অনুসরণ করে ওপরে ওঠে। ওরা তো জানছেই না আমরা এসেছি। কাজেই নিচেই থাকবে। ওপরে ওঠার কোন কারণ নেই। টারকজকে দেখার জন্যেও নয়। কারণ ওরা জানে ওকে ওপরতলার ঘরে বেঁধে রেখেছে। এসো, আর দেরি কোরো না। ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।’

ঘোরানো সিড়ি বেয়ে প্রায় দৌড়ে উঠতে শুরু করল কিশোর। আর কিছু করার নেই। বাকি সবাই পিছু নিল তার।

কুরিয়ারকে তুলে নিয়েছে মুসা। মোলায়েম গলায় তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে ওপরে উঠে যাতে যেউ যেউ না করে। কুকুরটা শান্ত স্বভাবের। গোলমাল করবে বলে মনে হয় না। ঘুমই ভাঙছে না ওটার। একবার চোখ মেলে তাকিয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সিডির গোড়ায় একটা ঘর। দরজাটা খোলা। ভেতরে কিছুই নেই। খালি।

সেদিকে একবার তাকিয়ে সিডি বেয়ে উঠতে শুরু কুরল কিশোর। পেছনে

তার দলবল। কয়েক ধাপ উঠে ছোট একটা ল্যাঙ্গিং এসে দাঁড়ান ওরা। ডানে একটা আলমারি। হাঁ হয়ে খুলে আছে দরজা। তেতরে কিছু দড়ি আর একটা বড় হক রয়েছে। আলমারির ওপরে গোল একটা জানালা। তাতে লোহার মোটা মোটা শিক।

‘একটা শিক দেখিয়ে কিশোর বলল। ‘দেখ, দড়ির ছেঁড়া অংশ। এখানেই বেঁধে রেখেছিল টারকজকে।’

নিচে সদর দরজা খোলার শব্দ হলো। চুপ হয়ে গেল সবাই। কান থাঢ়া।

টকারের কাঁধে হাত রেখে তাকে তার দিকে ফেরাল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, ‘ইয়ে করো, আবার টারকজের মুখে মাজলটা পরিয়ে দাও। ডাঙাৰ সঙ্গে বেঁধে রাখো। ও যে ছুটে গিয়েছিল যাতে না বুঝতে পারে চোৱো।’

‘বাঁধার দরকার কি? ছাড়া থাকলেই তো লড়াইটা ভালমত করতে পারবে।’

‘আহ, তর্ক কোরো না! যা বলছি করো।’

অবাক হলো টকার। তবে আর কথা বাড়ান না। মাজলটা টারকজের গলাতেই ত্রোলানো আছে। টেনে এনে মুখে লাগিয়ে দিল আবার। তারপর দ্রুতভাবে দড়িটা বেঁধে দিল ডাঙাৰ সঙ্গে।

‘চলো এখন,’ বলল কিশোর, ‘যেখানে যাচ্ছিলাম যাই। টকার, নটিকে শান্ত রাখো। কোন শব্দ যেন না করে। রাফি, একদম চুপ। কোন আওয়াজ করবি না।’ আনন্দনে বিড়বিড় কৰল, ‘সমস্যা হবে কুরিয়াৱকে নিয়ে। ও ডেকে না উঠলেই বাঁচি।’

পনেরো

ছায়াৰ মত নিঃশব্দে সিড়িৰ বাকি ধাপগুলো পেরিয়ে এল ওৱা।

নিচে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো। উঠে আসছে লোকগুলো।

কেন আসছে? ল্যাঙ্গিং পেরিয়ে আসবে না তো? তাহলেই গেছি, ভাবল মুসা। না, এল না ওৱা।

‘এই নে, গোশত, জংলী জানোয়াৰ কোথাকার,’ বলল একজন। বোৰাই গেল চিতাটাকে গাল দিচ্ছে লোকটা। ‘মাজল মুখে নিয়েই খেতে হবে। খুলে দিয়ে কামড় খেয়ে হাতটা খোয়াতে পারব না।’

‘গেরিস, শোনো,’ বলল আৱেকটা কষ্ট, ‘অনেক হয়েছে।’ এই জানোয়াৰটাকে আটকে রাখার আৰ কোন অৰ্থ দেখি না। ওকে ওৱা মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আমাদেৱ ববকে নিয়ে আসা দৰকার। তারপৰ চলো এখান থেকে চলে যাই। ফৰমুলা পাওয়াৰ আশা ছেড়ে দেয়াই ভাল।’

‘কি যে বলো না, ডিগাৰ! জানো ওই ফৰমুলাটাৰ দাম কত?’

‘না, আৰ জানতে চাই না। বহুবাৰ শনেছি। বেশি লোভ কৰতে গিয়ে জেলে পচে মৰাৰ ইচ্ছে নেই আমাৰ।’

‘চিতাটাকে ছেড়ে দিলে এখন জেল এড়াতে পারবে ভেবেছ? বৰং যাওয়াটা

আরও ভাগিয়ে আনবে, ওই বিচ্ছু' ছেলেমেয়েগুলো আমাদের রেহাই দেবে না। চিতাটাকে পেলেই ববকে ছেড়ে দেবে ওরা। তারপর ওকে অনুসরণ করে চলে আসবে। খুঁজে বের করবে আমাদের।'

মনিবের কষ্টস্বর শুনে একটা চোখ মেলল কুরিয়ার ওফে বব। একটা কান নাড়ল। কিন্তু আদর করে ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিল মুসা। পকেট থেকে চিনির একটা বড় টুকরো বের করে মুখে পূরে দিল জিনা। আদর আর মিষ্টি পেয়ে আবার আরামে চোখ মুদল সাংঘাতিক অলস কুকুরটা।

নিচে নেমে যেতে শুরু করল পায়ের শব্দ। কথাও অস্পষ্ট হয়ে এল ধীরে ধীরে। পরম্পরের দিকে তাকিয়ে স্বন্তির নিঃশ্বাস ফেলল গোয়েন্দারা। পরিস্থিতি কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে কি করে যেন বুঝে ফেলল রাফি ও নাটি। রাফি লেজ নাড়তে লাগল, নাটি টুকারের চুল টানতে লাগল।

'যাক, গেল ব্যাটারা,' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'যায়ানি, কেবল নিচে নেমেছে,' শুধরে দিল কিশোর। 'এসো, আমরা ও নামি। ফরমুলাটা হাতানোর জন্যে নতুন কি যুক্তি করে শুনি।'

আগে আগে নেমে চলল কিশোর। কয়েক ধাপ নামতেই আবার কানে এল পদশব্দ। উঠে আসছে একটা চোর।

দ্রুত এদিক ওদিক তাকিয়ে আর কোন উপায় না দেখে দড়ি রাখা আলমারিটাতেই চুকে পড়ল কিশোর। আস্তে করে টেনে দিল দরজাটা। ঘাপটি মেরে রাইল অঙ্কারে।

ওপরে প্রায় দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে তার সহকারীরা। ঠিক ওই মুহূর্তে আবার চোখ মেলল বব। আরেকটু হলেই দেকে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি আরেক টুকরো চিনি তার মুখে ভরে দিয়ে কোনমতে ঠেকানো হলো।

দরজার ফাঁক দিয়ে উকি দিয়ে কিশোর দেখল, একটা লোক চলে গেল তার সামনে দিয়ে। লম্বাটে মুখ। নাকে চশমা পরিয়ে দিলে রূপকথার বইয়ের শেঁরীল পণ্ডিত হয়ে যেত। আলমারিতে থেকে একা একাই হাসি পেল তার। কিন্তু লোকটার শুনে ফেলার ভয়ে হাসতে পারল না।

নিচু হয়ে সিঁড়ি থেকে এক প্যাকেট সিগারেট তুলল লোকটা। পড়ে শিয়েছিল কোনভাবে, সেটা নিতেই উঠে এসেছে। নিয়ে ঘূরল আবার নেমে যাওয়ার জন্যে।

চলে গেল লোকটা।

পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরেও আরও মিনিটখানেক অপেক্ষা করল কিশোর। তারপর বেরিয়ে কয়েক ধাপ উঠে শিয়ে সঙ্গীদের বলল, 'এসো। চলে গেছে। টুকার, টারকজের মাজল আর বাঁধন খুলে দাও।'

খুব সাবধানে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল গোয়েন্দারা।

'নেমে করবটা কি?' জানতে চাইল মুসা।

'পালানোর চেষ্টা করব,' ফরমুলা চুরির প্ল্যান জানার আর আগ্রহ নেই কিশোরের।

সিঁড়ির শেষ মোড়টায় এসে দাঁড়িয়ে গেল সে। সাবধানে গলা বাড়িয়ে উকি

দিল। নিচতলায় চলে গেছে বটে লোকগুলো, কিন্তু দরজা টেনে দিয়ে যায়নি। এতে ওদের কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। তবে গোয়েন্দারা বেরোতে গেলেই চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

‘কারসওয়েনের বাচ্চাটা আর ওর দোস্তগুলোকে ধরতে পারলেই হয় একবার,’ রাগে গৌঁ গৌঁ করল এক চোর, ‘ঘাড় মটকে না দিয়েছি তো আমার নাম শোরিস নয়।’

‘ওটাই ওদের একমাত্র শাস্তি,’ বলল ডিগার। ‘বাপরে বাপ! এত বিচ্ছু পোলাপান আর দেখিনি! কি চালাকিটাই না করল। চিঠিটা যখন তুমি পড়ছিলে, আমার তো তয়ই লাগছিল হার্টফেল না করে ফেলি।’

চালাকির মজা বুবাবে। এমন শিক্ষা দেব, একেবারে সিখে হয়ে যাবে। জীবনে আর ছোক ছোক করবে না। যত যা-ই করুক, চিতাটা আমি ফেরত দিচ্ছি না। না দিয়েও ববকে ফেরত আনব, ফরমূলাটা আদায় করব। বুদ্ধি একটা বের করে ফেলেছি। তবে এখানে আর থাকা চলবে না। দুটো কারণে। ববকে ব্যবহার করে জায়গাটা বের করে ফেলতে পারে। আর আসল কারণটা গায়ে শুনে এসেছ। তরতর করে নেমে যাচ্ছে ব্যারোমিটার। ঘড় আসছে, প্রচও ঘড়। এই ভাঙা লাইটহাউস মোটেও নিরাপদ নয়। তলায় পড়ে মরতে চাই না। ডাঙায় চলে যাব। যাও, চিতাটাকে নিয়ে এসো।’

ভাবনায় পড়ে গেল গোয়েন্দারা। এবার কি করা? সিডি বেয়ে আবার ওপরে ফিরে যাওয়ারও সময় নেই।

কিন্তু তক্ষণ উঠে এল না ডিগার। বলল, ‘তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এখন দিনের বেলায় ওটাকে নিয়ে যাব কি করে? লোকে দেখে ফেলবে না?’

‘না, ফেলবে না। ওদের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ঘড়ের মধ্যে আমাদের দেখার জন্যে বসে থাকবে। সব গিয়ে ঘরে দরজা দেবে। জেলেরা ও কখন নোক্তা বেঁধে ঘরে চুকবে সেই তালে থাকবে। সবাই ব্যস্ত। আমাদের দিকে কে নজর দেবে? এখানে আসার সময়ও যে কেউ দেখল না, খেয়াল করোনি? একটা নোকাও দেখিনি।’

‘তবু, কখন কি হয়ে যায় বলা যায় না। বুঁকি না নেয়াই ভাল।’

‘এখানে থাকলে বুঁকি আরও বাড়বে। যা বললাম করো। তাড়াতাড়ি। সময় নেই।’

যে কোন মুহূর্তে এখন বেরিয়ে আসতে পারে ডিগার। হয়তো সঙ্গে গেরিসও বেরোবে।

‘ইস্, দরজাটা যদি খালি বন্ধ রাখত,’ ভাবছে কিশোর, ‘তাহলে আর কোন অসুবিধে ছিল না। এতক্ষণে বেরিয়ে গিয়ে নোকায় চেপে বসতে পারতাম। টেরই পেত না ওরা কিছু।’

খোলা দরজার সামনে দিয়ে যাওয়া এখন মোটেও নিরাপদ নয়। তাছাড়া লোকও ওরা কম নয়। দল বেঁধে পার হতে গেলে চোখে পড়ে যাবেই। ওদের কাছে অস্ত্র না থাকলে অবশ্য অতটা তয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু বলা যায় না।

পিস্তল থাকতে পারে।

কিশোরের বাহতে হাত রাখল রবিন। ফিসফিস করে বলল, ‘কি করা যায় বলো তো কিশোর?’

‘একটা কিছু তো করতেই হবে।’

কিন্তু কি করবে নিজেই জানে না সে। বুঝতে পারছে, সময় নেই। ইতিমধ্যেই অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে জানোয়ারগুলোর। ঘড়ের গন্ধ পেয়ে গেছে। নার্ভাস হয়ে উঠছে ক্রমে। এখানে থাকলে আর বেশিক্ষণ চুপ থাকবে না। বুড়ির মধ্যে লেজ আরও শুটিয়ে ফেলেছে বব। পুরানো মনিবর্দের কাছে যাওয়ার ইচ্ছে দেখাচ্ছে না একবারও। তার মানে তার সঙ্গে কখনই ভাল আচরণ করেনি ওরা।

কোনই বুদ্ধি বের করতে পারছে না কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কেটে চলেছে নিচের ঠোঁটে।

উপায়টা বের করল এই সময় টকার। ‘দাঁড়াও। পেয়েছি।’

ঝট করে চার জোড়া চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। জিনার তো মনেই হতে লাগল বিপদে পড়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ছেলেটার। সিঁড়িতে বসে পড়ে সামনে রাখল বানরটাকে। অঙ্গুত, হাস্যকর কয়েকটা ভঙ্গি করল। বানরটাকে নকল করতে ইঙ্গিত করল।

এই নতুন খেলাটা মনে ধরল নটির। শুরু করে দিল সে।

টকার নিজের নাক ডলল। নটিও ডলল। টকার ঘাড় চুলকাল। বানরটাও চুলকাল। টকার যা করল, বানরটাও ঠিক তাই করতে লাগল।

মুসা বলল, ‘পাগল হয়ে গেলে নাকি? এখন বানরের খেলা দেখানোর সময় নয়।’

ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপ থাকতে ইশারা করল টকার। ‘মনে হচ্ছে কাজ হবে। দেখছ না?’

কিছুই দেখল না মুসা। তবে চুপ হয়ে গেল।

বানরটাকে ওপরে নিয়ে গেল টকার। আলমারিটা দেখাল। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে আস্তে করে আলমারির দরজা বন্ধ করল। খুলল। আবার বন্ধ করল। চাবিতে মোচড় দিয়ে তালা লাগাল। খুলল। লাগাল। খুলল।

গভীর মনোযোগে লক্ষ করছে বানরটা।

তিন গোয়েন্দা আর জিনাও তাকিয়ে আছে। টারকজ চুপ। রাফি চুপ। সবারই চোখ টকার আর নটির দিকে। কি করতে চাইছে টকার, বুঝে ফেলেছে কিশোর। আঝত নিয়ে তাকিয়ে আছে তাই। ভাবছে, কাজ হবে তো?

দরজার কাছ থেকে সরে গিয়ে বানরটাকে ইশারা করল টকার।

এগিয়ে গেল নটি। আলমারির দরজাটা একবার দেখল। তারপর লাফ দিয়ে মুহূর্তে বিকট শব্দে বাজ না পড়লে তখনি শুনে ফেলত কিডন্যাপাররা, কি হয়েছে দেবার জন্যে ছুটে চল আসত।

মৃত এগিয়ে আসছে ঘাড়।

আবার দরজা খুলল টকার। বন্ধ করল। সরে জায়গা করে দিল বানরটাকে।

নটিও তাকে নকল করল।

দরজা বন্ধ করে কয়েকবার তালা লাগাল টকার।

নটিও লাগাল। শিখে ফেলল চাবিতে মোচড় দিয়ে তালা লাগানোর কৌশলটা।

হাসি ছড়িয়ে পড়ল টকারের সারা মুখে। বস্তুদের দিকে তাকিয়ে ভুঁক নাচিয়ে জিজেস করল, ‘কি মনে হয় তোমাদের? কাজ হবে?’

‘আমার বিশ্বাস,’ মুসা বলল, ‘অহেতুক সময় নষ্ট করছ। এসব না করে এতক্ষণে ওপরে চলে যেতে পারতাম আমরা। বাতি রাখার ঘরে গিয়ে বসে থাকতে পারতাম।’

‘আমি কি করতে চাইছি বোঝোনি?’

‘বুঝেছি। গাধা তো আর নই। নটিকে দিয়ে ডাকাতদের ঘরের সামনের দরজাটা বন্ধ করাতে চাইছে। বানরকে দিয়ে নকল করানো আর আসল কাজ করানোয় অনেক তফাত।’

কিন্তু তার কথায় দমল না টকার। নটির ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। বানরটাকে দরজা বন্ধ করার দ্বিনিং দিয়ে ফেলেছে। ঠিকমত যাতে করতে পারে সে জন্যে প্র্যাকটিস করাতে লাগল।

নতুন এই খেলাটা খুব পছন্দ হয়েছে নটির। লাফ দিয়ে গিয়ে দরজা লাগিয়ে চাবিতে মোচড় দিয়ে তালা লাগিয়ে দিল তৃতীয়বারের মত। সামান্যতম ভুল হলো না।

তাকে সরিয়ে দিয়ে পান্নায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল টকার। বানরটাকে আর চাবিতে হাত দিতে দিল না।

আবার দরজা বন্ধ করার জন্যে অস্ত্রির হয়ে উঠল নটি। কিন্তু কিছুতেই তাকে করতে দিল না টকার। করার জন্যে যখন কিছিমিছ শুরু করে দিল নটি, তখন তাকে নিয়ে কয়েক পা সরে এল সে। আসতে কি আর চায় বানরটা। কেবলই টকারের হাত থেকে ছুটে গিয়ে আলমারির দরজার কাছে যেতে চায়।

হাত তুলে নিচের ঘরের দরজাটা তাকে দেখাল টকার। ইঙ্গিতে কিছু বোঝাল।

দম বন্ধ করে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা আর জিনা।

ফিসফিস করে টকার বলল, ‘যা, নটি যা। দরজা বন্ধ করগে। দেখি, কেমন শিখেছিস?’

যোলো

ঘড়ি দেখল রবিন। মিনিটের কাঁটাটা যেন দৌড়ে চলেছে। নটি যদি দরজা লাগাতে পারেও, ওবা কি ডাঙায় যাওয়ার সময় পাবে? যে হারে এগিয়ে আসছে ঝড়, তাতে তো ভয়ই লাগছে। ওই ডাকাতগুলোর সঙ্গে এই লাইটহাউসে কাটাতে আর সাহস হচ্ছে না।

বুক্সিটা ভালই বের করেছে টকার। তবে বানরটাকে দিয়ে কাজ হবে কিনা

বোঝা যাচ্ছে না। বড় বেশি শব্দ করে ওটা। আশ্বে করতে পারে না কোন কিছু। এত শব্দ করতে গিয়ে লোকগুলোর নজরে পড়ে গেলেই সব শেষ। আর কিছু করতে পারবে না। বাতাস আর বজ্রপাতের শব্দ না থাকলে এতক্ষণে অনেক আগেই শুনে ফেলত লোকগুলো।

এখনও তর্ক চালিয়ে যাচ্ছে গেরিস আর ডিগার। কি করবে সে ব্যাপারে একমত হতে পারছে না। চালাক, আরও জোরেশোরে চালাক। ভাবল রবিন। তাহলে সময় পাওয়া যাবে।

এদিকের ঘড়ের স্বভাব বড় বিচ্ছিন্ন। এই দেখা গেল আকাশ পরিষ্কার, একটু পরেই মেঘে ঢেকে যাবে। ধখেয় আসবে বাতাস। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে যাবে প্রচণ্ড বাড়।

বাইরে এখন তাই ঘটছে। বাজ পড়ছে ঘন ঘন। শৌ শৌ বাতাসের গর্জন। লাইটহাউসের চারপাশে আছড়ে পড়ছে উভাল টেট। ডয় লাগছে, ওদের বোটটাকে উড়িয়ে দেয়নি তো? দড়ি ছিড়ে টেনে নিয়ে যায়নি তো?

এক দ্রষ্টিতে নটির দিকে তাকিয়ে আছে ক্লিশোর। মুসা আর জিনার চোখও সেদিকে। সত্যিই পারবে তো বানরটা? যা করতে চাইছে টকার, সফল হবে?

কি করতে বলছে তার মনিব, বুঝে ফেলল হঠৎ বানরটা। সিডির নিচের খোলা দরজাটার দিকে ছুটে গেল লাফাতে লাফাতে। কিটির যিচির করছে। চুপচাপ যেন কোন খেলাই খেলা যায় না। বড় হট্টগোল করা স্বভাব এই বানরগুলোর, বিরক্ত হয়ে ভাবল মুসা।

নিচে নেমেই পান্না ধরে ঠেলতে শুরু করল নটি।

উত্তেজিত হয়ে তাকিয়ে আছে গোয়েন্দারা।

যদি বক্স করতে না পারে নটি? যদি তাকে দেখে ফেলে চোরেরা? আর পান্না লাগানোই আসল কথা নয়। তার পরেও বাজ আছে। তালা লাগাতে হবে। চাবিতে মোচড় দেয়ার আগেই যদি সন্দেহ করে বসে ওরা, ঠিক ছুটে আসবে দেখার জন্যে।

দরজাটা আলমারির পান্নার মত অত হালকা নয়। ছোট্ট বানরটার শক্তিতে কুলাবে তো?

কুলাল। নড়ে উঠেছে পান্না। ধীরে ধীরে সরতে আরম্ভ করেছে।

আরও জোরে ঠেলতে লাগল নটি।

আচমকা দড়াম করে লেগে গেল ওটা।

চমকে গেল গোয়েন্দারা। রবিন তো চোখই বুজে ফেলল। মনে হচ্ছে, এই বুঝি শোনা গেল রাগত চিত্কার। ধখেয় এল কিডন্যাপাররা।...কিন্তু কিছুই ঘটল না। এবারেও তাদেরকে বাঁচিয়ে দিল ঘড়। চোরেরা নিচয় ভেবেছে, ঘড়ের বাতাসে ধাক্কা দিয়ে দরজা লাগিয়েছে।

চোখ মেলে বানরটার কাও দেখে হেসে ফেলল সে। তালাটা অনেক ওপরে। বার বার লাফিয়ে উঠে ওটাকে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে নটি। চেঁচিয়ে চলেছে একনাগাড়ে। তার ভঙ্গ দেখে না হেসে পারা যায় না।

ইস, এত জঘন্য স্বভাব কেন বানরটার! চুপ থাকতে পারে না! যে হারে চিংকার করছে, লোকগুলোর কানে যাবেই। ঝড়ের শব্দ আর বেশিক্ষণ ধোকা দিতে পারবে না ওদের।

হঠাৎই মনে হলো তার, বানরটা যে কাজ করতে পারছে না, সেটা ওদের কেউ করে দিলেই তো পারে? সে নিজেও তো করতে পারে?

মনস্তির করে ফেলল সে, ঝুঁকিটা নেবে। কিশোরের অনুমতির প্রয়োজন বোধ করল না। অত সময় নেই।

লাফিয়েই চলেছে নটি।

আর দ্বিধা করল না রবিন। দিল ছুট। লাফাতে লাফাতে নেমে এল নিচে।

ঠিক একই সময়ে একই ভাবনা খেলে গেছে মুসার মনেও। সে-ও দৌড় দিয়েছে। তবে দরজার কাছে আগে পৌছল রবিন। হাত বাড়াল।

কিচির মিচির আরও বেড়ে গেছে বানরটার।

ভেতরে শোনা গেল গেরিসের কষ্ট, ‘কিসের শব্দ? আশ্চর্য! দেখতে হয়...’

আর শোনার অপেক্ষা করল না রবিন। চাবিটা ধরেই মোচড় দিল।

কিন্তু অনেক পুরানো তালা আর চাবি। লাগানোও হয় না বোধহয় অনেক দিন। ঘূরল না। মরচে ধরে আটকে গেছে।

উঠে আসছে গেরিস। শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

আর দাঁড়িয়ে রইল না অন্যেরা। দিল সদর দরজার দিকে দৌড়। তালা লাঙুক বা না লাঙুক, আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। তাদের সঙ্গে গেল চারটে জানোয়ার।

মরিয়া হয়ে উঠল রবিন। বেশি জোরে মোচড় দিলে চাবি ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু সে ভয় আর করল না। দিল মোচড়।

কিং কিং আওয়াজ উঠল।

ঘূরল চাবিটা।

লেগে গেল তালা।

ঠিক এই সময় পান্নায় হাত দিল গেরিস। ঠেলে খুলতে পারল না। জোরে জোরে ধাক্কা দিতে শুরু করল।

আর দাঁড়াল না রবিন। বন্ধুদের পেছনে ছুটল।

লাইটহাউসের পেছনে বাঁধা রয়েছে টকারের নৌকাটা। ওটার কাছে যেতে কিডন্যাপাররা যে ঘরে বন্দি হয়েছে ওটার জানালার সামনে দিয়ে যেতে হয়।

বাইরে বেরিয়ে নৌকার দিকে দৌড় দিল কিশোর গোয়েন্দাদের বিচিত্র দলটা।

* সঙ্গে রয়েছে চার চারটে জানোয়ার। একটা চিতা, দুটো কুকুর, একটা বানর।

ঝড়ের মধ্যে নিঃসঙ্গ ওই লাইটহাউসের গোড়ায় দৃশ্যটা হয়েছে দেখার মত। দেখার লোকও আছে...

জানালার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় চোরগুলো কি করছে দেখার কৌতুহলটা সামলাতে পারল না গোয়েন্দারা। ঘাড় ঘূরিয়ে তাকাল।

ওরা দেখে ফেলেছে তাদেরকে। জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন।

শেয়ালমুখো লোকটা ।

‘এই গেরিস, দেখে যাও কাও !’ সঙ্গীকে ডাক দিল সে । চোখ ধৈন ছিটকে বেরিয়ে আসবে । এতটাই অবাক হয়েছে । ‘বিছুগুলো পালাছে !... চিতাটাকে নিয়ে !’

দরজা ধাক্কানো বাদ দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল গেরিস । চোখ তারও বড় বড় হয়ে গেছে । চেঁচিয়ে বলল, ‘চুকল কখন ! আরি, ববকেও নিয়ে যাচ্ছে !’

রাগে অঙ্গ হয়ে গেছে দুজনেই । কিন্তু কিছু করতে পারছে না । তাতে রাগ বাড়ছেই । আর কিছু করতে না পেরে জানালার শিক চেপে ধরে গায়ের জোরে ঝাঁকাতে শুরু করল । ভেঙে ফেলতে চায় ।

প্রানো শিক । কতক্ষণ টিকবে কে জানে । আরও তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজন বোধ করল গোয়েন্দারা । এখন যদি শিক ভেঙে বেরিয়ে আসে চোরগুলো, ওদের এত কষ্ট সব বিফলে যাবে ।

লাইটহাউসের পেছন দিকে দৌড় দিল মূসা । হারিয়ে গেল পাথরগুলোর আড়ালে । তার পেছনে ছুটেছে আর সবাই ।

সাগরের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠল ওদের বুক । কি বড় বড় ঢেউ । মাথায় সাদা ফেনার মুকুট । যেন টগবগ ফুটছে সাগরের জল । ফুঁসছে প্রচণ্ড রাগে ।

এখনও পাথরের ঘেরের মধ্যে টেউয়ের জোর ততটা বাড়েনি । তবে আরেকটু উচু হলেই পাথরের দেয়াল ডিঙিয়ে এসে ভেতরে পড়বে । ভেঙে ঝঁড়িয়ে দেবে ছোট্ট নৌকাটা । চোরগুলোর ভয় বাদ দিলেও নৌকাটাকে বাচানোর জন্যেই এখন আরও তাড়াতাড়ি করতে হবে ওদেরকে ।

‘এই ওঠো ওঠো তোমরা !’ তাগাদা দিল মূসা । নৌকার দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে । সবাই উঠলেই খুলে দেবে ।

আগে ঠেলেঠুলে জানোয়ারগুলোকে তুলে দেয়া হলো । বড় দেখে নৌকায় থাকতে ভয় পাচ্ছে ওগুলো । তারপর এক এক করে উঠল টকার, জিনা, রবিন ও কিশোর । মূসা উঠল সবার শেষে । অনেক যাজী । কোনমতে জারুরা হলো ।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে । শাঁই শাঁই করে আঘাত হানছে বাতাস । খাবলা মেরে টেউয়ের মাথা থেকে পানি ছিনিয়ে নিয়ে আবার টেউয়ের গায়েই ছুঁড়ে মারছে । কালো মেঘের মধ্যে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে । চিরে দিছে আকাশের এপাশ থেকে ওপাশ । শুড়ুগুড়ু শব্দ হচ্ছে মেঘের ভেতরে । থেকে থেকে বাজ পড়ছে কান ফাটা আওয়াজে ।

দাঁড় তুলে নিল টকার আর জিনা ।

‘ভয় নেই,’ বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে চিক্কার করে বলল জিনা । এত দুর্যোগেও হাসল সে । সাগরকে একটুও ভয় পায় না । ‘ঠিকই চলে যাব আমরা । খোলা সাগরের চেয়ে বৱং এখানেই ভয় বেশি । লাইটহাউসের কাছ থেকে সরে যেতে হবে যত তাড়াতাড়ি স্বত্ব !’

দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে রবিনের । কিছুটা ভয়ে, কিছুটা উজ্জেবনায়, কিছুটা শীতে । ‘ঝড়ের ভয় নাহয় না-ই করলাম । কিন্তু চোরগুলোর ? ওদের মোটুর বোট

আছে। ধরে ফেলবে।'

নিচের ঠোটে জারে একবার টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। চিংকার করে বলল, 'জিনা, আরেকটু তাড়াতাড়ি বাও। একটা বুদ্ধি এসেছে।'

লাইটহাউসের কাছ থেকে সরাতেই বেশি কসরত করতে হলো দুই মাস্তা জিনা আর টকারকে। একপাশ থেকে বাড়ি মাস্তার চেষ্টা করছে ঢেউ। কায়দা মত কয়েকটা বাড়ি মারতে পারলেই দেবে উল্টো। কিন্তু ঢেউকে সেই সুযোগ দিল না জিনা।

আতঙ্কে কুকড়ে গেছে জানোয়ারগুলো। মৃদু গরগর করছে টারকজ। বুঝিতে ভিজে গেছে শরীর। এটা পছন্দ হচ্ছে না তার। রাফিও ভয় পেয়েছে, তবে সেটা প্রকাশ করছে না। এরকম বিপদে পড়ে অভ্যাস আছে। মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না জিনার ওপর থেকে। ওখানেই তার সব ভরসা। টকারের ঘাড়ে মুখ উঞ্জে গোঙাচ্ছে নটি। চোখ তুলে তাকানোর সাহস নেই। মুসার কোলে কুকড়ি-বুকড়ি হয়ে আছে বব। বুড়ি ফেলে দিয়ে তাকে কোলে করে নৌকায় তুলে দিয়েছিল মুসা। সে এসে বসতেই আবার তার কোলে এসে ঢেড়ে স্প্যানিয়েলটা।

কেউ কথা বলছে না। লাইটহাউসের দিকে তাকাচ্ছে না। ভয়ে। চোরগুলো জানালার শিক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসছে, এ-দৃশ্য দেখতে চায় না।

প্রাণপনে দাঢ় বাইছে জিনা আর টকার।

তার নতুন বুদ্ধিটা কাজে লাগানোর জন্যে অস্ত্রির হয়ে আছে কিশোর।

জিনা ভাবছে, ঢেউয়ের যা চাপ! দাঢ়ে সইবে তো? ভেঙ্গে না যায়! তাহলে শেষ।

লাইটহাউসের জেটির দিকে নৌকা নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল কিশোর। দেখেওনেই ওদিকে জেটি তৈরি করা হয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতেও যাতে বোট ধাঁধা যায়। ঢেউয়ের উৎপাত এখানে অনেক কম। চুক্তেই পারছে না পাখরের দেয়াল ডিঙিয়ে।

ওখানে কেন যেতে চায় কিশোর কেউ বুঝতে পারল না। তর্ক করার সময় নেই। নীরবে সেদিকে এগোল জিনা আর টকার।

মিরাপদেই জেটিটা যে পাশে সেদিকে নৌকা নিয়ে এল দু'জনে। কোন অফটন ঘটল না।

'জেটির কাছে নিয়ে যাও!' চিংকার করে নির্দেশ দিল কিশোর। 'সিডির কাছে! জলদি!'

কোথায় লাইটহাউসের কাছ থেকে সরে যাবে, তা না, আরও কাছে যেতে চাইছে! এতটাই অবাক হলো টকার, দাঢ় বাওয়া থামিয়ে দিল। চোখের পলকে ধাক্কা দিয়ে নৌকাটাকে ঘুরিয়ে ফেলল ঢেউ। আরেকটু হলেই দিয়েছিল উল্টো।

ঢেঁচিয়ে উঠল জিনা, 'করো কি, করো কি! জোর ধাঁধো! ও বলছে করো!'

আবার দাঢ়ে হাতের চাপ বাড়াল টকার। কিশোর কেন জেটির সিডির কাছে নৌকা নিয়ে যেতে চাইছে সে চিত্তা বাদ দিয়ে নিজের কাজে মন দিল।

আধ মিনিট পরেই মোটর লঞ্চটার পাশে চলে এল নৌকা।

'জলদি গিয়ে লক্ষে ওঠো সবাই,' কিশোর বলল। 'মুসা, সবাই উঠে গোলে

ନୌକାଟା ବେଁଧେ ଫେଲିବେ ଲକ୍ଷେର ସଙ୍ଗେ ।'

ଏତକ୍ଷଣେ କିଶୋରର ଉଦ୍‌ଦୟ ବୁଝାତେ ପେରେ ହାସଲ ଟକାର । ଚୋରଗୁଲୋକେ ଲାଇଟହାଉସେ ନିର୍ବାସିତ କରେ ଓ ଦେଇଇ ଲକ୍ଷ ନିଯେ ପାଲାତେ ଚାଯ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରାପ୍ରଧାନ । ଏକଟା ପ୍ରଶଂସାର କଥା ବେରିଯେ ଗେଲ ମୁଁ ଦିଯେ । କିନ୍ତୁ କେଉ ଶୁନିତେ ପେଲ ନା । ଟେକେ ଦିଯେଛେ ବାତାସେର ଗର୍ଜନ ।

ଟେଉ ଏଥାନେ ପ୍ରାୟ ନେଇ ବଲଲେଇ ଚଲେ । ନୌକା ଥେକେ ଲକ୍ଷେ ଉଠିତେ ମୋଟେଓ ଅସୁବିଧେ ହଲୋ ନା କାରାଓ । କେବଳ ଟାରକଜ ଖାନିକଟା ଗୋଲମାଲ କରଲ । ପାନିକେ 'ତାର ଭୀଷଣ ଡଯ । ଶେଷେ କିଶୋର, ମୁସା ଆର ରବିନ ମିଲେ କୋନମତେ ଠେଲେଠୁଲେ ତାକେ ତୁଲେ ଦିଲ ।

ଲକ୍ଷେର ପେଛନେ ନୌକା ବାଁଧତେ ମୁସାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରଲ ଟକାର ।

ତତକ୍ଷଣେ ଇଞ୍ଜିନ ସ୍ଟାର୍ଟ ଦିଯେ ଫେଲେଛେ ଜିନା । ହଇଲେ ହାତ ଦିଯେ ସବେ ଘୋରାତେ ଯାବେ, ଏହି ସମୟ ଲାଇଟହାଉସେର ଦରଜାର କାହିଁ ଥେକେ ଶୋନା ଗେଲ ଏକଟା ଚିତ୍କାର । ଘରେର ଦରଜା ଡେଙ୍ଗେଇ ବୋଧହ୍ୟ ବେରିଯେ ଚଲେ ଏସେହେ ଦୁଇ ଚୋର । ଛୁଟେ ଆସିଛେ ।

ବନବନ କରେ ହଇଲ ଘୋରାଲ ଜିନା । ଚୋରେର ପଲକେ ନାକ ଘୁରିଯେ ଫେଲିଲ ଲକ୍ଷେର । ସାଗରେର ଦିକେ ନାକ ଘୁରେ ଯେତେଇ ସ୍ପ୍ରିଡ ଦିଲ । ଲାଫ ଦିଯେ ଆଗେ ବାଡ଼ିଲ ଲକ୍ଷ । ଏକେବାରେ ସମୟମତ । ଆର କଯେକ ସେକ୍ରେଟ ଦେରି ହଲେଇ ଓ ଦେଇକେ ଧରେ ଫେଲିଲ ଚୋରେରା ।

ଏଥିନ ଆର କିଛୁ କରାର ନେଇ ବ୍ୟାଟାଦେର । ସିଡ଼ିର ମାଥାଯ ଦାଁଡିଯେ ଚିତ୍କାର କରେ ଗାଲାଗାଲ କରିଛେ ଆର ଘୁସି ଦେଖାଛେ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରାଦେର ।

ସେଦିକେ ତାକିଯେ ହାସଲ ମୁସା । ଓ ଦେଇକେ ଆର ଓ ରାଗିଯେ ଦେଯାର ଜନ୍ୟେ ସେଦିକେ ଫିରେ ସ୍ୟାନ୍ତୁ କରଲ । ବଲଲ, 'ଥାକୋ ମିଯାରା, ଆଟକେ ଥାକୋ ଓଖାନେ । ଆବାର ଆସଛି ଆମରା । ପୁଲିଶ ନିଯେ । ନେହାୟେତ ଟକାର ବ୍ୟଥା ପାବେ ବଲେଇ ଲାଇଟହାଉସଟା ଡେଙ୍ଗେ ପଦ୍ବୁକ ଏହି ବଦଦୋଯାଟା କରିଲାମ ନା ।'

ତାର ଏକଟା ବର୍ଣ୍ଣଓ ଅବଶ୍ୟ ଶୁନିତେ ପେଲ ନା କିଡନ୍ୟାପାରରା । ତୀର ହୟେ ଉଠେଛେ ବାଡ଼, ଆରଓ ବେଡେଛେ ତାର ଗର୍ଜନ ।

ସତେରୋ

ଟକାରଦେର ଜେଟିତେ ଲକ୍ଷ ଡେଢ଼ାତେ ପାରଲ ନା ଜିନା । ଅତ ଓତ୍ତାଦ ନାବିକ ନୟ ଦେ । ଧାଙ୍କା ଦିଯେ ଦିଯେ ଝାଡ଼ ତାକେ ବିପଥେ ସରିଯେ ଦିଲ । ଅନେକ କଟେ ଏଗୋଲ ଏକଟା ଜେଲେ ପାଡ଼ାର ଦିକେ ।

ବାଡ଼ର ମଧ୍ୟେ ଲକ୍ଷ୍ଟାକେ ବେସାମାଲ ଅବସ୍ଥାଯ ଦେଖିତେ ପେଲ କଯେକଜନ ଜେଲେ । ନିଚ୍ଯ ବିପଦେ ପଡ଼େଛେ କେଉ, ଡେବେ ଝାଡ଼ ମାଥାଯ ନିଯେଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିତେ ଏଗିଯେ ଏଲ ଓରା ନିଜେଦେର ବୋଟ ନିଯେ । ଦୁଦିକ ଥେକେ ଦଢ଼ି ଛୁଡେ ଦେଯା ହଲୋ ଦୁଟୋ ବୋଟ ଥେକେ । ନିଜେଦେର ଲକ୍ଷେର ସଙ୍ଗେ ସେଶୁଲୋ ବେଁଧେ ଫେଲିଲ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରାରା ।

ଟାନିତେ ଟାନିତେ ଲକ୍ଷ୍ଟାକେ ତୀରେ ଏମେ ଡେଢ଼ାନେ ହଲୋ । ତାତେ ଏସେ ଉଠିଲ ଦୁଜନ ଜେଲେ । ଲକ୍ଷେର ଯାଆଦେର ଦେଖେ ତୋ ଓରା ଅବାକ । କଯେକଟା କିଶୋର-

মশোরী আর চারটে জানোয়ার। তার মধ্যে আবার একটা চিঠিও আছে।

কিশোর বলল, ‘দুটো আকাতকে আটকে রেখে এসেছি ডেমনস রকের ইইটহাউসে। পুলিশে খবর দেয়া দরকার।’

শুনে চোখ আরও কপালে উঠে গেল জেলেদের। সংক্ষেপে তখন সব কথা দেরকে বলতেই হলো কিশোরকে।

হেসে উঠল একজন জেলে। ‘অত তাড়াতাড়ি না করলেও চলবে। ওখান থকে সাঁতরে তৌরে যাওয়ার কথা দুঃস্মেরণ ভাববে না কেউ।’

ঝড়ের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন দলটাকে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে পৌছে দিল জেলেরা।

গোয়েন্দাদের কাহিনী শুনে হাঁ হয়ে গেলেন ডিউচিরত সার্জেন্ট। সামলে নিতে ময় লাগল। হাসি ফুটল তাঁর মুখে। বললেন, ‘কাজই করে এসেছ একটা। মহায়তান ওই চোরদুটো। অনেক কেস আছে ওদের বিরুদ্ধে। পুলিশ ওদের খুঁজছে।’

কাছের থানায় টেলিফোন করলেন তিনি।

কয়েকজন পুলিশ নিয়ে তখনি রওনা হয়ে যাচ্ছেন একজন সুপারিনটেনডেন্ট, ধানা থেকে জানানো হলো।

অনেক ধক্ক গেছে। তোয়ালে দিয়ে তেজা শরীর মুছে এসে চেয়ারে বসল গোয়েন্দারা। সার্জেন্টের দেয়া গরম কোকার কাপে আরামসে চুমুক দিতে লাগল। শুচুর মাথন ভাসছে কাপের ওপরে।

অফিসারের আসতে বেশি সময় লাগল না। গত কয়েক দিনের পূরো ঘটনাটা খুলে বলল গোয়েন্দারা।

শুনে তাদেরকে ধন্যবাদ দিলেন সুপারিনটেনডেন্ট। অনেক প্রশংসা করলেন তাদের। তারপর বললেন, ‘ঝড় একটু কমলেই চলে যাব। পুলিশের বোট আছে। অসুবিধে হবে না।’

‘আমাদেরকে নেবেন সঙ্গে?’ অনুরোধ করল কিশোর।

হাসলেন সুপারিনটেনডেন্ট। ‘তোমাদের না যাওয়াই ভাল। লোকগুলোর কাছে পিণ্ডল-বন্দুক থাকতে পারে। গোলাগুলি হওয়ার ভয় আছে। তোমরা বরং ঝুঁকনেই থাকো...’

বলতে বলতে থেমে গেলেন তিনি। ছেলেমেয়েদের কালো হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভাবলেন। বললেন, ‘ঠিক আছে, তোমাদেরকে পুরোপুরি নিরাশ করা হবে না। ফিল্ডস দেব তোমাদের। লাইটহাউসে আমরা কি করছি এখানে থেকেই দেখতে পাবে।’

আরও আধ ঘটা পর। থেমে গেল ঝড়। আবার মেঘের ফাঁকে উঁকি দিল সূর্য। লবল নিয়ে লাইটহাউসের দিকে রওনা হয়ে গেলেন সুপারিনটেনডেন্ট।

‘যাটারা না পালালেই হয়,’ বিড়বিড় করল মুসা।

‘তা পারবে না,’ মাথা নাড়ল কিশোর।

ফিল্ডস দিয়ে দেখতে লাগল ওরা। খুব শক্তিশালী জিনিস। একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, লাইটহাউসের গোড়াতেই রয়েছে ওরা।

জেটিতে ভিড়ল পুলিশের বোট। সিঁড়িতে নামল পুলিশ। ধাপ বেয়ে উঠে

গেল।

বাধা এল না কিডন্যাপারদের তরফ থেকে। বুঝে গেছে ওরা, দিয়ে লাভ নেই।
নীরবে আস্ত্রসমর্পণ করল।

বন্দিদের নিয়ে আবার বোটে উঠল পুলিশ। জেলে পাড়ায় ততক্ষণে খবর
ছড়িয়ে পড়েছে। তীব্রের কাছে ভিড় করছে ছেলে-বুড়ো-মেয়েরা।

তীব্রে এসে ভিড়ল বোট। বন্দিদের নিয়ে নামল পুলিশ।

গোয়েন্দাদের কাছে এসে সুপারিনটেনডেন্ট বললেন, ‘হ্যাঁ, এদেরকেই খুঁজছিল
পুলিশ। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।’

হাতকড়া পরা গেরিস আর ডিগারকে সামনে দিয়ে যেতে দেখেই গর্জে উঠল
টারকজ। ভয় পেয়ে গেল দুই চোর। লাফ দিয়ে সরে গেল।

টারকজের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে টকার বলল, ‘হয়েছে হয়েছে, চুপ কর।
শাস্ত হ। আর ভয় নেই। ওরা আর কিছু করতে পারবে না তোর।’

সুপারিনটেনডেন্ট বললেন গোয়েন্দাদের, ‘আমাদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ
করছি তোমাদের। একটা স্টেটমেন্ট লেখাতে হবে। প্রেস থেকেও লোক আসবে।
সীক্ষাংকার দিতে অসুবিধে আছে?’

হসিমুখে মাথা নাড়ল ছেলেমেয়েরা। পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেয়াটা তেমন
পছন্দ নয় কিশোরের। কিন্তু বন্ধুদের আগ্রহ দেখে মানা করতে পারল না।

টকার বলল, ‘আমাদেরও একটা অনুরোধ আছে, স্যার। এই কুকুরটা, বব,
এর কোন মালিক নেই এখন। আমরা কি ওকে রাখতে পারব?’

‘তা পারবে। তবে গেরিস আর ডিগার জেল থেকে বেরিয়ে যদি আবার দাবি
করে, ফিরিয়ে দিতে হবে ওদেরকে।’

‘করলেও আর বব ওদের কাছে যাবে না। এখনই তো যেতে চায় না।’

‘ঠিক আছে, তোমরা এখন বাড়ি যাও। কাল সকাল দশটায় থানায় আসবে।
আমরা রেডি থাকব।’

বাড়ি ফিরে এল ছেলেমেয়েরা। চুকেই সোজা রান্নাঘরের দিকে দৌড় দিল
টকার।

‘ডোরা আন্টি, ডোরা আন্টি, কোথায় তুমি?’ চেঁচাতে লাগল সে, ‘আমরা
এসেছি।’

দৌড়ে বেরোল ডোরা। ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল, মুখ দেখেই বোঝা যায়।
‘এসেছ! কি ভয়ই না পাঞ্চিলাম। ওই হতচাড়া লাইটহাউসে কেউ যায়? ভেঙে
পড়েছে, না আছে এখনও।’

‘বহাল তবিয়তেই আছে,’ হেসে বলল মুসা। ‘ওটার কপালে মরণ নেই।
আজকের বাড়ে যখন ভাঙল না, বহু ফুণ আরও টিকে যাবে।’

টকার বলল, ‘জানো, কাকে নিয়ে এসেছি? এসো, দেখে যাও।’

চিটাটাকে দেখে কিছুক্ষণ বোকা হয়ে তাকিয়ে রইল ডোরা। বিশ্বাসই করতে
পারছে না। আচমকা চিঢ়কার করে উঠল, ‘আরে এ কি কাও! টারকজ! কোথায়
পেলে খাকে?’

‘লাইটহাউসে। কাল সন্ধ্যার পত্রিকাতেই সব দেখতে পাবে। আমাদের ছবি সহ।’

‘জ্যান্টই তো দেখতে পাচ্ছি তোদের। ছবি আর দেখতে যাব কেন? এই টকার, আমাকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ, বাবা? এখন বলতে পারিস না সব?’

‘তা পারি। তোমাকে বলতে অসুবিধে নেই। আগে খাবার দাও। পেট ঠাণ্ডা করি। তারপর বলছি।’

‘আয়। খাবার রেডি করেই রেখেছি।’

চেবিলে অনেকগুলো প্লেট সাজিয়ে দিল ডোরা। ঠাণ্ডা মুরগী, গরুর গোশতের ফ্রাই, সেই সঙ্গে প্রচুর লেটুস—টম্যাটোর চাটনি আর ঘরে তৈরি গরম গরম রুটি। আরও আছে। ইয়া বড় এক গামলা স্ট্রেবেরির পাই, ওপরে পুরু হয়ে আছে মাখন। গলা ডেজানোর জন্যে রয়েছে জিঞ্চার বিয়়র।

চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে মুসার। চেয়ারে বসার আগেই হাত বাড়িয়ে একটা ফ্রাই মুখে পুরে দিল। চিবাতে চিবাতে তারপর বসল।

টকারের আর্কাকে ডাকতে গেছে ডোরা।

রবিন বলল, ‘কারস আংকেল এসে টারকজেকে দেখে কি করেন দেখি।’

মুখে খাবার ভর্তি। জবাব দেয়ার ইচ্ছে থাকলেও দিতে পারল না। তার বদলে জিনা বলল, ‘ভীষণ চমকে যাবেন।’

এই সময় আনমনে বিড়বিড় করতে করতে ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর কারসওয়েল। টারকজের ওপর চোখ পড়তে ভুরু কোঁচকালেন। ‘আরি, এটা এস কোথেকে? আফ্রিকার জন্তু আমাদের বাড়িতে কেন? হঁ, বুঝেছি, তোর কাজ। টকার, আর কত জ্বালাবি, বল তো? জন্তু-জানোয়ার দিয়ে কি বাড়িঘর বোঝাই করে ফেলবি? নাহ, আর পারা যায় না। ডোরা, এখানে বসে খেতে পারব না আমি। খাবারটা আমার ঘরেই দিয়ে যাও।’

বলতে বলতে ঘুরে গেলেন তিনি। আবার বিড়বিড় শুরু করলেন। বোধহয় কোন একটা হিসেব করছেন মনে মনে। ল্যাবরেটরির দিকে চলে গেলেন আবার।

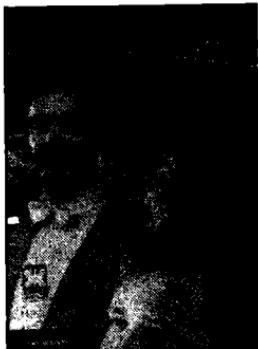
‘টারকজের কথা বেমালুম ভুলে গেছেন,’ অবাক হয়ে বলল রবিন।

‘বাবা বটে একেবজন! নিজের বাবার কথা ভেবে মুখ বাঁকাল জিন। ‘হঁহ!’

দীর্ঘশাস ফেলল কিশোর। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ‘আছে তো, তাই বোঝো না। এত ভাল বাবা পেয়েও খুশি নও।’

অভিনয়

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৯৪



'জিনা, ওরকম আটকে রেখেছ কেন?' হাত বাড়াল
রবিন, 'দেখি দাও না পেপারটা।'

কিন্তু দিল না জিনা। যেন শুনতেই পায়নি।
ইচ্ছে করে এমন করছে। তিনি গোয়েন্দাকে
খেপানোর জন্যে। গভীর মনোযোগে পত্রিকা পড়ার
ভান করল।

টান দিয়ে ওটা তার হাত থেকে কেড়ে নিল
রবিন। একবার তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরি, প্রথম পৃষ্ঠার খবর হয়ে গেছি
আমরা!'

'খাইছে! বিখ্যাত হয়ে গেছি!' মুসা বলল।

'বিখ্যাত আমরা অনেক আগেই হয়েছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'কি
বলিস, রাফি?'

'ঘাউ' করে মাথা ঝৌকিয়ে তার কথা সমর্থন করল রাফিয়ান।

লেখাটা পড়ার জন্যে ঝুকে এল রবিন আর মুসা। মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।
চারটে ছেলেমেয়ে আর একটা কুকুরের গুপ্ত ফটো ছাপা হয়েছে। হেড়িং দেয়া
হয়েছে:

কিশোর গোয়েন্দাদের কৃতিত্ব চোরাচালানি দল প্রেঙ্গার

এরকম কৃতিত্ব অনেক দেখিয়েছে তিনি গোয়েন্দা। জিনা আর রাফিয়ানের
জন্যেও নতুন নয়।

জিনাদের থামের বাড়ি পারকার ভিলার বাগানে বসে আছে ওরা। শীতকাল
হলেও আবহাওয়া ভাল। বড়দিনের ছুটি প্রায় শেষ। তবে এবারের ছুটিটাও বৃথা
যায়নি ওদের। সংঘবন্ধ একটা অপরাধী দলকে ধরিয়ে দিয়েছে।

দরজায় দেখা দিলেন জিনার বাবা। বিখ্যাত বিজ্ঞানী তিনি, তিনি গোয়েন্দাকে
যারা চেনে তারা এখবর ভাল করেই জানে। সব সময় গবেষণা নিয়ে থাকেন।
কঠোর ভাবে নিষেধ করে দেয়া আছে ছেলেমেয়েদেরকে যাতে হই চই না করে,
শান্তিতে কাজ করতে দেয়া হয় তাঁকে। চেঁচামেচি শুনলেই রেগে যান তিনি,
বেরিয়ে আসেন ধর্মক দেয়ার জন্যে। আজও এসেছেন। তবে রাগ নেই মুখে, তার
বদলে হাসি। অবাক হলো গোয়েন্দারা।

'তোমাদের জন্যে একটা সুখবর আছে,' বললেন তিনি। 'আসছে এপ্রিলে
একটা বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিতে সাউথবুর্নে যাচ্ছি। তখন ইস্টার হলিডে
থাকবে। ভাবছি তোমাদেরকেও নিয়ে যাব। চোরাচালানি দলটাকে ধরিয়ে দিতে
পুলিশকে সাহায্য করার পূরক্ষার। সাউথবুর্নের নাম নিচয় শুনেছ। ইংল্যাণ্ডে।

সুন্দর সৈকত আছে। সময় কাটানোর নানা রকম ব্যবস্থা আছে। মজা পাবে খুব। তোমাদের আন্টির কাছে সব শুনে নাও। তবে একটা কথা, নেক্সট যে পরীক্ষাটা হবে তাতে ডাল রেজাল্ট করতেই হবে। খালি চোর-ডাকাত ধরবে আর পরীক্ষায় খারাপ করবে, সেটি হবে না।'

সবাইকে উদ্ভেজিত করে দিয়ে চলে গেলেন পারকার আংকেল।

'শ্রী চিয়ার্স ফর পারকার আংকেল!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'হিপ, হিপ, হুরুরে!' চিৎকার করে বলল জিন। 'আমি জানি, আমার আবাটা বদমেজাজী। কথায় কথায় ধর্মক মারে। তারপরেও আমি তাকে ভালবাসি।'

'আর কেরিআন্টি তো একটা আন্টিই বটে!' উচ্ছুসিত হয়ে বলল রবিন। 'এই আন্টি আর মেরিচাটীটা যদি না থাকত, জীবনের মজাই থাকত না আমাদের।'

'আরও তিন-তিনটে মাস অপেক্ষা করতে হবে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। 'এত আগে যে কেন শোনালেন আংকেল! অপেক্ষা করতে করতেই মরব। খালি ভাবব কখন আসবে এপ্রিল, কখন আসবে এপ্রিল!'

তবে যতটা দেরি হবে ভেবেছিল, এপ্রিল আসতে তত দেরি হলো না। কারণ লেখাপড়ায় ওরা ডুবে গিয়েছিল পুরোপুরি। দ্রষ্টব্য কেটেছে মাসগুলো। পরীক্ষায় খুব ভাল করেছে। যে মুসা প্রায় সব সাবজেক্টেই আলু পায়, তারও চমৎকার রেজাল্ট।

কথা রেখেছেন মিস্টার পারকার। নিজেদের সঙ্গে ছেলেমেয়েদেরও সাউথবুর্ন যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

আগেই টেলিফোনে শহরের একটা দামী হোটেলে ঝুম বুক করে রাখলেন তিনি। তারপর নিদিষ্ট দিনে এয়ারপোর্টে নেমে ট্যাক্সিতে করে তাতে গিয়ে উঠলেন সবাইকে নিয়ে। সবুজের ওপর সোনালি কাজ করা ইউনিফর্ম পরা পোর্টার তাঁদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘর দেখিয়ে দিল। সাগরের দিকে ঝোলা ব্যালকনিওয়ালা ঘরগুলো খুব পছন্দ হলো ছেলেমেয়েদের। খুব খুশি ওরা।

রাক্ষিরও পছন্দ হয়েছে। ঘরময় ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। ধর্মক দিয়েও তাকে খামানো যাচ্ছে না।

সুটকেস খুলে জিনিসপত্র বের করে গোছানোর পর 'আন্টি বললেন ওদেরকে সৈকতের কাছে হোটেলের বাঁধানো চতুরে গিয়ে একটু হাত-পা ছড়িয়ে আসার জন্যে। পরামর্শটা দারুণ মনে হলো ওদের কাছে। হড়াহড়ি করে ছুটল। আহ, ছুটির মজাই আলুনো! আর বিদেশে যদি যাওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই।

সাগর খুব পছন্দ জিন আর মুসার। আমেরিকায় প্রশাস্ত মহাসাগরের তীরে ওদের বাস। ওখানকার চেয়ে এখানকার সাগর অন্য রকম মনে হলো। অতটা ঝাকঝাকেও নয়, নীলও নয়। তবে সুন্দর সন্দেহ নেই। নানা ধরনের নৌকা আর জাহাজ চেউয়ে দুলছে। চমৎকার কয়েকটা ইয়েট আছে। ওগুলো কোটিপিতিদের জাহাজ।

প্রচুর সী-গাল আছে। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে মাথার ওপর। মাটিতে বসছে। একেবারেই পোষা মনে হয়। কাছে দিয়ে হেঁটে গোলেও ওড়ে না। ঝুঁটি আর নানা

রকম খাবারের টুকরো ফেলে লোকে, সেগুলো খাওয়ার জন্যে ভিড় জমায়। পাখিগুলোর দিকে নজর দিল রাফি। তাড়া করল। একেবারে কাছে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে ওরা, যখন গায়ের ওপর এসে পড়ে কুরুটা, তখন কর্কশ চিংকার করে উড়ে যায়। যেন ওদেরকে বিরক্ত করার জন্যে কটু কথা বলে। খানিক দূরে গিয়ে আবার বসে। আবার হেড়ে যায় রাফি।

‘এই রাফি, থাম, থাম,’ হাসতে হাসতে বলল জিনা। ‘লোকের নজরে পড়ে যাব তো।’

‘পড়ে আমরা ইতিমধ্যেই গেছি। ওই দেখো,’ মাথা নেড়ে দেখাল রবিন।

ওদের দিকে এগিয়ে এল এক তরুণ। জিজেস করল, ‘তোমরা নিচয় তিন গোয়েন্দা?’

‘এখন পাঁচ গোয়েন্দা,’ কিছুটা গভীর হয়েই জবাব দিল মুসা।

‘জিনা আর রাফিয়ানকে নিয়ে তো? ওই হলো। তিন গোয়েন্দা বলেই তো নিজেদের পরিচয় দাও।’

‘তা দিই,’ কৌতুহল হচ্ছে কিশোরের। ‘তবে সংখ্যাটা প্রথমে তিন ছিল বলেই তিন গোয়েন্দা নামকরণ করেছিলাম। এখন ওটা দ্বিতীয় মার্ক হয়ে গেছে। পাঁচজন হলেও ওই তিন গোয়েন্দাই। দশজন হলেও তা-ই থাকবে।’

‘তা ঠিক। তোমাদের নাম জানলাম কি করে ভাবছ নিচয়?’

‘না। আমাদের নাম অনেকেই জানে। পত্রিকায় খবর বেরোলে জানবেই।’

‘আমিও পত্রিকা দেখেই জেনেছি। আমেরিকায় সাংঘাতিক নাম করে ফেলেছ তোমরা। এই বয়েসে এমন সব জটিল কেসের সমাধান করে ফেললে নাম ছড়াবেই। এরকুল পোয়ারো আর শার্লক হোমসের চেয়ে কম বিখ্যাত নও তোমরা।’

‘আপনি বোধহয় আমাদের কিছু বলতে চান?’

‘হ্যা, চাই।’ কি জন্যে এসেছে জানাল লোকটা। স্থানীয় রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশনে কাজ করে। সাউথবুর্নে ওরা বেশি দিন থাকবে কিনা জানতে চাইল।

‘খুব বেশি দিন না,’ জিনা বলল। ‘আম্বা একটা সম্মেলন এসেছে। যতদিন চলবে ততদিনই থাকব। দিন পনেরো হবে।’

চুপ হয়ে গেল লোকটা। ভাবছে। মনে মনে হিসেব করছে বোধহয়। তারপর হাসল। ‘ওতেই চলবে। পত্রিকার পাতায় তো চেহারা দেখিয়েছ। টিভিতে দেখাতেও নিচয় আপত্তি নেই?’ জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, ‘তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো। একটা সাংঘাতিক আইডিয়া এসেছে আমার মাথায়। তবে আগে স্টুডিওর সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। এখানে কোথায় উঠেছ, ঠিকানাটা বলো। শীঘ্ৰই আবার যোগাযোগ করব।’

হোটেলের নাম বলল রবিন। রুম নাম্বারও বলল।

আর কিছু বলার সুযোগ দিল না লোকটা। ওদেরকে অবাক করে রেখে উঠে চলে গেল।

ডুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থেকে মন্তব্য করল রবিন, ‘পাগল নাকি!’

‘কি জানি। হয়তো মজা করতে এসেছিল আমাদের সঙ্গে,’ বলল মুসা।

নিচের ঠেঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। ‘আমার তা মনে হয় না। ফালতু কথা বলেনি। নামটা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।’

‘নিজেও তো বলল না। পুরো ব্যাপারটাই কেমন অসুস্থ,’ জিনি বলল।

তবে সেপিল সন্ধ্যাকাল থেকে বসার সময় হতে হতেই ঘটনাটির কথা ভুলে গেল ওরা। খাওয়া শেষ করে হলের মধ্যে দিয়ে আংকেল আর আস্টির পেছন পেছন ঢলেছে এই সময় সামনে এসে দাঁড়াল হোটেলের ম্যানেজার।

‘একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, স্যার,’ বলে মিস্টার পারকারের হাতে একটা কার্ড তুলে দিল সে।

কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে জোরে জোরে পড়লেন তিনি, ‘হেনরি টমাস। প্রডিওসার অ্যাণ্ড ডিরেন্টেল, সাউথ-ইস্ট টেলিভিশন।’

মুখ তুলে ভুক্ত কঁচকে তাকালেন মিস্টার পারকার। ‘নাহ, চিনি না। নামও শুনিনি। তাছাড়া টেলিভিশন দিয়ে আমি কি করব?’

কিন্তু ততক্ষণে কাছাকাছি চলে এসেছে লম্বা একজন লোক। মুখে হাসি। হ্যাঁ, সেই লোকটাই। সৈকতে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল গোয়েন্দাদের।

‘আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল, স্যার। এদের ব্যাপারে,’ ছেলেমেয়েদের দেখাল টমাস। ‘গত শীতে খবরের কাগজে এদের কথা অনেক লেখালেখি হয়েছে। ছোটদের ম্যাগাজিনগুলোতে। আমার আবার ছোটদের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে খুব শখ। ওদের একটা অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে টিভির জন্যে একটা ছবি করতে চাই। আপনি ওদের গার্জিয়ান। তাই আপনার কাছেই এলাম। কয়েক মিনিট সময় হবে?’

হোটেলের লাউঞ্জে এসে বসল সবাই।

টমাস বলল, ‘স্টুডিওর কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি, স্যার। তারা আগ্রহ দেখিয়েছে। চোরাচালানিদের যে দলটাকে ধরিয়ে দিয়েছে ওরা সেটার কাহিনী নিয়ে ছবি করতে চায়। ভাল টাকা অফার দিয়েছে।’

‘টাকার কথা ভাবছি না আমি,’ মিস্টার পারকার বললেন। ‘তবে এসব অভিনয় টেলিনয়...’

‘আব্বা! অনুরোধের সুরে বলল জিনা, ‘ক্ষতি কি গেলে? একটা মজা হবে...’

‘তাই তো,’ সুর মেলাল মুসা। ‘দুনিয়াতে সব জিনিসই জানা থাকা ভাল। অভিনয়েও নিশ্চয় শেখার জিনিস আছে।’

হেসে উঠলেন মিস্টার পারকার। ‘আমাকে ভজাতে চাইছ, না? বেশ, আমার আপত্তি নেই...’

‘আমার আছে!’ বলে উঠল কিশোর। পাকা অভিনেতা সে। অনেক ছোটবেলায়ই টিভি সিরিজে অভিনয় করে নাম কামিয়েছে। তবে তার ধারণা, সেটা বদনাম। জীবনে আর ওসবে যেতে রাজি নয়।

অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল টমাস। টিভিতে অভিনয় করার অফার পেলে এই বয়েসী কোন কিশোর সেটা প্রত্যাখ্যান করতে পারে, জানা ছিল না তার। জিজ্ঞেস করল, ‘কেন?’

‘ওই ক্যামেরা আৰ উজ্জ্বল আলোৰ সামনে দাঁড়াতে আমাৰ ভাল লাগে না।’
‘কিন্তু কিশোৱ…’

‘আমি যাৰ না। সাফ কথা।’

‘আমাদেৱ জন্যেও না?’ অনুৰোধ কৱল জিনা।
‘না।’

দমে গেল জিনা। চৃপসে গেল ফাটা বেলুনেৰ মত। মুখ কালো।

মুসা আৰ রবিনও হতাশ হয়েছে।

সেটা দেখে কেৱিআন্তি বললেন, ‘এক কাজ কৱতে পাৱো। তোমাৰ ভাল না
লাগলে তুমি অভিনয় কোৱো না। ক্যামেৱা আৰ লাইটেৱ সামনে দাঁড়িও না। কিন্তু
স্টুডিওতে যেতে বাধা কোথায়?’

আটিৰ দিকে দীৰ্ঘ একটা মূহূৰ্ত তাকিয়ে রইল কিশোৱ। এক এক কৱে
তাকাল বন্ধুদেৱ মুখৰে দিকে। জোৱে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মেট্টোৱামেৱ
দৃঢ়ৰশ্ব জীবনেও ডুলতে পাৱবে না সে। তবে তাৰ একাৰ জন্যে সবাৱ আনন্দ মাটি
হয়ে যাক, এটাও চাইল না। ধীৱে ধীৱে মাথা নাড়ল, ‘বেশ, সঙ্গে যেতে রাজি আছি
আমি। তবে ক্যামেৱাৰ সামনে দাঁড়াব না।’

আবাৰ হাসি ফুটল সবাৱ মুখে।

মিনফিন কৱে টমাস বলল, ‘কিন্তু দলপতিকে বাদ দিয়ে…’

‘এদেৱ কাউকে দলপতি বানিয়ে নিন,’ সহকাৱীদেৱ দেখাল সে। ‘একজনকে
বানালৈই হয়। ওটা এমন কোন ব্যাপার না। ছবিতে কেউ তো আৰ আসল
চেহাৱাৰ সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে যাচ্ছে না কে কিশোৱ, কে রবিন, কে মুসা।’

‘তা বটে,’ খুশি হতে পাৱল না টমাস। কেউ রাজি হতে না চাইলে জোৱ
কৱে তো আৰ কিছু কৱা যায় না। অগত্যা কিশোৱকে বাদ দিয়েই ছবিটা কৱাৱ
সিদ্ধান্ত নিল। শেষ চেষ্টা কৱল, ‘কিন্তু পাচজন দৰকাৱ আমাৰ। তোমাদেৱ শেষ
আডভেঞ্চুৱটাতে পাঁচজন ছিলে।’

‘আৱেকজন অভিনেতা জোগাড় কৱে নেয়া কোন ব্যাপারই না। যদি ইচ্ছে
থাকে।’

আৱ চাপাচাপি কৱল ‘না টমাস।

‘ওৱা যে যাবে,’ মিস্টাৱ পাৱকাৱ বললেন, ‘আমি তো সঙ্গে যেতে পাৱছি না।
কাজ আছে। দেখাশোনাৰ দায়িত্বটা কি আপনি নেবেন?’

‘নিচয়।’

‘ঠিক আছে। আপনি ওদেৱ সঙ্গে কথা বলুন। আমাৰ কিছু জৱৰি কাজ
সাবতে হবে। যাই?’

‘শিওৱ।’

চলে গেলেন আংকেল আৰ আন্তি।

টমাস বলল, ‘কিশোৱ, ক্যামেৱাৰ সামনে নাহয় না-ই দাঁড়ালে। কিন্তু ছবিটাৱ
অন্যান্য কাজে তো সাহায্য কৱতে পাৱো। বুঝতে পাৱছি, অভিনয়েৰ অভিজ্ঞতা
আছে তোমাৰ। নিচয় তিক্ত অভিজ্ঞতা। যা-ই হোক, তোমাৰ মত বুদ্ধিমান

ছেলেকে আমার দরকার আছে। বিনে পয়সায় কাজ করার না অবশ্যই...'

'না না, পয়সা নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা নেই আমার। ঠিক, আছে অন্য কাজ করতে আমার আপত্তি নেই। বলুন, কি করতে হবে?'

টমাস জানাল, 'ছবিটার জন্যে ক্রিপ্ট তৈরি হচ্ছে। দায়িত্ব দেয়া হয়ে গেছে একজনকে। ক্রিপ্ট তৈরির কাজে সাহায্য করতে পারো।'

বেশির ভাগ ইনডোর সিনই নেয়া হবে সাউথ-ইস্ট টেলিভিশন স্টুডিওতে। আউটডোর সিনের জন্যে যেতে হবে লোকেশনে। তেমন জায়গার অবশ্য অভাব হবে না। গোবেল বীচের মতই সাউথবুর্নের সাগরের ধারেও অনেক পাহাড়-জঙ্গল আছে। শুহা আছে। সৈকত আছে।

আরও কিছু আলোচনা সেবে, দিন দুয়েকের মধ্যে শুটিং শুরু হবে জানিয়ে বিদায় নিল টমাস।

দুই

দুদিন পর সকালে টেলিভিশন স্টুডিও থেকে একটা গাড়ি এল ওদেরকে তুলে নেয়ার জন্যে। অতি আধুনিক বিশাল একটা বাড়ির চতুরে এসে চুকল গাড়ি। এটা টেলিভিশন ভবন। হেনরি টমাস নিজে বেরিয়ে এল অভিনেতাদের স্বাগত জানিয়ে নিয়ে যেতে। সুন্দর্য অফিসগুলো দামী দামী আসবাব দিয়ে সাজানো। মানা রকম যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা আর সাউণ্ড রেকর্ডিং ইকুইপমেন্টের ছড়াছাড়ি। একটা কাঁচের প্যানেলের ডেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে রবিন দেখল, অন্য পাশে একটা সেট সাজানো হয়েছে। শুটিং চলছে।

নিজের বিশাল অফিসকক্ষে ওদেরকে নিয়ে এল টমাস। কয়েকজন লোক বসে আছে সেখানে। পেশাদার অভিনেতা। এই ছবিটাতে কাজ করবে।

পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। একজন খ্যাতিমান অভিনেতা রয়েছে সেখানে। নাম রোজার মরিস। চোরাচালানি দলের সর্দার ডাকার হিউগোর চরিত্রে অভিনয় করবে সে। আরও তিনজন অভিনেতা ডাকাতের অভিনয় করবে, তাদের নাম ডিক নরম্যান, রালি বিহ্যাম ও বব উইলস। একজন সুন্দরী অভিনেত্রীও আছে।

তার নাম জুন মরিস।

হেসে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাত মেলাল-জুন। রাফির সঙ্গে পা মেলাল। শুন্দি করে বললে বলতে হবে হাত-পা মেলাল, অর্থাৎ তার হাত আর রাফির পা।

'ছবিতে আমি হব মিসেস হিউগো,' হেসে হেসে বলল সে। 'ডাকাতের বট। এমনিতেও রোজারের বটাই হতে যাচ্ছি। এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে আমাদের।'

এটা শুনে খুব ভাল লাগল গোয়েন্দাদের। জুনকে পছন্দ হয়ে গেল। অন্য অভিনেতাদের সঙ্গেও কথা বলে কাউকে খারাপ মনে হলো না। এদের সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পাবে।

বাধাধরা সময়। অহেতুক দেরি না করে কাজ শুরু করে দিতে চাইল টমাস। স্টুডিওতে যাওয়ার আগে কিশোর অভিনেতাদের বুঝিয়ে বলল, 'শোনো, তোমরা

যে ভাবে রহস্যটা তেদ করেছ, সে ভাবেই দেখানো হবে পর্দায়। তবে শুটিং তেমন করে ধারাবাহিক ভাবে হবে না। সেটা হবে আমাদের সুবিধে মত। কোনটা আগে কোনটা পরে। শুটিং শেষে টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে আস্ত ছবিটা তৈরি হবে। ইনডোর সীনগুলো আমরা স্টুডিওতে নেব। তারপর যাব আউটডোর শুটিঙের জন্যে লোকেশনে। এতে সময়ও বাচবে, খরচও। আজ তোমাদেরকে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হবে না। আজ শুধু অন্যদের অভিনয় দেখবে। দেখার দরকার আছে। কি ভাবে কি করতে হবে একটা ধারণা ধাকা দরকার। জিনা, মুখ অমন করে রেখেছ কেন? তয়ের কিছু নেই। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোটা কিছুই না। আর তোমরা যেহেতু ঘটনাটা ঘটিয়ে এসেছ অভিনয় করাটাও কঠিন হবে না। বাস্তবে যা যা করেছ তার নকল করলেই চলবে। তাছাড়া অ্যাকশন ছবি। অতটা পাকা অভিনেতার প্রয়োজন নেই। কিশোর, তোমার কি মতের পরিবর্তন হয়েছে? কি ঠিক করলে? অভিনয় করবেই না শেষ পর্যন্ত?’

‘কেন, আরেকজন পাওয়া যায়নি?’

‘যাবে। কিন্তু তুমি যদি করতে খুবই ভাল হত…’

‘আপনি আরেকজন রেডি রাখুন। আমি এখনও বুঝতে পারছি না কি করব। খুব বাজে অভিজ্ঞতা আছে আমার, বুঝলেন। অভিনয়-টেক্নিয়গুলো অ্যালার্জ হয়ে গেছে। নইলে অমন করতাম না।’

‘তোমার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি আমি। ঠিক আছে, মন চাইলেই কোরো। চাপাচাপি করব না। তবে আবারও বলছি, তোমাকে পেলে খুব খুশি হব। তোমার অভিনীত সিরিজগুলোর একটা আমি দেখেছি। বর্ণ অ্যাকটর তুমি, নির্দিষ্টায় বলতে পারি একথা।’

‘বর্ণ অ্যাকটর হওয়ার চেয়ে বর্ণ ডিটেকটিভ হতেই ওর বেশি পছন্দ,’ হেসে বলল মুসা।

তার কথায় হাসল সবাই।

ছবির শুরুটা হলো ডাকাতদের একটা আলোচনা সভার দৃশ্য দিয়ে। সবাই মীটিঙে বসেছে।

সহজ শট। কোন অসুবিধেই হলো না। সেটা নেয়া হয়ে গেলে কিশোর অভিনেতাদের একটা ট্রায়াল শটের ব্যবস্থা হলো। ইতিমধ্যে কিশোরের ব্যাপারে অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে জুন আর রোজারের। তাকে আর কিছুতেই ছাড়তে চাইল না, ওর। চাপাচাপি শুরু করল, অভিনয় করতেই হবে। সুতরাং ট্রায়ালের সময় ক্যামেরার সামনে বাধ্য হয়ে আসতে হলো গোয়েন্দাপ্রধানকে।

বিকেলে হোটেলের কাছে সৈকতে বসে দিনের ঘটনা নিয়েই আলোচনা করতে লাগল ওর। অভিনয়ের ব্যাপারে জিনারও সমস্ত জড়তা কেটে গেছে। বুদ্ধিমতী সে। সহজেই ধরে ফেলেছে ব্যাপারটা। শুটিঙের কথা থেকে ধীরে ধীরে অভিনেতাদের কথা উঠে পড়ল।

‘যাই বলো, মানবগুলো কিন্তু ভাল,’ রবিন বলল।

‘বেশ আন্তরিক,’ জিনার মন্তব্য।

‘রোজারকে আমার বেশি ভাল লেগেছে,’ বলল মুসা।

তবে কিশোর কোন মন্তব্য করল না। তার ধারণা, এত সহজে মানুষ চেনা যায় না। তার সহকারীরা যখন অভিনয় নিয়ে উত্তেজিত, সে তখন প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দেখেছে খুব ভাল করে। অনেক ছোটখাট ব্যাপারও ঠার দৃষ্টি অড়ায়নি। এই যেমন, রোজারের এক গোছা চুল বার বার কপালের ওপর এসে পড়ে। হাত দিয়ে না সরিয়ে মাথা ঝাঁকি দিয়ে সেগুলো সরায় সে। তার বাগদতা জুনের একটা মুদ্রাদোষ আছে। কথা শুরু করবে আমি বলব বলে। রোজারের খালাতো ভাই ডক। একটা বিশেষ ব্যাণ্ডের পিপারমিট খুব পছন্দ তার। সারাক্ষণই চিবায়। বলে, খুব নাকি ভাল জিনিস। সবখানে নাকি পাওয়া যায় না। তবু কয়েকটা দিয়েছে ছেলেমেয়েদের।

প্রদিন শুরু হলো আসল কাজ। কয়েক দিন আগে বাস্তবে যা ঘটিয়ে এসেছে সেটাই এখন অভিনয় করে দেখাতে হবে। প্রথম শটটা নেয়া হবে একটা গুহায়। কৃত্রিম গুহা তৈরি করা হয়েছে স্টুডিওর ভেতর। এই গুহায় গোয়েন্দাদেরকে আটকে রাখবে ডাকাতেরা। কিন্তু রাফি থেকে যাবে বাইরে। ওদের গন্ধ শুকে শুকে চলে আসবে গুহায়। জিনার বাঁধন খুলে দেবে। জিনা তখন তার বস্তুদের মুক্ত করবে।

‘এখন আমাদের শুটিং শুরু হবে,’ টমাস বলল। ‘তোমরা রেডি?’

হাত-পা বেঁধে গুহার ভেতরে রেখে আসা হলো গোয়েন্দাদের। অন্য কাউকে আর আনার প্রয়োজন পড়েনি। শেষ পর্যন্ত অভিনয় করতে রাজি হয়ে গেছে কিশোর। এর একটা বড় কারণ, এখানে সে দলপতি। মোটুরামের অভিনয় করতে শিয়ে যেমন হয়েছে তেমন করে অপমান কিংবা হেনস্তা হওয়ার কিছু নেই। গুহার ভেতরটা অন্ধকার রাখা হয়েছে। আবছা একধরনের অতি ম্যুন্দু সবুজ আলো ঢোকানোর ব্যবস্থা হয়েছে, আসল গুহায় যেমন থাকে। কি করতে হবে বলে দেয়া হলো জিনাকে।

শুটিং শুরু হলো। রাফিকে আসার জন্যে শিস দিল জিনা। স্টুডিওর বাইরে একটা ছোট ঘরে এতক্ষণ আটকে রাখা হয়েছিল কুকুরটাকে। একজন ত্রু শিয়ে ঘরের দরজাটা ফাঁক করে ধরল। ছাড়া পেয়েই আর কথা নেই। খোলা দরজা দিয়ে বন্দুকের শুলির মত ছুটে এসে চুকল স্টুডিওতে।

হো হো করে হেসে উঠল স্টুডিওর সবাই। তার অস্থিরতা দেখে নয়, চেহারা দেখে।

‘কাট!’ রেঁগে চিন্কার করে উঠল টমাস। ‘এটা কি হলো, আঁ? বাস্তারভিলের হাউগের অভিনয় করতে বলা হয়েছে নাকি ওকে?’

বন্ধ ঘরে আটকে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে পড়েছিল রাফি। শুনতে পাছিল, পাশের ঘরেই রয়েছে জিনা। তার কাছে যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল। মুক্তির চেষ্টা করতে শিয়ে তাক থেকে উল্টে ফেলেছে কতগুলো রঙের টিন। রঙ লেগে গেছে গায়ে। পেটের একপাশে লেংকে আছে সবুজ রঙ, অন্য পাশে লাল রঙের ডোরাকাটা। মাথার ওপরটা উজ্জ্বল হলুদ, লেজটা গাঢ়। এসবের ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে আছে তার নিজের আসল রঙ, যেন ঝাশ দিয়ে ছোপ

ছোপ করে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। একটা ভাঁড় মনে হচ্ছে তাকে।

সবাই হেসেই অস্থির। টমাসও বেশিক্ষণ গভীর ধাকতে পারল না। এই অবস্থায় কুকুরটাকে দিয়ে অভিনয় করা যায় না। তারপিন দিয়ে রঙ ঘষে তুলতে অনেকটা সময় লেগে গেল। ওরতেই একটা গোলমাল হয়ে গেল বলে জিনার মেজাজ খারাপ। প্রচুর বকাবকি করল রাফিকে। অন্যাণ্যটা কি করেছে কিছুই বুঝতে না পেরে ওধূ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রাইল রাফি।

যাই হোক, ওরতে গড়বড় হয়ে গেলেও এরপর চমৎকার শট নেয়া গেল। ভাল করে বুঝিয়ে দিল জিনা। রাফিকে শাস্তি ধাকতে বলল। বুদ্ধিমান কুকুর সে। দারুণ অভিনয় করল।

খুশি হলো টমাস। দিনের শেষে ওদেরকে বলল, ‘খুব ভাল কাজ দেখিয়েছ তোমরা। এতটা আশা করিনি। থ্যাঙ্কস।’

ঠিক এই সময় গটগটি করে এসে স্টুডিওতে চুকলেন একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। সবার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, ‘আমাকে আপনারা চিনবেন না। আমার নাম জনাধন ইচ্চ বিয়াঙা। জনি বিয়াঙা বলেই চেনে লোকে।’

সবার চোখই বড় বড় হয়ে গেল। অভিনেতা, টেকনিশিয়ান, পরিচালক, স্বার। জনি বিয়াঙার নাম শনেছে। একজন আমেরিকান কোটিপতি। প্লাস্টিকের ব্যবনা করে কোটি কোটি ডলার কামিয়েছেন। কত টাকা আছে নিজেরও কোন ধারণা নেই। প্লাস্টিক কিং বলে চেনে তাঁকে লোকে। নিজের ইয়েট নিয়ে পৃথিবী অবশে বেরিয়েছেন। পত্রিকায় খবরটা পড়েছে কিশোর আর রবিন। সাউথবুর্নের জেটিতেই আছে এখন তাঁর জাহাজ। পুরো শহরে এখন এই কোটিপতিকে নিয়ে ড়েন। পত্রিকায় পত্রিকায় ছবি ছাপা হচ্ছে।

লম্বা সুর্দশ একজন মানুষ। মাথাভর্তি ঝৌকড়া খসর চুল। সবার দিকে তাকিয়ে আন্দেকবার বিমল হাসি হাসলেন।

কিশোরের গায়ে কনুইয়ের প্রত্তো দিল মুসা। প্রায় কিসকিস করে বলল, ‘এই লোক এখানে কেন?’

যেন তার কথার জবাবেই ফ্রেক্টি করে প্লাস্টিক কিডের দিকে তাকিয়ে বিনোদ সুরে কলল টমাস, ‘স্টুডিওতে পাঁচ চলছে, স্ন্যার। বাইরের লোকের ঢোকা বারু।’

‘সনি, এভাবে ঢোকা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল। আপনি নিয়ে মিস্টার হেলির টমাস?’

‘হ্যা। আমাকে আপনার কি দরকার?’

‘টেলিভিশন আমার খুব প্রিয়। এতে যারা কাজ করে তাদের প্রতি বিরাট কৌতুহল আমার, প্রচুর আগ্রহ। টেলিনটা দেখতে চুকেছিলাম। একজন বলল, এখানে একটা ছবির পাঁচ হচ্ছে। সত্যি ঘটনার ওপর ডিপ্পি করে। না এসে আর ধাকতে পারলাম না। আপনাদের নামধার্ম সব জেনে এসেছি।’

কিছুটা নরম হলো টমাস। ‘ও। কিন্তু দেরি করে ফেলেছেন। শেষ করে ফেলেছি আমরা। আন্দেকটু আগে এলে পাঁচ দেখতে পারতেন। তবে অভিনেতারা

সবাই আছে এখনও।'

সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল টমাস। কিশোর অভিনেতাদেরও ছোট করে দেখলেন না মিস্টার বিয়াগা। হেসে হাত মেলালেন। এটা ওটা জিজেস করলেন। নিচয় কোতুহল মেটানোর জন্যেই।

'আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি জাগছে,' প্লাস্টিক কিং বললেন। 'একটা অনুরোধ আছে। রাখবেন?'

সন্দেহ দেখা দিল টমাসের চোখে। এসব বড়লোকদের সে দেখতে পারে না। টাকার জোরে সব কিছুই কিনে নেয়ার চেষ্টা করে। তবে অনুরোধটা কি জানার পর সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

বিয়াগা বললেন, 'কাল সফ্যায় আমার ইয়েটে পার্টি দিচ্ছি। জাহাজটার নাম ফ্রাইং অ্যাঞ্জেল। এখানকার বন্দরেই আছে। আপনাদেরও দাওয়াত। এলে খুব খুশি হব।' ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরাও আসবে। কুকুরটাও আসতে পারে, বাধা নেই।'

একা কথা দিতে পারল না টমাস। সবার সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হলো। কারণই অতি নেই। অনুমতির জন্যে হোটেলে বাবাকে টেলিফোন করল জিন। প্রথমে তিনি রাজি হতে চাইলেন না। কারু অপরিচিত জায়গায় যেতে চাইছে ওরা। কিন্তু চাপাচাপি শুরু করল সে। অগত্যা ঠাঁকে রাজি হতেই হলো। তবে কথা দিতে হলো, খুব সাবধানে থাকবে।

সন্দেহ খাটিতে এরপর বিয়াগাকে সৃষ্টিওটা ঘুরিয়ে দেখাতে বিয়ে চলল টমাস।

প্রাদিনও খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল ছেলেমেয়েদের। ওরা সাউথবুর্নে বেশি দিন থাকছে না। এর মধ্যেই ছবিটা শেষ করতে হবে। কাজেই প্রচুর কাজ। খুব সরালে সৃষ্টিওতে চলে এস ওরা। কয়েকটা সূশের শেষ নেয়া হলো।

পেশাদার অভিনেতাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে খাতির হয়ে পেছে ওদের। বিকেল ছয়টায় শুটিং শেষ হলে তাড়াপড়া করে হোটেলে চলল ওরা পোশাক বদলে নেয়ার জন্যে। পরনে যা আছে তা নিয়ে পার্টিতে যাওয়া যায় না।

কাপড় বদলে তৈরি হয়ে রাইল ওরা। কথামত হোটেল থেকে ওদেরকে তুলে নিল টমাস। বন্দবে যাওয়ার পথের শেষ মোড়টা ঘূরতেই ইয়েটা চোখে পড়ল। আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। নানা রঙের আগুন লেপেছে যেন ওটাতে, যনে হচ্ছে জলছে। গ্যাঙ্গেলিওটা ও উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। ব্যাও পার্টির বাজানো হালকা শিউজিকের শব্দ শোনা যাচ্ছে দূর থেকেও।

পার্টি দেয়া হচ্ছে বটে একটা!

তিনি

চওড়া হাসি নিয়ে অভিধিদের স্বাগত জানালেন মিস্টার বিয়াগা। সাউথবুর্নের অনেক সম্মানিত শ্রেষ্ঠমান ভত্তক্ষণে পৌঁছে গেছেন জাহাজে।

ট্যাস আর গোয়েন্দাদেরকে সাদুর অভ্যর্থনা জানালেন তিনি, ‘আরে আসুন, আসুন। কথা তাহলে রেখেছেন। খুব খুশি হলাম।’

আরও পাঁচ মিনিট পর এল রোজার ও জুন। তাদের পর পরই হাজির হলো রোজারের ভাই ডক আর অন্যান্য অভিনেতারা। জমতে শুরু করেছে পার্টি। সাদা রঙের ওপর সোনালি কাঞ্জ করা বড় বড় স্যালুনগুলোয় লোক গিজগিজ করছে।

মুসার নজর বুকে টেবিলটার ওপর। গাদা গাদা খাবার। চিকেন প্যাটিস, স্যামন স্যাউইচ, জেলি, আইসক্রীম ও আরও নানা রকম লোভনীয় খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ওগুলোর ওপর শিশে ঝাপিয়ে পঢ়ার জন্যে যেন আর তর সইছে না তার। রাফিকে এখানে আনা হয়নি। অনেক ধরনের লোক। কে কুকুর পছন্দ করে, কে করে না, জানা নেই। যারা করে না তাদেরকে শুধু শুধু বিরত করতে চায়নি জিন। তাই ডেকেই রেখে এসেছে। ইয়া বড় একটা হাড় এনে দিয়েছে জাহাজের বাবুটি। স্টো নিয়ে মেতে আছে এখন রাফি।

সব চেয়ে বড় স্যালুনটায় কয়েক জোড়া দম্পত্তি নাচছে। দেখতে ভালই লাগছে ছেলেমেয়েদের। বেশ উপভোগ করছে। সময় যে কোথা দিয়ে উড়ে গেল টেরই পেল না। রাত একটার দিকে হাই তুলতে তুলতে রবিন বলল, ‘কিশোর, আমার ঘূম পাচ্ছে। চলো, হোটেলে।’

‘আরেকটু ধাকি,’ কিশোর বলল। ‘ট্যামের সঙ্গে একসাথেই যাই আমাদের পৌছে দেবে বলেছে।’

‘কিন্তু ওর তো কোন দিকেই খেয়াল নেই। খুব শোজে আছে,’ জিনা বলল।

‘আনন্দ করছে কফক। একটু দেরি করেই যাই আমরা। ফেলে যাওয়াটা ভাল দেখায় না।’

পার্টি শেষ হলো। শুভবাই জানিয়ে বিদায় নিতে শুরু করল মেহমানরা। এক এক করে সবাই চলে গেল। বাকি ইল কেবল ট্যামস, জুন আর গোয়েন্দারা।

‘জুন, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?’ ট্যামস জিজেস করল।

‘আমি বলব, না। আমি রোজারের জন্যে বসে আছি। হোটেলে নামিয়ে দেবে বলেছে। কিন্তু বহুক্ষণ খেকেই তাকে দেখছি না। পাতাই নেই। আমাকে বলে গেল, এক মিনিট, আসছি। গেল তো গেলই। চিন্তাই লাগছে আমার। ও তো এবকম করে না।’

শৰ্মীর খারাপ লাগছিল হয়তো। মাথায় পানিটানি দিতে গেছে। দাঁড়াও, বাথরুমে দেখে আসি।’

মিস্টার বিয়াতাকে জিজেস করে বাথরুম কোনাদিকে জেনে নিল ট্যামস। সেদিকে এগোল।

কিরে এল খানিক পরেই। জানাল, ‘কই, নেই তো।’

উহেন আর চেপে রাখতে পারল না জুন। ‘গেল কোথায়?’

স্বার মনেই এই প্রশ্ন।

‘আহাজ থেকে নেবে যাইনি তো?’ মিস্টার বিয়াতাকেও চিন্তিত দেখাচ্ছে। তাঁর আহাজে কোন অবস্থা চান না তিনি।

মাথা খাঁকাল জুন। 'আমি বলব, আমাকে না বলে নে যাবে না। একা ফেলে
তো কিছুতেই নয়। বলে গেছে এক মিনিটের মধ্যেই আসবে। তাতেই বোধা যায়
নেমে যায়নি।'

'আর্থ্য!' বিড়বিড় করল ট্যাস।

তৃঢ়ি বাজাল জিনা, 'তাবনা নেই। রাখি আমাদের সাহায্য করবে। জুন,
আপনার হাতে ওটা রোজারের রুমাল না? দিন, আমার হাতে।'

রুমালটা নিয়ে রাফির নাকের সামনে ধরল জিন। নির্দেশ দিল, 'ভাল করে
শোক। তারপর খুঁজে বের কর।'

কিন্তু স্যালুনে গঙ্কের ছড়াহাড়ি। নানা রকম মেকআপ আর সেটের তীব্র গঙ্কের
মধ্যে থেকে একটা বিশেষ গঙ্ক আলাদা করে চিনতে পারল না সে। নিজেরাই তখন
অভিনেতাকে খোজার সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

ট্যাস আর জুন চলল গোয়েন্দাদের সঙ্গে। তাদেরকে সাহায্য করল
জাহাজের কয়েকজন ত্রু। অনেক খোজাখুজি করেও পাওয়া গেল না রোজারকে।
যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। তার সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারল না। এত ভিড়
আর ব্যস্ততার মধ্যে কে কোন দিকে গেছে সেটা খেয়াল রাখা সত্ত্বও নয়।

জুনের মতই ঘাবড়ে গেল ট্যাস। তবে সেটা চেপে রেখে বলল, 'হয়তো
কোন কারণে তীরে নেমেছিল। জুন যে জাহাজেই রয়েছে সেটা ভুলে গিয়ে চলে
গেছে।'

'এটা একেবারেই অসম্ভব।' নিচের ঠোটে চিমটি কাটল কিশোর। 'বাগদানকে
সঙ্গে নিয়ে এসে তাকে ভুলে ফেলে রেখে চলে যাবে, মাথা খারাপ না হয়ে গেলে
এমন কাজ কোন পুরুষমানুষ করবে না।'

মুখ কালো হয়ে গেছে মিষ্টার বিয়াঙ্গার। তাঁর জাহাজে দাওয়াতে এসে একজন
মেহমানের খারাপ কিছু ঘটে গেছে তেবে উৎকষ্টিত হয়ে পড়লেন তিনি। বিভিন্ন
আয়গায় কোন শক্ত করলেন। তারপর হতাশ ভাবিতে মাথা নাড়তে নাড়তে
কললেন, 'নাহ, হোটেলে যাবানি। হাসপাতালেও নেই।'

ঘাবড়ে যে গেছে সেটা আর চেপে রাখার চেষ্টা করল না ট্যাস। 'আর দেরি
করা যায় না। পুলিশকে অবৰ দিতে হবে।'

স্বাই উঞ্জি হয়ে পড়েছে। কেউ অন্য কোন পরামর্শ দিতে পারল না।

এত ঝাতেও কোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা মিনিট দেরি করল না পুলিশ।
বড় তাড়াতাড়ি পাইল ইঝটে ছাঁজির হয়ে গেল। হাজার হাতক জনাবদ বিয়াঙ্গার মত
একজন বিদেশী মেহমান সাহায্য চেয়েছেন। চুলি হয়েই এল তারা।

পুলিশও অনেক ঝুঁজল। কিন্তু রোজার মরাভিসকে সেল না।

কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে জুনের চেহারা। বুঝিরে-ভনিয়ে তাকে হোটেলে
নিয়ে চলল গোয়েন্দারা। আহাজ থেকে নেমে কেঁদেই কেলল বেচারি।

হোটেলে ফিরে শুমাতে শাওয়ায় আগে স্বাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে
দাগল গোয়েন্দারা।

'কালকের আগে ঠিকভাবে তদন্ত করবে না পুলিশ,' আনন্দনে ধলন

কিশোর, যেন নিজেকেই শোনাল কথাটা। ‘ততক্ষণে রোজারের খারাপ কিছু না হয়ে যায়।’

‘কি খারাপের কথা বলছ?’ জানতে চাইল মূসা।

‘বুঝতে পারছি না।’

তবে একটা কথা ঠিকই বুঝতে পারছে কিশোর, আরেকটা রহস্য এসে হাজির হয়েছে। এতে ওদের নাক গলাতেই হবে। কারণ ওদের একজন বন্ধু নিখোজ হয়েছে।

পরদিন তদন্ত শুরু করল পুলিশ। কিন্তু ফল হলো শূন্য। কিছুই বের করতে পারল না তারা। তদন্ত কমিটির ইনচার্জ ইলপেষ্টের স্থিতের ধারণা, ইচ্ছে করেই উধাও হয়েছে রোজার। অঙ্গো একধরনের স্টার্টবাজি। অনেকেই করে এরকম, বিশেষ করে অভিনেতা এবং লেখকেরা। করে লোকের চোখে পড়ার জন্যে, বিখ্যাত হওয়ার জন্যে। অভিনেতারা হঠাতে করে গায়ের হয়ে যায়, কিংবা উদ্ভট কিছু করে বসে। লেখকেরা চলে যায় কোন নির্জন দ্বীপে, কিংবা পাহাড়ে। বলে শাস্তিতে লেখার জন্যে গেলাম। এমন একটা ভঙ্গি, যেন ঘরের অশাস্তিতে লেখা আটকে গেছে। এসব করলে তারা পত্রিকার হেডিং হয়, অভিনেতার ছবির টিকিট বিক্রি হয় বেশি, লেখকের বিক্রি হয় বই। বিখ্যাত গোয়েন্দা গল্প লেখক আগাধা ক্রিস্টি ও একবার এরকম স্টার্ট করে বিজ্ঞাপন করেছিলেন। হঠাতে করে গায়ের হয়ে গিয়েছিলেন একদিন। পরে আবার ফিরেও এসেছিলেন।

যাই হোক, রোজারের ব্যাপারে একথা মেনে নিতে পারল না দলের অন্যান্য অভিনেতা, ট্যামস এবং কিশোর গোয়েন্দারা।

‘আপনি ভুল করছেন, ইলপেষ্টের,’ ট্যামস বলল। ‘রোজার এমন কাজ করবে না।’

তার সঙ্গে সুর মেলাল জুন, ‘আমি বলব, হেনরি ঠিকই বলেছে। এমনিতেই যথেষ্ট বিখ্যাত রোজার। বিজ্ঞাপনের জন্যে ওরকম কিছু করার দরকার নেই। আর করলে আমি অন্তত জানতাম। আমাকে দৃষ্টিভায় ফেলত না।’

ছবির কাজ শুরু হয়ে গেছে। এখন আর সেটাকে বন্ধ করা ঠিক হবে না। তাই আর রোজারের মতই দেখতে আরেকজন অভিনেতা জোগাড় করে শুটিং চালিয়ে গেল ট্যামস। কিন্তু সাধ্যমত চেষ্টা করেও জমাতে পারল না আর কোন অভিনেতাই। গোড়ায় গলদ হয়ে গেলে যা হয় তাই হলো। তাছাড়া ছবির নায়িকাই খাকে মনময়া হয়ে। কি করে অন্যদের অভিনয় ভাল হবে?

জুনকে পরামর্শ দিল গোয়েন্দারা, সে যে হোটেল আছে সেটা ছেড়ে এসে তাদের হোটেলে উঠতে। তাহলে সব সময় কাছাকাছি থাকতে পারবে। একা একা লাগবে না আর। কথাটা পছন্দ হলো জুনের। সেদিনই সন্ধ্যায় হোটেল বদল করল।

‘তনুন,’ তাকে সান্তুন দিয়ে বলল কিশোর, ‘অত ভাবনার কিছু নেই। আমরা গোয়েন্দা। নিখোজ হয়ে যাওয়া অনেককে খুঁজে বের করেছি। আরও একজনকে পারব। পুলিশ পারব আর না পারব, আমরা পারবই।’

তার এই আস্ত্রবিপ্লাস দেখে অনেকটা বল পেল জুন। মনিন হাসি হেসে বলল,

‘ভুলেই শিয়েছিলাম তোমরা তিম গোয়েন্দা। তোমাদের অনেক নাম শনেছি। আমার ভাগ ভাল, তোমাদের সামনেই ঘটেছে ঘটনাটা।’

‘আমরা আপনাকে সাহায্য করব!’ কথা দিল গোয়েন্দাৰা।

দেখতে দেখতে একটা প্লান কৰে ফেলল কিশোৱ। কি কৰতে চায় জানাল জুনকে। আবার যাবে ফ্লাইৎ অ্যাঞ্জেল। মিস্টাৰ বিয়াও আৱ কূদেৱ ভাল কৰে আৱেকৰাৰ জিজ্ঞাসাবাদ কৰবে। আৱও একবাৰ ডল্লাপি চালাবে ইয়েটে।

প্লানটা জুনেৱও পছন্দ হলো। না হলেও কিছু বলত না। তিন গোয়েন্দাৰ ওপৱ কথা বলত না। জিনার আৰু-আস্মা হোটেলে নেই। বিজ্ঞানীদেৱ একটা পার্টি দেয়া হচ্ছে, সেখানে গৈছেন। কাজেই অনুমতি নেয়াৰ প্ৰয়োজন পড়ল না। খাওয়া শেষ কৰেই জুনকে নিয়ে বেয়িয়ে পড়ল গোয়েন্দাৰা। ট্যাঙ্কি নিয়ে চলে এল বলৱে।

সেদিনও পার্টি চলছে জাহাজে। আৱেকটা বড় পার্টি দিছেন প্লাস্টিক কিং। গ্যাঙ্গপ্ল্যাকেৱ গোড়ায় ডিউটি দিছে একজন নাৰিক। সে বাধা দিল। নিমন্ত্ৰণপত্ৰ ছাড়া ওদেৱকে চুকতে দিল না। মনিবেৱ কড়া নিৰ্দেশ আছে।

নাৰিকেৱ কাছে শিয়ে হেসে বলল জন, ‘আমৰা চুকলে কিছু বলবেন না, মিস্টাৰ বিয়াও। আমাৰ নাম জুন মৱিস। কিম্বা স্টাৰ। আপনি একটু যোগাযোগ কৰুন তাৰ সঙ্গে। তাৰেই বুৰাবেন।’

বিন্দুয়াত্ৰ নৱম হলো না নাৰিক। ‘সৱি, মিস, এখান থেকে না নড়াৰ হকুম আছে আমাৰ ওপৱ। কিছু মনে কৰবে না। চাকুৱি কৰি তো।’

‘দেখুন,’ বোৰাহোৱ চেষ্টা কৰল জুন, ‘আমাৰ কথা বললে কিছু বলবেন না আপনাকে মিস্টাৰ বিয়াও...’

তাৰ হাতে হাত রেখে বাধা দিল জিনা। জাহাজেৱ ডেকে দেখতে পেয়েছে লহু মানষিকে। হাত নেড়ে জোৱে জোৱে ডাকতে শুক কৱল, ‘মিস্টাৰ বিয়াও, মিস্টাৰ বিয়াও!'

কিছু না বোৰেই তাৰ সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঘট ঘট কৰে উঠল রাফি।

ব্যাও পার্টিৰ মিউজিকেৱ শব্দকে ছাড়িয়ে গেল সে চিৎকাৱ। কিৱে তাকালেন বিয়াও। এগিয়ে এসে বুঁকলেন রেলিঙেৱ ওপৱ দিয়ে।

ততক্ষণে মহাখাণ্ডা হয়ে উঠেছে নাৰিক। জিনার কাঁধ চেপে ধৰে জোৱে যাকি দিয়ে বলল। ‘চুপ! চুপ! এখানে এসব গলবাজি চলবে না...’

রাফিৰ সামনে জিনার গায়ে হাত দিয়েছে একটা বিশ্বি লোক, সে কি আৱ সহজ কৰে। বিকট ঘাউ কৰে উঠে তাৰ ওপৱ লাফিয়ে পড়তে গেল।

তাক্তাতাক্তি তাকে ধৰে ফেলল জিনা। নাৰিককে শাসিয়ে বলল, ‘খৰবদার, আৱ কিছু কৱাৰ চেষ্টা কৰবেন না। এইবাৰ আৱ আটকাৰ না কুকুৰটাকে।’

ওদিতে শার্টেৱ হাতা শার্টৰে ফেলেছে মুসা। মারমুখো হয়ে এগোল এককদম। ভাক ধৰে ফেলল কিশোৱ।

নাৰিন তাকিয়ে আছে মিস্টাৰ বিয়াওৰ দিকে।

‘হচ্ছেটা কি এখানে?’ কড়া গলায় জিজ্ঞেস কৱলেন তিনি।

মুখ তুলে তাকাল নাৰিক। সে জবাৰ দেয়াৰ আগেই জুন বলল, ‘মিস্টাৰ

বিয়াতা, আমি। জুন মহিস। কত করে বললাম আপমার কথা, তা-ও চুক্তে দিছে না। আপমার সঙ্গে কথা আছে।

বিয়াতাকে খুশি মনে হলো না। অনেক সমানিত মেহমান রয়েছেন জাহাঙ্গে। তাঁদেরকে ফেলে এখন কথা বলার সময় নেই তাঁর।

‘খীরা করলেন কয়েক সেকেণ্ট। তারপর আধা নেড়ে বললেন, ‘বেশ, আসুন।’

জুনের পেছনে ছেলেমেয়েদেরও এগোতে দেখে হাত নাড়লেন, ‘না না, তোমাদের আসার দরকার নেই। জারগা মেই এখন জাহাঙ্গে। নগরের কয়েকজন বড় বড় ব্যবসায়ীকে দাওয়াত করেছি। এটো আমাদের প্রাইভেট পার্ট। বাইরের কাউকে এলাউ করতে পারছি না।’

মৃত্ত গাঙ্গেয়াক বেয়ে উঠে গেল জুন। খিরে তাকিয়ে একবার হাত নাড়ল গোয়েন্দাদের দিকে। তারপর চলে গেল মিস্টার বিয়াতার সঙ্গে।

অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দারা।

চার

‘খাইছে! আজ আমাদের খাতির গেল কই? পাতাই তো দিল না!’ মুসা বলল, ‘যেন চেনেই না!'

‘হ্যা, সেদিনের আচরণের সঙ্গে মেলে না,’ একমত হলো রবিন।

‘বড়লোকি ঢঙ আরকি,’ জিনার রাগ এখনও যায়নি। ‘একটা খায়েশ হয়েছিল, প্রুণ করেছে। আর দরকার নেই।’

কিশোর কিছু বলছে না। তাকিয়ে রয়েছে জুন যেদিকে গেছে সেদিকে। বুঝতে পারছে, জাহাঙ্গে উঠে ভাল করে আরেকবার তদন্ত করার আশা নেই আর। জুন কি কিছু করতে পারবে? নাহ, পারবে বলে মনে হয় না। ওদেরও আর কিছু করার নেই, অপেক্ষা করা ছাড়া। নাবিকের চোখে শূন্য দৃষ্টি। তার সঙ্গে কথাই বলা যাবে না।

টেনে টেনে চলছে যেন সময়। অঙ্গির হয়ে উঠেছে ওরা। অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল মুসা, ‘হলো কি? একক্ষণ কি করছে জুন?’

‘কথা বলছি ইয়তো জাহাঙ্গের লোকের সঙ্গে,’ রবিন বলল।

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, ‘উই। ওই কাজ ওকে দিয়ে হবে না। আমরা যেতে পারলো...’

বাথা পাঞ্জল কথায়। গ্যাঙ্গেয়াক বেয়ে নেমে আসছে আরেকজন নাবিক। এদিক ওদিক তাকিয়ে ছেলেমেয়েদের চোখে পড়তে এগিয়ে এল।

‘তোমরাই তিম গৈগার্ফলা?’

‘হ্যা,’ অবাব দিল কিশোর। ‘কেন?’

‘মিস মারিস একটা মেসেজ দিয়েছে। বলেছে, তার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই। তোমরা হোটেলে চলে যাও। পরে দেখা করবে সে। এই টাকটা দিল। তোমাদের ট্যাঙ্গি ভাড়া।’

কিশোরের হাতে কয়েকটা নোট ধরিয়ে দিয়ে তাড়াহড়া করে চলে গেল

লোকটা, গোয়েন্দাদেরকে আরেকবার অবাক করে রেখে।

‘বাহ, চমৎকার,’ তিক্ত কষ্টে বলল জিনা, ‘আমাদেরকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে এখন ট্যাঙ্গি ভাড়া দিয়ে বিদায় দেয়। আর দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলো ফিরে যাই।’

‘বঙ্গ হতাশ করল,’ জোরে নিঃশ্঵াস ফেলল মুনো। ‘মিস্টার বিয়াওকে বলে আমাদের নেয়ার ব্যবস্থা করতে পারত।’

‘হয়তো পার্টি দেখে মজে গেছে,’ মেজাজ সেই যে খারাপ হয়েছে জিনার, আর ভাল হচ্ছে না। ‘এখনের মেয়েমানুষগুলোর এই তো দোষ। সহজেই সব কিছু তুলে যায়। চাকচিক্য দেখলে আর হঁশ থাকে না।’

‘আমার মনে হয় খামোকাই দোষ দিছে,’ প্রতিবাদ করল রবিন। ‘জুনকে কিন্তু সে রকম মেয়ে মনে হয় না। রোজার নির্ধোঁজ। এ সময় সে আর যাই করুক, আনন্দ করার জন্যে পার্টিতে যোগ দেবে না।’

রেগে উঠে আরেকটা জবাব দিতে যাচ্ছিল জিনা, বাধা দিল কিশোর, ‘এখানে দাঁড়িয়ে নিজেরা নিজেরা বাগড়া করার কোন অর্থ হয় না। আর কিছু করার নেই এখন। চলো, হোটেলে।’

হোটেলে ফিরেও জুনের অপেক্ষায় অঙ্গু হয়ে রাইল ওরা। কখন ফেরে, কি খবর নিয়ে আসে জানার জন্যে। এমন কোন তথ্য কি দিতে পারবেন মিস্টার বিয়াও? যাতে তদন্তের সুবিধে হয়? কোন সুব?

এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। তারপর বাজল টেলিফোন।

লাফ দিয়ে উঠে গেল কিশোর। ছো মেরে তুলে নিল রিসিভার। ‘হালো?’

ওপাশ থেকে শোনা গেল হোটেলের পোর্টারের কষ্ট, ‘কিশোর পাশাকে চাই। মিস মরিস ফোন করেছেন।’

রিসিভারে হাত ঢাপা দিয়ে সহকারীদের জানাল কিশোর, ‘জুন! হাত সারিয়ে বলল, ‘জুন? আমি, কিশোর? কি ব্যাপার? এত দেরি? কিছু পেলেন?...হায় হায়, কিছু না? তাহলে এতক্ষণ...’

চুপচাপ ওপাশের কথা শুনল সে। অনেকক্ষণ পর নামিয়ে রাখল রিসিভার। চিন্তার ছাপ পড়েছে মুখে। সবাইকে জানাল, ‘একটা কাফে থেকে ফোন করেছিল। বলল, আসতে আরও দেরি হবে। ধানায় যাচ্ছে। জাহাজ থেকে নামতেই তার মনে হয়েছে কেউ তাকে ফলো করছে। একটা ট্যাঙ্গি নিয়ে রওনা হয়েছিল। দেখে, আরেকটা ট্যাঙ্গিতে করে দুজন লোক পিছু নিয়েছে তার। সেটা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে একটা কাফের সামনে গাড়ি ধারিয়ে ফোন করেছে আমাদের। সোজা ধানায় যাবে, যাতে পুলিশকে বলে লোকগুলোকে ধরতে পাবে। তার ধারণা, রোজারকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। লোকগুলো তাতে জড়িত। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলল না। ইঠাং লাইন কেটে দিল।’

শিস দিয়ে উঠল মুনো। ‘বাইছে! জমে উঠছে কাহিনী।’

‘হ্যা। তবে জুনের কথাবার্তা সন্দেহজনক মনে হয়েছে আমার। বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। তার কাছে এতটা আশা করিনি।’

‘এতে বাড়াবাড়ির কি দেখলে?’ রোজারকে কিডন্যাপ করেছে। এখন জুনের পিছে লেগে টাকা আদায়ের চেষ্টা করবে।

‘হ্যাঁ, হতেই পারে,’ মাথা দোলাল জিনা।

চেষ্টের কাছে একটা আঙুল নিয়ে শিয়েই সরিয়ে আনল কিশোর। ‘এভাবে বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না আমার। কিছু একটা করা দরকার।’

‘কি করবে?’

জবাব দেয়ার অবস্থায় নেই গোয়েন্দাপ্রধান। মৃহূর্তে ঝুবে গেছে গভীর চিন্তায়। আপনমনেই বিড়বিড় করল, ‘আমি বলব...’

‘কি বলবে?’ বাধা দিল রবিন, ‘তোমাকেও আমি বলব রোগে ধরল নাকি?’

‘উঁ?’ আত্মে মাথা ঘাড়া দিল কিশোর। ‘আপাতত তো করার কিছু দেখছি না। হলরুমে শিয়ে জুনের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া।’

নিচতলায় নেমে এল সবাই। পুরু গদিমোড়া আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসল; বসে থাকতে থাকতে কখন যে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়ল বলতে পারবে না। ডেকে তুললেন পারকার আংকেল আর কেরিআন্ট। পার্টি থেকে ফিরে হলে চুকেই চোখ পড়েছে ছেলেমেয়েদের ওপর।

মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। পোর্টারের কাছে জানা গেল, তখনও ফেরেনি জুন। শক্তি হলো কিশোর। খবরটা জানাল মিস্টার পারকারকে।

‘হ্যাঁ, চিন্তার কথা। পুলিশকে জানানো দরকার,’ বলতে বলতে ফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

কিন্তু পুলিশ কিছু জানাতে পারল না। ধানায় যাইহৈনি জুন। তবে কি সে-ও রোজারের মতই নিষ্ঠোজ হয়ে গেল? নিয়ম তাই হয়েছে। নইলে যাবে কোথায়? কাকে থেকে বেরিয়ে ধানায় যাওয়ার পথেই কোন্ধান থেকে উধাও হয়েছে।

‘কোথাও হয়তো দেরি করছে,’ পারকার বললেন।

‘কেন করবে?’ কিশোরের প্রশ্ন। ‘কোন কারণ তো দেখি না। ওই লোকগুলোরই কাজ। তাকে ধরে নিয়ে গেছে। রোজারকেও ওরাই কিডন্যাপ করেছে।’

সে রাতে ফিরল না জুন। পরদিন সকালেও না। তার নিষ্ঠোজ সংবাদ জানানো হলো পুলিশকে। তাদের খৌজাখুজির তালিকায় আরেকটা নামই কেবল বাড়ল, কোন লাভ হলো না। বের করতে পারল না কিছু।

মূরড়ে পড়ল টমাস। একজন অভিনেতা গেছে, কোনমতে জোগাড় করেছে আরেকজন। এখন অভিনেত্রীও গায়েব। তবে এর পরেও দমল না। জেদ করেছে, যত যা-ই ঘটুক, ছবি শেষ করবেই। শুটিং চালিয়ে গেল। তবে যে যে দৃশ্যে জুনের অভিনয় করার কথা, সেগুলো বাদ দিয়ে। আরেকজন অভিনেত্রী জোগাড় করার আগে আর সেগুলো সত্ত্ব হবে না।

‘পুলিশ ঠিকই খুঁজে বের করবে,’ আশা ছাড়তে পারল না টমাস। ‘দু-একদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে।’

কিন্তু তার আশা সিরিশায় পরিষ্কত হলো। কোন খৌজই পেল না পুলিশ। যে ট্যাক্সিতে করে থামায় যাচ্ছিল জুন, সেটারও কোম হদিস বের করতে পীরল মা। শেষে রেজিওতে ঘোষণা করে অনুরোধ জামাল, ট্যাক্সি ড্রাইভার যেন এসে যোগাযোগ করে।

তাতেও ফল হলো না। কেউ এস মা পুলিশের কাছে।

সেদিন সকাল বেলা একদফা শুটিং হয়ে গেছে। তারপর বসে আলোচনা করতে লাগল রোজার আর জুনের নিরবন্দেশ নিয়ে। টমাসের মতই ওদেরও মন খারাপ।

‘এখন আর কোন সন্দেহ নেই আমার,’ কিশোর বলল, ‘জুনকেও কিডন্যাপ করা হয়েছে।’

‘কেম কৱল?’ রবিনের জিজ্ঞাসা।

‘আর কেন? টাকার জন্যে? জবাব দিয়ে দিল মুনা।

‘তাহলে এতদিনেও টাকা চেয়ে পাঠাল না কেন?’ ডুরু নাচাল জিনা।

‘আমি কি ভাবছি জানো?’ চারজোড়া আগুই চোখের দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, ‘রোজারকে কিডন্যাপ করার পেছনে অন্য কোন কারণ আছে। সেটা বোধহয় আঁচ করে ফেলেছিল জুন, তাই তাকেও গাপ করে দেয়া হয়েছে। তা করক, আপত্তি নেই। মেরে না ফেললেই হলো,’ রহস্যটা জমাট বাধছে বলে যেন মজাই পাচ্ছে কিশোর। ‘এবার মনে হচ্ছে সিরিয়াসলি তদন্তে নামা উচিত আমাদের।’

পাঁচ

সেদিন বিকেলে থামায় রওনা হলো ওরা, ইস্পেষ্টার স্থিতের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। জুনের নির্বোজের ব্যাপারে একটা বিবৃতি সই করতে হবে।

মন দিয়ে ওদের কথা তলেন ইস্পেষ্টার। বিবৃতি লেখা হলো। তিন গোয়েন্দার পক্ষ থেকে সই করে দিল কিশোর। ইস্পেষ্টারকে কয়েকটা প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়ে গেল।

‘জুন খুব ভাল,’ বেশ কামলা করে কথা উক্ত করল সে। ‘তার খারাপ কিছু ঘটে যাবে একথা তাবতেই পারি না। যতদূর বোঝা গেল, সব শেষে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে দুই জন লোকের। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার, আরেকজন মিস্টার জনি বিয়াও। আচ্ছা, জাহাজ থেকে জুন যখন নেমে গেল, তখন কি এমন কিছু চোখে পড়েছে মিস্টার বিয়াওর, যেটা সন্দেহজনক? বলেছে কিছু আপনাকে?’

হাসলেন ইস্পেষ্টার। পত্রিকার কল্পাণে তিন গোয়েন্দা এবং তাদের কাজকর্মের কথা তাঁরও অজানা নয়। প্রশ্নগুলো কেবল করছে কিশোর বুকে ফেললেন। এখানেও তাদের উদ্দেশ্য চালাচ্ছে। তা চালাক, অসবিধে নেই। পুলিশের কাজে নাক না গলালে আর নিজেদের বিপদে না ফেলে দিলেই হলো।

‘তোমাদের আগেই এসে বয়ান দিয়ে গেছেন মিস্টার বিয়াও,’ জানালেন

ইসপেষ্টর। 'ডাকতে হয়নি। সিজেই এসেছিলেন থানায়।'

কোটিপতির সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সেটা টেপে রেকর্ড করে রেখেছেন। টেপটা চালিয়ে দিলেন ইসপেষ্টর।

'মিস মরিসের এমন একটা বিপদ হয়ে গেল, সত্যি খুব খারাপ লাগছে আমার,'
বিয়াও বলছেন। 'রেডিওতে শুনলাম ব্যবরটা। বেচারি। কাল সন্ধ্যার দেখা করতে
গিয়েছিল আমার জাহাজে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল তার কয়েকজন কিশোর বক্সুকে।
তিনি গোরেমো। যদিও ছিল ওরা চারজন। একটা কুকুরও ছিল সঙ্গে। যাই হোক,
কাল সবাইকে জাহাজে উঠতে দিতে পারিনি। বোধাই হয়ে ছিল ইয়ট, এক তিল
জায়গা। ছিল না। মিস মরিস বলল আমার সঙ্গে নিরালায় কথা বলতে চায়। তাই
তাকে আমার স্টাডিতে নিয়ে গেলাম। তার প্রেমিকের নিরুদ্ধেশের ব্যাপারে
আমাকে জিজেস কর্বল। কোন কিছু মনে করতে পারছি কিনা জানতে চাইল।
আমার জাহাজে পার্টিতে গিয়েই উধাও হয়েছিল লোকটা। তার নাম বোজার
মরভিস, অভিনেতা, আপনি জানেন। ওই ঘটনাটার জন্যেও অস্তি বোধ করছি
আমি। আমার জাহাজে পার্টিতে গিয়েই নির্বোজ হয়েছে লোকটা। কেউ না
বললেও একটা দায়িত্ব বোধ করছি আমি। মনে হচ্ছে সাওয়াত দিয়েই অপরাধটা
করেছি। মিস মরিসকে নতুন কিছুই জানাতে পারলাম না। খুব মনে আছে স্যালুনে
তার সঙ্গে কথা বলার পর পরই বেরিয়ে গিয়েছিল মরভিস। তারপর আর তাকে
দেখিনি।'

'মিস মরিস অনেকক্ষণ ছিল আপনার সঙ্গে, মিস্টার বিয়াও?' ইসপেষ্টরের
প্রশ্ন।

'তা ছিল, ইসপেষ্টর। সত্যি কথাই বলি, তার থাকাতে আমি খুব অস্তি বোধ
করছিলাম। তার দিকে ভালমত নজর দিতে পারিনি বলে। অনেক মানবকে
দাওয়াত করেছিলাম, কি করব বলুন? মেয়েটার জন্যে আমার খারাপই লাগছিল।
মনমরা হয়ে ছিল। নতুন কিছু বলতে পারিনি, কোন সাহায্য করতে পারিনি। তবে
বুশি করার আন্তরিক চেষ্টা করেছি। সাজ্জা দিয়ে বলেছি, পুলিশ তার প্রেমিককে
শীঘ্ৰই খুঁজে বের করবে। তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে ট্যাঙ্কিতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা
করেছি। না, সম্মেহজনক কিছু নজরে পড়েনি। ইতে পারে, মেহমানদের কাছে
ফিরে যাওয়ার তাড়া ছিল বলে বৈয়াল করার সুযোগই পাইনি।'

মিস্টার বিয়াওর বিবৃতি থেকে কোন তথ্যই পাওয়া গেল না।

ইসপেষ্টরকে ধন্যবাদ জানিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল গোহেন্দারা। কোন
কাজই হয়নি। মুখ কালো করে ফিরে চলল সুডিওতে। সেদিন আরও একটা
দৃশ্যের কাজ থাকি। ডক নরম্যান আর রাফির একটা শট নেয়া হবে।

কাজ শেষ হলো। এখানে আর কিছু করার নেই। এতু সকাল সকাল ঘরে
ফিরতেও ইচ্ছে করল না। সৈকতে চলো ওরা। বসে খাদিক হাত-পা ছাঢ়িয়ে
নেবে।

'কি ভাবছ, কিশোর?' আচমকা প্রশ্ন করল মুসা।

'দুটো কথা একটু কর্ণে আমার মনে। এক, যে ট্যাঙ্কিতে করে গিয়েছিল ভূম,
তার ছাঁইভাব পুলিশের সঙ্গে দেখা করল না কেন? রেডিওতে বার বার অনুরোধ
অভিন্ন।

করা হয়েছে। তার কানে ন, যাওয়ার কথা নয়। সে নিচয় বুঝতে পারছে তার বিষ্ণুতি অনেকটা সাহায্য করবে পৃষ্ঠাশের কাজে।'

'হয়তো তাকেও কিডন্যাপ করা হয়েছে,' রবিন বলল।

'তাহলে জানা যেত। একজন ট্যাঙ্গি ড্রাইভার নিষেক হয়েছে, রিপোর্ট হত খানায়। ওর এই চৃপ্তাপ ধাকাটা অস্বাভাবিক লাগছে আমার কাছে।'

'আর দ্বিতীয় কথাটা?' জানতে চাইল জিনা।

'রবিন, জুনের ফোন পাওয়ার পর তুমি আমাকে ঠাট্টা করেছিলে, আমাকেও আমি বলব রোগে ধরেছে কিনা। আসলে রোগ নয়। ওই শব্দ দুটো নিয়েই তাৰছিলাম আমি।'

হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মূসা, 'ঠ্যালা সামলাও এখন। আরত করেছে ধীক ভাষা। আৱে বাবা একটু সহজ করে বলো না। বুঝি না তো কিছু।'

'সহজই। পুরো ব্যাপারটা শুনলেই বুবৰে। জুনের মুদ্রাদোষ হলো কথার উরুতে বলে আমি বলব। কিন্তু সেদিন ফোনে কথা বলার সময় প্রায় প্রতিটি বাক্যের শুরুতেই বলেছে আমি বলব।'

'এতে অবাক হওয়ার কি 'আছে? সাংঘাতিক উত্তেজিত ছিল সে তখন।'

'বেশি উত্তেজিত হলে তুমি কি করো? দ-একবার খাইছে, আল্লাহরে, এসব বলো। তোতলাও। সেসব চলে আসে স্বাভাবিক ভাবে। ইচ্ছে করে কোন কিছু বাব বাব বলতে যাও না।'

কপাল কুঁচকে গেল রবিনের। 'কি বলতে চাইছ তুমি, বলো তো কিশোর?'

'সেদিন ফোনে কথা বলার সময় বাব বাব আমি বলব, আমি বলব করেছে জুন। আংমার ধারণা, ইচ্ছে করেই করেছে।'

'কেন করবে?' জিনার প্রশ্ন।

'নিজেকে জুন বলে চালিয়ে দেয়ার জন্যে।'

বিশ্বায়ে অশ্বুট শব্দ করে উঠল বাকি তিনজনেই।

মূসা বলল, 'বলো কি? তার মানে...'

তাকে কথা শেষ করতে দিল না কিশোর, 'জুনের গ়ারা সঙ্গে মিল আছে বটে, তবে জুনের গলা ছিল কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।'

দুজন লোক এসে বসল ওদের কাছাকাছি। এখানে আর নিরাপদে আলোচনা করা যাবে না বুঝে উঠে এসে দূরে আরেকটা নির্জন জায়গায় বসল ওরা।

আগের কথার দ্রেই ধরে বলতে ধাকল কিশোর, 'পোর্টার বলল, মিস মারিস আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ফোনে শুনতে পেলাম একটা মহিলাকষ্ট, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "হালো, আমি বলছি, আমি জুন!" তখন মনে হলো জুনই বলছে। সন্দেহ করার কোন কারণ তখনও ঘটেনি। কিন্তু তারপর যতই ভাবার সময় পেলাম ততই শিওর হলাম ওটা জুনের গলা নয়।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ,' গলা কাঁপছে রবিনের, 'জুনের স্বর নকল করে কেউ আমাদের ফাঁকি দিতে চেয়েছে?'

'সে ব্রকমই তো মনে হচ্ছে এখন। ওই ফোনটা করার আগেই জুনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। মিস্টার বিয়াও যে ট্যাঙ্গিতে তুলে দিয়েছেন জুনকে, সেটা

কিডন্যাপারদের গাঢ়ি। এভাবে ভাবলে অনেক কিছু মিলে যায়।'

ঘূরে কিশোরের মুখোমুখি হলো মুসা, 'কিডন্যাপার! কিন্তু জুনকে কেন কিডন্যাপ করল? কি কারণ?'

'হট! হট!' করে গ্রাফিও যেন জিজেস করতে চাইল, হ্যাঁ, কি কারণ?

'ঠিক, কারণ তো একটা থাকতে হবে,' জিনাও বলল। 'টাকা চেয়ে পাঁচায়নি এখনও। তার মানে টাকার জন্যে করেনি।'

'কিসের জন্যে করেছে, তদন্ত করলেই সেটা বেরিয়ে পড়বে,' ওদের মত উত্তেজিত হলো না কিশোর, শাস্তকচ্ছে বলল। রোজার আর জুনকে আমরা খুঁজে বের করবই।'

'কি ভাবে?' প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করল তার দুই সহকারী।

'এখনও জানি না। সেদিন সন্ধ্যার ঘটনাটা গোড়া থেকে ভেবে দেখি আবার,' বলে এক মহুর্ত ধামল কিশোর। নাক চুলকাল। তারপর বলল, 'জুনের ওপর চোখ রেখেছিল কিডন্যাপাররা। তার সঙ্গে আমরা যখন বন্দরে দেলাম, ওরাও সঙ্গে সঙ্গে গেল। আমাদের মতই ওরাও জাহাজ থেকে তার নামার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। গাধার মত আমরা হোটেলে ফিরে গিয়ে ওদের কাজ সহজ করে দিলাম। তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যেতে আর কোন বাধাই পেল না ওরা। হোটেলে না গিয়ে আমরা যদি দাঁড়িয়ে থাকতাম, কোন না কোনভাবে তখন আমাদের সরানোর চেষ্টা করতাই কিডন্যাপাররা। কিংবা ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করত। সন্দেহ জাগত আমাদের। হয়তো জুনের নিষ্ঠোজ্ঞ হওয়া ঠেকাতে পারতাম।'

চুপ করে আছে সবাই। কিশোরের কথা উনহে।

আবার বলল সে, 'একটা ব্যাপারে জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে, যে ভাবেই ধরে নিয়ে যাওয়া হোক, জুন আর রোজার আছে এখন কিডন্যাপারদের খন্ডরে।'

'হ্,' মাঝা ঝাকাল বলিল, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু তাদেরকে উজ্জ্বার করছি কি ভাবে?'

'আগে জানতে হবে ওরা আছে কোথার। সেটা জানার জন্যে দলের অন্তর্ভুক্ত একজনকে চিনতে হবে আমাদের। যাদেরকে সন্দেহ হবে তাদের ওপর নজর গ্রাহণ করতে হবে।'

কাদেরকে সন্দেহ করা হবে, আলোচনা করে ঠিক করার পাশা এন্সের। একটা তালিকা করতে হবে।

'আমাদের প্রথম সন্দেহ হবে টেলিভিশনের লোকেরা,' মুসা বলল। 'জুন আর রোজারের ব্যাপারে তাদেরই বেশি জানার কথা। গোপন কিছু জেনে ফেললে আঘাতী হওয়ার কথা।'

'দূর,' হাত নাড়ল জিনা, 'আমার তা মনে হয় না। টেলিভিশনের কাকে সন্দেহ করব আমরা? সবার সঙ্গেই তো দেখলাম জুনের খুব ভাব। কাউকেই শক্ত মনে হলো না। তাহাড়া ডক তো রোজারের ভাইই।'

'বাইরে থেকে ভাল মনে হলোই যে ভাল হয়ে যাবে এটা ভাবার কোন কানুন নেই,' তর্ক করে বোধানোর চেষ্টা করল মুসা। 'কার মনে যে কি আছে কি করবে

বুঝব?

'মুসা ঠিকই বলেছে,' সমর্থন করল কিশোর। 'ভাল করে বুঝেও নে একজন একজন করে বাদ দিতে হবে সন্দেহের তালিকা ধৈকে। কাল ধৈকেই সন্দেহভাজনদের ওপর নজর রাখতে আরুণ করব। সাবধান থাকতে হবে আমাদের। কিছুতেই বুঝতে দেয়া চলবে না যে ওদের সন্দেহ করছি আমরা।'

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে সুড়িওতে এল গোয়েন্দারা। ওদের সন্দেহের তালিকায় রয়েছে হেনরি টোস, ডক নরম্যান, রলি বিংহ্যাম ও বব উইলস। কামেরাম্যান আর টেকনিশিয়ানরাও বাদ পড়েনি। তালিকার নিচে আরও দুটো নাম যোগ করা হয়েছে জনাব ক ও জনাব খ নাম দিয়ে। রহস্যাম্য যে দুজন লোক জুনকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে গেছে বলে ভাবা হচ্ছে তাদের নাম তো জানা নেই, তাই এভাবে নামকরণ হয়েছে।

ট্যাসকে শুরুতেই বাদ দিয়ে দেয়া হলো। কারণ প্রধান দু'জন অভিনেতাকে গায়ের করে দিয়ে নিজের ছবির গোড়ায় কুড়াল মারবে না সে। তাছাড়া লোকটা ভাল। অপছন্দ করার মত কোন কিছু তার মধ্যে দেখেনি ছেলেমেয়েরা। রহস্যাম্য কোন আচরণও করছে না।

ডক অবশ্য আজ স্বাভাবিক আচরণ করছে না; করতে পারছে না, বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। মনে কোন দুচিত্তা থাকলে যেমন হয়। মেজাজও ভাল নেই।

'অপরাধবোধ ধৈকেই হচ্ছে এরকম,' কিসফিস করে বলল মুসা।

রলি বিংহ্যামেরও মেজাজ-মর্জি ভাল নেই। কথায় কথায় রেগে উঠচে। রোজার আর জুনের এভাবে নিষ্পোজ হয়ে যাওয়াটাই হয়তো তার জ্ঞানুত্তে চাপ দেয়ার কারণ।

'বড় বেশি অস্ত্রির,' রবিন বলল চিপ্তি উঙ্গিতে। 'একদিনেই স্বাভাবের এতটা পরিবর্তন, ত ল মনে হচ্ছে না!'

'যত য-ই বলো তোমরা,' প্রতিবাদ করল জিনা, 'আমি এদের একজনকেও কিন্দন্যাপার বলতে পারব না। মানুষের মনমেজাজ আরাপ হওয়ার হাজারটা কারণ থাকে।'

'বব উইলসও কিন্তু আজ স্বাভাবিক আচরণ করছে না,' কিশোর বলল। 'রোজারের সুনামের ওপর কিছুটা জেলাস ছিল সে, আগেই লক্ষ করেছি। রোজার নিষ্পোজ হওয়াতে বিন্দুমাত্র দৃঢ় পাচ্ছে না বব। ববঁ একটা খুশি খুশি ভাব দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে।'

সারা দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে সন্দেহভাজনদের ওপর কড়া নজর রাখল গোয়েন্দার। সাত হলো না। কোন সূত্র পাওয়া গেল না। ট্যাস বাদে আর কাউকে তালিকা ধৈকে বাদ দিতে পারল না। কারও প্রতি সন্দেহও বাড়ল না। মোট কথা, তদন্তে একটা ধাপও এগোলো না।

ଛୟ

ସେଦିନ ଶୁଟିଂ ଶେଷେ ଆବାର ଆଲୋଚନ୍ୟା ସମ୍ବଲ ହେଲେମେଯେରା ।

‘ତେଣେ ଭାବିଛି ବ୍ୟାପାରଟା ନିଯେ,’ କିଶୋର ବଳଲ, ‘ତେଣେ ସନ୍ଦେହ ହଜ୍ଜେ, ଯାକେ ଖୁଜାଇ ଆମରା ସେ ସ୍ଟୁଡ଼ିଓତେ ନେଇ । ରୋଜାରକେ କିନ୍ତନ୍ୟାପ କରେ ଏଥାନକାର କାରାଓ କୋନ ଲାଭ ତୋ ଦେଖିତେ ପାଇଁ ନା । କୋନ ମୋଟିଭ ନେଇ, ତବେ ଜୁନକେ...’

ଥେମେ ଗେଲ ଦେ । ଚିମଟି କାଟିଲ ନିଚେର ଠୀଟେ ।

‘ଚୁପ କରେ ଗେଲେ କେନେ?’ ତାଗାଦା ଦିଲ ମୁସା । ‘ଜୁନକେ କି? ବଲୋ?’

‘ଜୁନକେ ସହଜେଇ କିନ୍ତନ୍ୟାପ କରା ସହଜ ଛିଲ ଏକଙ୍ଗନେର ପକ୍ଷେ । ତବେ ଯାର କଥା ବଲାଇ ତାରା କୋନ ମୋଟିଭ ନେଇ ।’

‘କାର କଥା ବଲାଇ?’ ଅଧିର୍ୟ ହେୟ ହାତ ନାଡ଼ିଲ ମୁସା ।

‘ମିସ୍ଟାର ବିଯାଙ୍ଗା?’

‘ବିଯାଙ୍ଗା!’ ମୁସା, ରବିନ, ଜିନା, ଚମକେ ଗେଲ ତିନଙ୍ଗନେଇ ।

‘ହ୍ୟା । ତାର ପକ୍ଷେଇ ସବ ଚେଯେ ସହଜ । ମନେ କରେ ଦେଖୋ, ନିଜେର ଇଚ୍ଛେତେଇ ଜାହାଜେ ଉଠେଛେ ଜୁନ । ତାକେ କେବଳ ଆଟିକେ ଫେଲା, ଆର କିଛି କରାର ଦରକାର ନେଇ । ତାରପର ମିଥ୍ୟ କଥା ବଲେ ଆମାଦେରକେ ହୋଟେଲେ ଫେରିତ ପାଠାନୋ, ସାମାନ୍ୟ...’

‘କିଶୋର, ତୋମର ମାଥା ଖାରାପ ହେୟ ଗେହେ ! ସ୍ଟୁଡ଼ିଓତେ ପରିଚୟ ହୋଯାର ଆଗେ ରୋଜାର ଆର ଜୁନକେ ଚିନିତେନେଇ ନା ମିସ୍ଟାର ବିଯାଙ୍ଗା ।’

ସରାସରି ମୁସାର ଦିକେ ତାକାଳ କିଶୋର । ‘ପରିଚୟ ଯେ ଛିଲ ନା ଏକଥା କି କରେ ଜାନାଇ? ଅପରିଚିତେର ଭାନ୍‌ତ ତୋ କରେ ଥାକତେ ପାରେନ । ପ୍ରମାଣ ତୋ ଆର ନେଇ !’

‘କିନ୍ତୁ ରୋଜାର ଆର ଜୁନ ଯେ ଭାନ କରେନ ଏଟା ଠିକ । ତାରା ସତ୍ୟାଇଁ ଚିନିତ ନା ।’

‘ତା ଠିକ । ଆଗେ ଆମାକେ ଶେଷ କରାତେ ଦାଓ । ଆମାଦେରକେ ଫାଁକି ଦିଯେ ହୋଟେଲେ ପାଠାନୋର ପର ଆର କୋନ ଝାମେଲୀ ରିଇଲ ନା । ଟ୍ୟାକ୍ସିର ଦରକାର ପଡ଼େନି ବିଯାଙ୍ଗାର । ଜୁନକେ ଜାହାଜେ ଆଟିକେ ରେଖେଛେ । ତାରପର ଅନ୍ୟ କୋନ ମେଯେକେ ପାଠିଯେଛେନ ଆମାଦେର ଜ୍ଞାନ କରାର ଜନ୍ୟେ ! କେମନ ଲାଗିଛେ ତୁନତେ? ମେଲେ?’

‘ସବାଇ ହାଁ କରେ ତାକିଥେ ଆହେ କିଶୋରର ଦିକେ ।

ଚୋଥ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେୟ ଗେହେ ମୁସାର । ବଳଲ, ‘କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ଟାଇ ବା କରାର କି ଦରକାର ଛିଲ?’

‘ଜାହାଜେ ଯେ ଜୁନ ନେଇ, ଏଇ ସନ୍ଦେହଟା ଦୂର କରାର ଜନ୍ୟେ । ସବାଇ ଭାବବେ, ହୋଟେଲେ କିଂବା ଅନ୍ୟ କୋଣାଓ ଫିରେ ଯାଇଲି ଜୁନ, ଏଇ ସମୟ ଦୂଜନ ଲୋକ ତାର ପିଛୁ ନିଯେ ତାକେ ଧରେ ନିଯେ ଗେହେ ।’

କିଶୋରର କଥାଯ ଯୁକ୍ତି ଆହେ, ମେନେ ନିତେ ପାରହେ ନା ତବୁ ମୁସା । ‘ଅତିକଳନା ହେୟ ଗେଲ ନା? ଏକାଜ କେନ କରାତେ ଯାବେନ ବିଯାଙ୍ଗା? ତାର ଟାକାର ଅଭାବ ନେଇ ଯେ ଆଟିକେ ରେଖେ ଟାକା ମ୍ଲାଦାଯେର ଜନ୍ୟେ କାଉକେ କିନ୍ତନ୍ୟାପ କରବେନ ।’

‘କରଲେ କେନ କରାଇଲେ ଜାନି ନା ଏକଥାଓ । କରାଇଲେଇ, ଏକଥାଓ ବଲାଇ ନା । ବଲାଇ, ତାର ପକ୍ଷେଇ କରା ସବ ଚେଯେ ସହଜ ।’

‘ই, বুঝলাম,’ রবিন বলল। ‘তো এখন কি করবে?’

‘ইসপেষ্টর শ্বিধের কাছে যাব। আমার সন্দেহের কথা জানাব তাঁকে।’

চপচাপ সব বললেন ইসপেষ্টর। মীরব একটা হাসি দিয়ে মোলায়েম গলায় বললেন, ‘তোমার কল্পনাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। তাহাড়া কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার আগে কোন প্রমাণ আছে কিনা শিওর হয়ে নেয়া উচিত। কৃটা বোকামি করছ, বুঝতে পারছ সেটা?’

লাল হয়ে গেল কিশোরের গাল। তার দিকে তাকাল মুসা। চোখে চোখ পড়ল। দৃষ্টি দিয়েই বুঝিয়ে দিল, আমি আগেই বলেছিলাম এভাবে হট করে ইসপেষ্টরের কাছে আসার দরকার নেই। তিনি ভাল লোক, সন্দেহ নেই, কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ ক্যাস্টেন ইয়ান ফ্রেচার নন যে আমরা বললেই বিখ্যাস করে ফেলবেন।

কিশোরকে কথা বলতে না দেখে আবার বললেন ইসপেষ্টর, ‘মিস্টার বিয়াও একজন সম্মানিত মানুষ। সৎ লোক। ধনী লোক। সব সন্দেহের উর্ধ্বে। হতে পারে, কাকতালীয় ভাবে ঘটনাগুলো তার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি একজন করতেই পারেন না।’ কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে নরম হলেন তিনি। যাই হোক, তোমার সন্দেহের কথা আমাকে জানালে এজনে ধন্যবাদ। কিন্তু আবারও বলছি, তোমার সন্দেহের কোন ভিত্তি নেই। কেন দুজন অভিনেতাকে কিডন্যাপ করবেন তিনি, তার কোন যুক্তি নেই। আমার বিখ্যাস, মোটা অঙ্গের টাকা আদায়ের জন্যেই দুজনকে ধরে নিয়ে গেছে কেউ। ওরা নিজে থেকে এগিয়ে না এলে আপাতত কিছু করার নেই আমাদের।’

উঠে দাঁড়াল কিশোর। আর কিছু বলার নেই। বেরিয়ে এল খানা থেকে। বাইরে বেরিয়ে ফিরে তাকাল একবার বাড়িটার দিকে। মুদ্রণের জন্যে শক্ত হয়ে গেল টেটোজোড়া। তার মুখের দিকে তাকিয়েই শুধু কেলল তার দুই সহকারী রবিন আর মুসা, আগিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিডন্যাপারদের না ধরা পর্যন্ত আর সে ক্ষাত হবে না।

সহয় কাটতে লাগল। মুক্তিশাং চেয়ে কোন মেসেজ এল না কিডন্যাপারদের কাছ থেকে।

অস্ত্র হয়ে পড়ল টমাস। ছবিটা শেষ করতে হলে জুনের ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকলে আর চলবে না। অন্য একজনকে জোগাড় করে নিতে হবে। প্রতিকার বিজ্ঞতি দিল। যেদিন বেরোল বিজ্ঞিটা সেদিনই দেখা করতে এল একটা মেয়ে। একেবারে আলকোরা নয়, আগেও কাজ করেছে টেলিভিশনে। বয়েস আর উক্তা জনেরই সমান। নাম মলি অ্যালকট।

সহকার একটা পরীক্ষা নিয়েই তাকে কাজে বহাস করে দিল টমাস। ছবিতে দারা দারা কাজ করছে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। নবাগাঁকে দেখে কে কৃটা খুশি হলো বোঝা গেল না, তবে আনেকেই শোধ্য তাকে মেনে নিতে পারল না। অস্তত কিশোরের সে ইকমই মনে হলো। যাকি যে দিল না সেটা সঙ্গে

‘ং দই বুবিয়ে দিল। অন্ত আচরণ শুরু করল। ঘাড়ের রঁয়া ফুলিয়ে গরগর করতে লাগল মলির দিকে তাকিয়ে।

‘আচর্য! ’ নিচু গলায় বলল জিন। ‘মানুষকে নিয়ে অহেতুক মাথাব্যথা নেই ওর। নিশ্চয় কোন কারণে সন্দেহ করেছে? ’

কেন একটা অপরিচিত মেয়েকে সন্দেহ করবে রাফি, বুঝতে পারল না গোয়েন্দারা।

তবে সেটা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামানোর সময়ও শেল না। নায়িকা জোগাড় হয়ে যেতেই আউটডোর শুটিংগে চলল টমাস। চলে এল শহরের বাইরে একটা শুটিং স্পটে। অনেক সময় নিয়ে একটা দৃশ্যের শট নেয়ার পর কিছুক্ষণের জন্যে বিশামের ছুটি দিল পরিচালক।

কেউ বসল হাত-পা ছড়িয়ে। কেউ গাঢ়তলায় ঘাসের ওপর শয়ে পড়ল। ছেলেমেয়েরা চলল অঞ্চলটা ঘুরে দেখাত। ঘন করে পাতাবাহার লাগিয়ে বেড়া দেয়া রাস্তার ধার দিয়ে যাচ্ছে, এই সময় কানে এল পরিচিত কষ্ট।

পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল ওরা। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটা শক্তিশালী ইঞ্জিনওয়ালা স্প্র্যার্টস কার। ড্রাইভিং হাইলে বসা এক তরুণের সঙ্গে কথা বলছে মলি।

‘নিশ্চয় চেনা লোক,’ ফিসফিস করে বলল রবিন।

‘না হলে কি আর বলছে,’ জিনা বলল। ‘যাচ্ছিল হয়তো এপথেই। একজন আরেকজনকে দেখে খেমেছে।’

‘আমার তা মনে হয় না,’ দুজনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর। ‘চেনে তো বটেই। কিন্তু হঠাৎ করে পথে দেখা হয়ে যায়নি। জানে, কোথায় দেখা করতে হবে।’

‘তাতেই বা সন্দেহের কি আছে?’ মুসার প্রশ্ন।

‘হয়তো প্রেমিক-প্রেমিক। রোজার আর জুনের মত। মলিকে অভিনয় করতে দিতে রাজি নয়, সেটা নিয়েই কথা কাটাকাটি করছে,’ অনুমান করল জিন।

তার কথাটা উড়িয়ে দেয়া গেল না। কথা বলতে বলতে সত্যিই রেগে উঠল লোকটা। তবে কি বলছে স্পষ্ট করে শোনার জন্যে আরেকটু সরে এল কিশোর। পেছনে এল তার সহকারীরা।

লোকটা বলছে, ‘কাজটা করা তোমার একেবারেই উচিত হয়নি। কি দরকার ছিল বিজ্ঞাপনে সাড়া দেয়ার? তখনও বলেছি ঠিক হয়নি, এখনও বলছি। তোমার গলা চিনে ফেলতে পারে ছেলেমেয়েগুলো। তারপর পড়বে বিপদে। বস্ শুনলে ভীষণ রেগে যাবেন।’

‘পিটার, তোমাকে কতবার বলব, আমি অভিনয় ভালবাসি। বড় অভিনেত্রী হতে চাই। সুযোগ বার বার আসে না। এল যখন ছাড়ব কেন? তোমার বস্ কেন রেগে যাবেন আমি বুঝতে পারছি না।’

‘পারছ না, না?’

‘না, সত্যিই পারছি না। আসলে তুমিই জেলাস হয়ে উঠেছ। একটা কথা

স্পষ্ট বলে দিতে চাই, বস্থাড়া আর কারও ধরক সহ্য করব না আমি। তোমারও না।'

সাংঘাতিক রেগে গেল লোকটা। বোঝা গেল তার গাড়ির লাফ দেয়া দেখেই। প্রচণ্ড এক ঘটকা দিয়ে আগে বাড়ল গাড়ি, তারপর ছুটতে শুরু করল। মোড়ের কাছে গিয়েও গতি কমাল না। টায়ারের প্রতিবাদ তুলে ঘূরল। অদ্ভুত হয়ে গেল ওপাশে।

'যাক,' হাসিমুখে বলল কিশোর, 'পরিষ্ঠিতি বদলাতে আরম্ভ করেছে। জল গড়াচ্ছে অবশ্যে।'

'মানে?' বুঝতে পারল না মিসা।

'মানে কিছু প্রশ্নের জবাব মিলে গেল।'

'কি প্রশ্ন?'

'সব কথা তেঙ্গে না বললে কিছু বোঝো না। অনেক কিছুই তো জেনে গেলাম। মানি আর পিটার একটা অপরাধী দলের সদস্য। কোন একটা পরিকল্পনা করেছে আমাদের ছবিটার বিরুদ্ধে। হয়তো ডগুল করতে চাইছে সব কিছু। সে জন্যেই তুলে নিয়ে গেছে রোজার আর জুনকে। পিটারের ডয়, মলির গলার স্বর আমরা চিনে ফেলতে পারি। তারমানে সে জানে, ওই গলা আমরা শুনেছি। কোথায়, বুঝতে পারছ না?'

'সেই মেয়েটা,' বলে উঠল রবিন। 'যে জুন সেজে সেদিন ফোন করেছিল তোমাকে!'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু,' জিনা বলল, 'বস্টা কে আমরা এখনও জানি না। বিয়াগুর নাম কিন্তু বলা হয়নি।'

'না বলুক। একটা মূল্যবান সূত্র তো পেলাম। মলির ওপর নজর রাখব। সেই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তার বসের কাছে।'

সাত

রোজার আর জুন নিরুদ্দেশ হয়ে ট্যাসের পরিকল্পনায় অনেকখানি গড়বড় করে দিয়েছে। বেশ কয়েকটা দৃশ্যের আবার নতুন করে শট নিতে হবে। যেদিন পিটার আর মলির রহস্যময় কথাবার্তা শুনল গোয়েন্দারা, তার পরদিন আবার শুহায় শট নেয়ার জন্যে সেট সাজাল ট্যাস। প্লাইটড, কার্ডবোর্ড আর পলিস্টাইরিনে তৈরি কৃত্রিম শুহাটা দেখতে একেবারে আসলের মতই লাগে। ওপরে প্রায় আলগা হয়ে ঝুলে রয়েছে বড় বড় পাথর। দেখতে অবিকল পাথরের মত, কিন্তু কাঠের তৈরি ওগলো।

কি কি করতে হবে অভিনেতাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছে ট্যাস। শুহার মধ্যে আলোচনায় বসবে ডাকাতেরা। কথায় বনবে না বলে রেগেমেগে বেরিয়ে আসবে এক ডাকাত। এই অভিনয়টার ভার পড়ল ডকের ওপর।

ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়ে উত্তিৎ দেখতে গোয়েন্দারা। তাদের পালা আসার অপেক্ষায় রয়েছে। রাফিও শাস্তি হয়ে আছে। একবার গায়ে রঙ মেখেই যথেষ্ট শিক্ষা

হয়েছে তার।

'বুলে তো?' ডককে বলছে টমাস, 'বুব রাগ দেখাবে। তারপর হাত মুঠে করে ঘটকা দিয়ে ঘুরে গটমট করে বেরিয়ে আসবে শুনা থেকে। যাও, বসো।'

শটিং ঘুর হলো। চমৎকার অভিনয় করল ডক। এমন করে বেরোতে গেল শুনা থেকে, যেন সত্যি সত্যি রেংগে গেছে। ধীরে ধীরে পেছনে সরানো হচ্ছে ক্যামেরা।

ইঠাই করেই ঘটল ঘটনাটা। চমকে দিল সবাইকে। শুহামুখে সবে বেরিয়েছে ডক এমন সময় ওপর থেকে বিরাট একটা কৃতিম পাথর খসে পড়ল তার কাঁধে।

ব্যাথায় চিকিৎসা দিয়ে পড়ে শেল সে। গোঙাতে লাগল।

সবার আগে দৌড়ে গেল টমাস। ভীরু উদ্বিষ্ট হয়ে জিজেস করল, 'আয়ই ডক, ডক, বেশি ব্যাথা!'

'কাঁধে লেগেছে...উফ!'

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার। ব্যাথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। তার কাছে ঝুঁকে বসল জিনা। 'দাঁড়ান, নড়বেন না। জ্যাকেটটা খুলে দিই।'

কিন্তু সামান্য নাড়াচাড়া করলেই ব্যাথায় শুভিয়ে ওঠে ডক।

'ডাক্তার ডাকা ছাড়া পথ নেই।' একজন সহকারীকে বলল টমাস, 'কুইক!'

ফোনের দিকে দৌড় দিল টেকনিশিয়ান। ডাক্তার আসতে দেরি হলো না। আহত লোকটার কাঁধের হাড় পরীক্ষা করে বললেন, 'জোড়া থেকে সরে গেছে। তেমন খারাপ কিছু নয়, তবে সারতে সময় লাগবে। হাড় ভেঙেছে বলে মনে হয় না। এক্স-রে না করলে শিওর হতে পারব না। দেখি, অ্যামবুলেসের জন্যে খবর দিই।'

ব্যাথায় ককাছে, তারপরেও ছবিটার কথা ডেবে আকুল হচ্ছে বেচারা ডক। দোষারোপ করছে নিজেকে। 'পড়ার আর সময় পেল না! একের পর এক অঘটন...টমাস, কি করে সামলাবে সব?'

'সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' সাত্ত্বনা দিয়ে বলল টমাস। 'ব্যবস্থা একটা হবেই। তুমি চুপ করে থাকো। কথা বললে কষ্ট হবে।'

ওরা কথা বলতে বলতেই হাজির হয়ে গেল অ্যামবুলেস। খুব সাবধানে তাতে ডককে তুলে নেয়া হলো।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুসা জিজেস করল, 'আমরা কেউ আসব আপনার সঙ্গে?'

কিন্তু ডককে জবাব দেয়ার সুযোগই দিল না টমাস, 'না না, তোমাদেরকে আসতে হবে না। আমিই যাচ্ছি। এক্স-রের রেজাল্ট না দেবে আসব না। জানতে হবে অবস্থা কতটা খারাপ। বেশি খারাপ না হলেই বাঁচি। তোমরা ততক্ষণে পাঠ মুখস্থ করে ফেলো।'

অ্যামবুলেসে উঠে বসল সে। স্ট্যার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল গাড়ি। বেরিয়ে গেল ড্রাইভওয়ে ধরে।

প্রায় বারোটা বাজে। গোয়েন্দাদেরকে লাঞ্ছ খাওয়ার জন্যে হোটেলে চলে যেতে বলল অন্যান্য অভিনেতারা।

‘খেয়ে বেশি দেরি কোরো না,’ রলি বিংহ্যাম বলল। ‘ডকের কি অবস্থা ততক্ষণে জেনে যাব আমরা। ভাগিস আজ বিকেলের শটটাতে তার ভূমিকা নেই।’

হোটেলে ফিরে দ্রুত লাখ সেরে নিতে লাগল ছেলেমেয়েরা।

পারকার আংকেল জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমরা কি আবার এখন স্টুডিওতে যাবে?’

‘হ্যাঁ,’ জবাব দিল জিনা। ‘ডকের অবস্থা কতটা খারাপ জানা দরকার।’

খেয়েই বেরিয়ে পড়ল ওরা। চলে এল স্টুডিওতে। মলি, রলি আর অন্য অভিনেতা-টেকনিশিয়ানরা আগেই এসে বসে আছে।

‘কোন খবর পেলেন?’ রলিকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। ‘কি বলল হাসপাতাল থেকে?’

‘কোন খবরই নেই। হেনরিও আসেনি।’

‘ফোনও না?’ মুদা জানতে চাইল।

‘না। এত তাড়াহুড়া করে গেল, অথচ...’

‘অবাক কাওঁ! নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে গিয়েও কাটল না কিশোর। হাসপাতালে আপনারা একটা ফোন করলেও তো পারতেন?’

রলি বিংহ্যামের গোলগাল মুখটা লাল হয়ে গেল। ‘তাই তো, এই কথাটা মনে পড়েনি এতক্ষণ! দাঢ়াও, এখুনি করছি।’

তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে এল সবাই। ডকের খবর জানতে চায়। কিন্তু ওপাশের কথা শুনতে তুরু কুঁচকে গেল রলির। প্রায় চিৎকার করে বলল, ‘কি বললেন? কিন্তু আমার চোখের সামনে অ্যামবুলেন্স এসে ডককে তুলে নিয়ে গেল! শুধু আমি একা না, আরও অনেকে দেখেছে।’

আবার চুপ করে ওপাশের কথা শুনতে লাগল সে। তারপর বলল, ‘টিভিতে অভিনয় করে ও। তার সঙ্গে গেছে ডিরেষ্টের হেনরি টমাস। সবাই তো চেনে ওকে।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্লীজ! আরেকবার চেক করে দেখুন। আমরা সবাই অস্থির হয়ে আছি।’

আবার নীরবতা।

উত্তেজনায় ফেঁটে যাবে যেন কিশোর।

শুনতে শুনতে মরার মৃত্যুর মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল রলির মুখ। আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রাখল। মাথা নেড়ে বলল, ‘ডক নরম্যান নামে কাউকেই নাকি নেয়া হয়নি আজ হাসপাতালে। অত্যুত্ত ব্যাপার! সেই কখন গেল, এখনও পৌছেনি! এ হতে পারে না...’

বেজে উঠল আবার টেলিফোন। সবার আগে ছো মেরে রিসিভার তুলে নিল কিশোর। ফোন বাজতেই তার মনে হচ্ছিল, তাকেই করা হয়েছে। ঠিকই। ফোন করেছেন ইসপেন্টের শ্বিথ, ‘হালো, ওখানে কিশোর পাশা আছে?’

‘আমিই বলছি, স্যার।’

‘কিশোর, শোনো, একটা খারাপ খবর আছে। তোমাদের ডিরেষ্টের টমাসকে পাওয়া গেছে একটা নির্জন গলির মধ্যে। বেহুশ হয়ে পড়েছিল।’

‘সর্বনাশ! এখন কোথায়?’

‘তার বন্ধুর একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করল। বাড়ি মেরে বেহশ করা হয়েছে। তেমন জরুর হয়নি। তোমাদেরকে চিন্তা না করতে বলেছে। কাল সকালের মধ্যেই ফিরে আসবে।’

ইলেক্ট্রিক শক খেয়েছে যেন কিশোর। ‘কি হয়েছিল বলেছে কিছু?’

‘বেশি কিছু বলতে পারেনি। তার এই অবস্থায় আমরা ও বেশি চাপাচাপি করিন। বলল, তার সহকারী ডক নরম্যানকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছিল। হঠাৎ সামনে থেকে এসে রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়াল একটা কালো গাড়ি। দুজন লোক নেমে এসে পিস্তল দেখিয়ে টমাসকে নামাল অ্যামবুলেন্স থেকে। প্রথমেই পিটিয়ে বেহশ করল তাকে। আর কিছু বলতে পারে না সে। অ্যামবুলেন্সটার কোন দ্বোজ নেই। মনে হয় ডাকাতেরা নিয়ে গেছে।’

‘ডকের কি খবর?’

‘পাওয়া যায়নি। মনে হয় তাকেও কিডন্যাপ করা হয়েছে।’

‘আমারও তাই ধারণা। ওকে কিডন্যাপ করার জন্যেই জোর করে থামানো হয়েছে অ্যামবুলেন্স।’

‘কিন্তু আমরা এখনও শিওর না। তদন্ত চালাচ্ছি। দেখা যাক, কি হয়।’

লাইন কেটে দিলেন ইসপেন্টার।

কি হয়েছে জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই।

‘কি ব্যাপার?’ জিজ্ঞেস করল রবিন।

ইসপেন্টার যা যা বলেছেন, জানাল কিশোর।

গভীর হয়ে গেল টিভির পেশাদার অভিনেতারা। যে রকম মনে হচ্ছে, এক এক করে সবাইকেই বোধহয় কিডন্যাপ করা হবে। ভাবছে, এরপর কার পালা?

কথাটা জিজ্ঞেসই করে ফেলল মলি।

চট করে তার দিকে একবার তাকিয়ে আরেক দিকে চোখ সরিয়ে নিল কিশোর। মনে করার চেষ্টা করছে, পাথরটা পড়ার সময় সে কোথায় ছিল? সে-ই ঠেলে ফেলেনি তো?

কথা রাখল টমাস। পরদিন সকালেই স্টুডিওতে ফিরে এল। মাথায় ব্যাণ্ডেজ চেহারা রক্তশূন্য। চোখের কোণে কালি। উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। তবে শারীরিক ক্ষতি খুব একটা হয়নি। সিন্দ্রাস্ত নিয়েছে, শুটিং চালিয়ে যাবে। ডক নেই। অন্য কাউকে দিয়ে সে জায়গাটা পুরণ করে নেবে।

‘এমন ঘটনা ঘটবে কল্পনাই করিনি,’ বলল সে। ‘রাস্তার মাঝাখানে এসে অ্যামবুলেন্সের ওপর হামলা চালায়, ভাবতে পারো? একেবারে যেন ফিন্নের অবস্থা। আমাকে পিটিয়ে বেহশ করে রেখে একজন আহত লোককে নিয়ে চলে গেল। ডক বেচারার জন্যে খুব খারাপ লাগছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে কষ্টটা যা পাবে না! কিন্তু কারা এমন করছে? রোজারকে নিল, জুনকে নিল, এখন ডককেও।’

‘তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে একমত হলেন,’ কিশোর বলল। ‘তিনটে

ঘটনারই একটার সঙ্গে আরেকটার যোগাযোগ আছে।'

'তা তো আছেই। এখন আর অঙ্গীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আমার তো কোন শক্তি নেই। অথচ ক্ষতিটা করছে আমারই। ছবিটাকে স্যাবটাইজ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে।' চোখে উৎকষ্ট নিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল। 'এখন তো ডয়ই লাগছে তোমাদের না কিছু করে বসে।'

তবে তেমন ভয়ের কিছু দেখল না কিশোর। আগের দিন এটা নিয়ে আলোচনা করেছে সহকারীদের সঙ্গে। ওদের জন্যে এখনও বিপজ্জনক হয়ে ওঠেনি পরিস্থিতি। হওয়ার চোন কারণ নেই। তার ধারণা, টমাস কিংবা তার ছবির সঙ্গে এই নির্বোজ রহস্যের সম্পর্ক নেই।

কিন্তু সে কথা এখন টমাসকে বলল না। বললে বিশ্বাস করতেও পারে, না-ও পারে। অহেতুক কথা কাটাকাটি করে লাত নেই। তার চেয়ে কেসটার সমাধানের দিকেই বেশি নজর দেয়া উচিত। সমাধান হলে সবাই জানতে পারবে আসম ব্যাপারটা কি।

আট

অপেক্ষা করাই সার হলো গোয়েন্দাদের, তদন্ত করার মত কোন সূত্র আর মিলল না।

দুপুরবেলা দুজন পুলিশ এল টমাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে। তেমন কিছু বলার নেই তার। যা বলার আগেই বলেছে ইস্পেটারকে। নতুন আর কিছুই বলার নেই।

তবে পুলিশের কাছে একটা খবর আছে। পাওয়া গেছে অ্যামবুলেন্সটা।

'সাগরের ধারে একটা রাস্তার পাশে পড়ে ছিল,' বলল একজন পুলিশম্যান। 'সৈকত থেকে খেলতে খেলতে ঝোপে ঢুকে পড়ে একটা ছেলে। সেখানেই লুকানো ছিল গাড়িটা। ওর বাবা পুলিশকে খবর দেয়।'

'ডকের খবর কি?' জিজেস করল কিশোর।

'গাড়িতে কেউই ছিল না।'

পুলিশ চলে গেলে খাবারের প্যাকেট খুলে লাখ করতে বসল অভিনেতা আর কর্মীরা। টমাস বলল তার খিদে নেই।

'সামান কিছু খান,' জিনা সাধল তাকে। সঙ্গে করে অনেক খাবার নিয়ে এসেছে ওরা। পানির, ডিম ও টমেটো দিয়ে তৈরি স্যাগউইচ, বিশাল এক ফুট কেকের অর্ধেকটা, আর কোকাকোলা। 'দুঃখিতা তো হবেই। কিন্তু না খেলে শরীর টিকবে কি করে।'

রাফিও জুলজুল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। যেন জিনার মতই অনুরোধ করছে, 'খান না, খান, একটু খান।'

হাসল টমাস। এই অনুরোধ এড়াতে পারল না। তাকে খুশি করার জন্যেই যেন হাত বাড়িয়ে ঝুঁড়ি থেকে একটা স্যাগউইচ তুলে নিল।

সবাই কথা বলছে খেতে খেতে। কেবল কিশোর চুপ। খাবার চিবুচ্ছে আর ভাবছে। তিনি তিনটে কিডন্যাপিং হয়ে গেল, অথচ কিছুই করতে পারছে না ওরা।

‘তিনজনেরই একটা ব্যাপার কমন,’ যেন নিজেকেই বোঝাল সে, ‘তিনজনেই অভিনেতা। এছাড়া আর কোন যোগসূত্র আছে কি?’

‘না নেই,’ বিষণ্ণ কর্তৃ জবাব দিল টমাস।

‘আছে,’ রবিন মনে করিয়ে দিল। ‘রোজার আর ডক কাজিন।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, তুলেই গিয়েছিলাম,’ কিশোর বলল।

‘নামের তো কোন মিল নেই,’ জিনা বলল। ‘আসল নামটা দুই জনের দুই রুকম।’

‘তাতে কি কাজিন হতে পারে না? চাচাত ভাই হলে মিল থাকত। হয়তো খালাত ভাই।’

মাথা বোঝাল টমাস।

গোটা হয়েক স্যান্ডউইচ খেয়ে আরেকটার দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। তার বদলে কেকের বড় একটা টুকরো তুলে নিল, সেই সঙ্গে কোকাকোলার ক্যান। কামড় বসানোর আগে কিশোরের দিকে তাকাল। ‘মনে হচ্ছে কাজিনের মধ্যে কিছু একটা সত্ত্ব পেয়ে গেছে তুমি?’

‘অ্যা!... এতক্ষণ পাইনি। তুমি বলাতে পেলাম।’ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল কিশোরের মুখ। ‘তিনজনের মধ্যেই যোগাযোগ পেয়ে গেছি। ভাবতে হবে এটা নিয়ে।’

শুঙ্গিয়ে উঠল মুসা। ‘আহা, এমন ভঙ্গিতে বলছ যেন এইমাত্র ভাবনা তরুণ হলো, এতদিন কিছুই ভাবা হয়নি। ধাকো তোমার ভাবনা নিয়ে। আমি খাই।’ বলেই হাতের কেকের টুকরোটার অর্ধেকটা কামড়ে কেটে নিয়ে চিবাতে তরুণ করল। তারপর ঠোটে ক্যান লাগিয়ে এক চুমকেই সাবাড় করে দিল অর্ধেকের বেশি।

নিচের ঠোটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। ‘গোফেন্ডাগিরির কাজটাই হলো ভাবার কাজ। ভাবতে হবে, প্রচুর ভাবতে হবে। কোন সুত্রকেই ফেলনা মনে করে অবহেলা করা চলবে না। এক এক করে ভেবে বের করতে হবে কোনটা প্রয়োজনীয়। সেগুলো রেখে বাকিগুলো বাদ। তারপর সেগুলো নিয়ে আবার ভাবনা...’

‘দোহাই তোমার, রক্ষা করো,’ হাত তুলল মুসা। ‘তোমার যত ইচ্ছে ভাব। কেবল দয়া করে লেকচারটা ধারাও,’ বলেই আবার ক্যান লাগাল ঠোটে। এইবার শেষ না করে আর ছাড়বে না।

‘কিন্তু প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো বের করা সহজ কাজ নয়,’ মুসার কথায় কান দিল না রবিন।

‘ইউ,’ করে যেন রবিনের সঙ্গে একমত হলো রাফি। আসলে অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে কেউ কথা বলেনি তো, তাই সৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে।

তার মাথায় হাত ঝুলিয়ে দিতে লাগল জিন।

কিশোর বলল, ‘সম্পর্কের ব্যাপারটা নিয়ে আরেকবার আলোচনা করা যাব।

যে তিনজনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে তাদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোন না কোনভাবে সম্পর্ক আছে। রোজার আর ডক ভাই ভাই। রোজারের সঙ্গে জুনের বিয়ে হতে যাচ্ছে। এগুলো জরুরি সূত্র। ভুললে চলবে না।'

সেদিন খুব খেটেপিটে কাজ করল সবাই। কিন্তু কারও মনেই শান্তি নেই, ফলে উৎসাহও নেই। ডকের নির্বোজ হওয়াটা ভাবি হয়ে চেপে আছে সবার মনে। সন্ধ্যার আগে লগন থেকে একটা ফোন এল টমাসের কাছে। করেছে ডকের স্তুরিচ। স্বামীর কিডন্যাপের খবর শুনে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বলল, আগামী দিনই সাউথবুর্নে আসছে। তার স্বামীকে উদ্বারের ব্যাপারে কি করছে পুলিশ, সামনে থেকে দেখতে চায়। তার ধারণা, সে থাকলে অনেক সুবিধে হবে।

কিন্তু কিশোরের সে রকম মনে হলো না। তার ধারণা, এসে আরও ঝামেলা বাঢ়াবে।

আগামী দিন স্টেশনে যাবে টমাস, রিচাকে এগিয়ে আনার জন্য। গোয়েন্দারাও তার সঙ্গে যেতে চাইল।

অমত করল না টমাস। ওদেরকেও নিয়ে গেল।

প্রথম দেখায়ই রিচাকে ভাল লেগে গেল ওদের। হালকা-পাতলা শরীর, কালো চুল। বেশ সুন্দরী। ঠোটের কোণে মন খারাপ করে দেয়া বিষণ্ণ হাসি।

গোয়েন্দাদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল টমাস।

'আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছ তোমরা, খুব খুশি হলাম,' রিচা বলল। তোমাদের চেহারাই বলছে, ভাল খবর নেই। তার কোন খোজাই পাওয়া যায়নি এখনও, না? পুলিশ কি করছে?' চোখের পানি রাখতে পারল না আর সে।

তার মন ভাল করার জন্যে কথা দিল গোয়েন্দারা, যে ভাবেই হোক তার স্বামীকে খুঁজে বের করবেই। রাফি তার হাত চেঁচটে দিল। নেজ নাড়তে লাগল।

পুলিশের সঙ্গে কথা বলেই সারাটা সকাল কেটে গেল তার। তারপর স্টুডিওতে এসে স্টুডিওর ছোট কাফেটাতে লাঙ্গ খেতে বসল। টমাসের ছবিতে যে সব লোক কাজ করছে সবাই বসেছে সেখানে।

যে যেভাবে পারল রিচাকে সাম্ভূত দেয়ার চেষ্টা করল। এমন ভাবে কথা বলতে লাগল গোয়েন্দারা, যেন মহিলা তাদের অনেক দিনের পরিচিত।

সূত্রের আশায় একের পর এক প্রশ্ন করে চলল তাকে কিশোর। কিন্তু তেমন কিছুই জানতে পারল না রিচা, যাতে তদন্তের সুবিধে হয়।

কোন শক্ত আছে কিনা জিজ্ঞেস করল।

'না না, শক্ত আসবে কোথেকে? আমার স্বামীর একজন শক্তও নেই কোথাও। রোজারেও একই ব্যাপার। খুব ভাল মানুষ দুজনেই। সবাই ওদেরকে পছন্দ করে।'

দেখতে দেখতে রিচারও বন্ধু হয়ে গেল সবাই।

ডককে না পাওয়া পর্যন্ত সাউথবুর্নে থাকার সিদ্ধান্ত নিল সে। পুলিশ সাধামত চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারছে না। কোন হাদিসই নেই তিনজন

নিখোঁজ মানুষের।

তিনি গোয়েন্দা ও কিছুই করতে পারেনি এখনও। একটুও এগোতে পারেনি।

রিচার বিষণ্ণতা কাটানোর জন্যে এক বুদ্ধি করল টমাস। ছবিতে তাকে ছোট একটা রোল দেয়ার প্রস্তাব দিল। সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিল রিচা। হাত শুটিয়ে বসে থাকলে দুশ্চিন্তা করে না, বাড়ে। কাজটা করলে ডকের কথা ও মোটামুটি ভুলে থাকা যাবে, কিছু টাকা ও উপার্জন হবে।

কৃতজ্ঞ কঠে রিচা বলল, ‘আমাকে খুশি করার জন্যে সবাই অস্থির। খুব ভাল লাগছে আমার। বল পাছ্ছ এখন।’

‘আশা ও ছাড়বেন না,’ মুসা বলল। ‘আমরা তো আছি। ডক আমাদেরও বন্ধু। তাকে উদ্ধার না করে ক্ষান্ত হচ্ছি না আমরা।’

ভারি কোন আলোচনা চলছে কি করে যেন বুঝে ফেলল রাফি। উঠে গিয়ে রিচার দিকে একটা পা বাড়িয়ে দিল লেগশেকের ভঙ্গিতে। যেন নৌবে সে-ও ভরসা দিতে চাইছে মহিলাকে।

অবাক হলো মহিলা। তারপর হাসল। রাফির পা-টা ধরে বাঁকিয়ে দিল।

খুশি হয়ে ফিরে এসে আগের জায়গায় বসল রাফি।

হেসে বলল জিনা, ‘দেখলেন তো, রাফি ও আপনাকে সাহায্য করতে চায়।’

রবিন বলল, ‘আপনার স্বামীর বিপদটা বোধহয় তেমন সিরিয়াস নয়। আমি বলতে চাইছি, প্রাণের ওপর ঝুঁকি আসবে না। আজ হোক কাল হোক, ফিরে আসবেই ওরা।’

ফোস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রিচা। মলিন হেসে বলল, ‘সেই কালটা যে কবে হবে তাই বুঝতে পারছি না। বেশি দেরি না হলেই বাঁচি।’

রিচাকে খুশি করার জন্যে যা যা সম্ভব সবই করা হচ্ছে। গোয়েন্দারা তো হায়ার মত লেগে রয়েছে তার সঙ্গে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই তাকে নেয়ে সৈকতে সাঁতার কাটতে যাচ্ছে। কখনও দাঁড়িটানা নৌকা ভাড়া করে নিয়ে বরিয়ে পড়ছে সাগরে। এমন ভাবে লেগে থাকে ছেলেমেয়েগুলো, হারানো স্বামীর কথা ভাবারই অবকাশ পায় না সে।

এক বিকেলে আউটডোর শুটিংরে জন্যে করমোরেন্ট কেপ নামে একটা জায়গায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল টমাস। প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর ও খানকার। প্রচুর পাথর আছে। গোয়েন্দারা বলল, অন্যদের মত বাই রোডে যাবে না ওরা। নৌকা নিয়ে রিচাকে সঙ্গে করে জলপথে যাবে।

টমাসের কোন আপত্তি নেই। নির্দিষ্ট সময়ে অভিনেতারা জায়গামত হাজির থাকলেই হলো।

রিচাও খুশি হলো। জলপথে করমোরেন্ট কেপ-এ যাওয়ার মজাই আলাদা। কাজও হবে, ভাল একটা আউটিংও হবে।

সাউথবুর্ন বন্দর থেকে একটা নৌকা ভাড়া নেয়া হলো। মাল্লা নেয়ার দরকার নেই। মুসা আর জিনা দুজনেই খুব ভাল মাল্লা। পথেজনে কিশোর আর রবিনও দাঢ় বাইতে পারবে।

ରୁଗ୍ନା ହୟେ ଗେଲ ଦଲଟା । ନିରାପଦେଇ ପୌଛଳ କରମୋରେଟ୍ କେପ-୫, ସେଥାନେ ଓଡ଼େରକେ ଦେଖା କରତେ ବୁଲେଛେ ଟମାସ ।

‘ଶ୍ରୀ,’ ଶୁଣି ହୟେ ବଲଲ ପରିଚାଳକ, ‘ଠିକ ସମୟେଇ ହାଜିର ହୟେ ଗେଛ । ଏବୋ, କ୍ୟାମେରାର ସମନେ ଦାଢ଼ାଓ । ସବ ରେଡ଼ି ।’ ନିଚୁ ଗଲାଯ ବଲଲ, ‘ତବେ ପୁରୋପୁରି ଆମେଲା ଏଡାତେ ପାରଲାମ ନା ।’ ବୁଡ଼ୋ ଆଙ୍ଗୁଳ ଦିଯେ କରେକଜନ ମାନୁଷକେ ଦେଖାଇ । ଛୁଟି କାଟାତେ ଏସେହେ ଏଖାନେ । ଉଠିବି ହେଲେ ଦେଖେ କାହେ ଏସେ ଜଟଲା କରଛେ ଦେଖାର ଜନ୍ୟେ । ‘ଇଁ, ଓରୁ କରା ଯାକ ।’

କଢ଼ା ବୋଦେର ଜନ୍ୟେ ଏଖାନେ କାଜ କରା ଖୁବ କଠିନ ହୟେ ପଡ଼ିଲ । ସେମେ ସାରା ହେଲେ ସବାଇ । ରେହାଇ ଦିଲ ନା ଟମାସ । ଖାଟିଯେ ମାରଲ କର୍ମଦେଇ । ଏକଟାନା ଚଲଲ କାଜ । ଭାବ ଦେଖେ ମନେ ହେଲେ, ଖାଓୟାର ସମୟାଓ ଦେବେ ନା ।

କିନ୍ତୁ ଦିଲ ଅବଶ୍ୟେ । ବଲଲ, ‘ପେନ୍ଟାଲିଶ ମିନିଟ ସମୟ ଦିଲାମ । ତାରପର ଆବାର ଓର ହବେ । ଏଖାନକାର କାଜ ଆଜକେର ମଧ୍ୟେଇ ଶୈବ କରବ ।’

ହାପ ଛାଡ଼ିଲ ସବାଇ । ଦମ ଫେଲାର ଫୁରସତ ପେଲ ।

ମୁସା ବଲଲ, ‘ଆନେ ବୀଚଲାମ । ଉକ୍, ବାବାରେ, କି ସାଂଘାତିକ ଖାଟନି! ଅଭିନୟାଓ ସେ ଏତ କଠିନ ଜ୍ଞାନତାମ ନା । ଚଲୋ, ପାନିତେ ନାମି । ନା ହଲେ ଶରୀର ଠାଣା ହବେ ନା ।’

ତାର ପ୍ରତ୍ୟାବେ କେଉଁଇ ଅମତ କରଲ ନା । ଏରକମ ସଯୋଗ ପାଓୟା ଯେତେ ପାରେ ଭେବେ ବାଦିଂ ସ୍ୟଟ ନିଯେଇ ଆସା ହେଲେ । ଜିନା ତୋ ଲାର୍କିଯେ ଉଠିଲ, ‘ଏତକ୍ଷଣେ ଏକଟା କଥାର ମତ କଥା ବଲଲେ । ଚଲୋ, ନୋକା ନିଯେ ସରେ ଯାଇ । ଏକଜନ ବଲଲ, ଓଦିକଟାଯ ଏକଟା ଜ୍ଞାଯାଗା ଆହେ, ତିନ ଦିକେଇ ପାନି । ଦ୍ଵିପାଇ ବଲା ଚଲେ । ଓଥାନେ ଶିଯେ ସ୍ଥାତରାବ । ଏଖାନେ ଡିଡ଼ ବେଶି ।’

ନୋକା ନିଯେ ଚଲେ ଏଲ ଓରା । ଜ୍ଞାଯଗାଟା ନିର୍ଜନ । ଏକଜନ ମାନୁଷ ଓ ଚୋରେ ପଡ଼ିଲ ନା । କୋନଯତେ ନୋକାର ନୋଡରଟା କେବଳ ଫେଲିଲ ମୁସା, ତାରପରଇ ଝାପାସ । ଜିନା ଆପେଇ ନେମେ ପଡ଼େହେ । ରବିନ ନାମଲ । କିଶୋର ନାମଲ । ରାକି ତୋ ନାମଲାଇ । ସେ-ଓ ଭାଲ ସାଂତାରକ । ଜିନାର ସଙ୍ଗେ ଥେବେ ସାଂତାର କାଟିତେ, ବିଶେଷ କରେ ଦାପାଦାପି କରତେ ତାର ଓ ଖାରାପ ଲାଗେ ନା । ତବେ ସବ ସମୟ ନଯ ।

ରିଚାଓ ନେମେ ପଡ଼ିଲ । ଦେଖେ ଗେଲ, ଭାଲ ସାଂତାର ଜାନେ ସେ-ଓ । ପାନ୍ନା ଦିଯେ ସାଂତରାତେ ଲାଗଲ ମୁସା ଆର ଜିନାର ସଙ୍ଗେ । ହାସହେ ଜୋରେ ଜୋରେ । ମନେର ଭାର ଅନେକଟାଇ ହାଲକା ହୟେ ଗେଛେ ।

ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ସମୟଟା ଯେନ ଉଡ଼େ ଚଲେ ଗେଲ । ଫେରାର ସମୟ ହଲେ ।

‘ଆସଛି । ଏକ ମିନିଟ ।’ କାପଡ଼ ବଲଲାନୋର ଜନ୍ୟେ ବଡ଼ ଏକଟା ପାଥରେର ଆଡ଼ାଲେ ଚଲେ ଗେଲ ରିଚା ।

ଜିନା ଚଲେ ଗେଲ ଆରେକଟା ପାଥରେର ଆଡ଼ାଲେ । ବାଲିତେଇ ହାତ-ପା ଛାଇୟେ ଛିତ୍ତ ହୟେ ଓୟେ ପଡ଼ିଲ ଛେଲେରା । ଓରା ସ୍ୟଟ ପରେନି । ଖାଲି ଗାୟେଇ ନେମେଛିଲ । କାପଡ଼ ବଲଲାନୋର ଆମେଲା ନେଇ । ପାନି ଯା ଲେଗେହେ ଗାୟେ, ତୋଦେ ଶୁକିଯେ ନେବେ । ବକବକେ ଉଜ୍ଜୁଳ ଆକାଶର ଦିକେ ତାକାନୋ ଯାଯ ନା । ଚୋଖ ବୁଜେ ଫେଲିଲ ଓରା ।

‘ଏହି, ମୁମିଯେ ପଡ଼ିଲ ନାକି? ’ ଜିନାର ଭାକେ ଚୋଖ ମେଲିଲ ସବାଇ ।

କିନ୍ତୁ ଉଠିଲ ନା କେତେ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିଲ ।

রাখিকে পাশে বসিয়ে আদৰ করতে লাগল জিনা। সী-গালের মাহ ধরা দেখতে লাগল।

একসময় উঠে বসল মুসা। মৃচকি হাসল। 'সব মেয়েমানুষেরই এক অবস্থা। কাপড় পরতে গেলে আর হশ থাকে না। বলে গেল এক মিনিট। আমার তো মনে হচ্ছে দল মিনিট হয়ে গেছে।'

'দেখো,' রেগে উঠল জিনা, 'সব মেয়েমানুষকে এক করবে না। আমার কতক্ষণ লেগেছে?'

'তুমি কি আর মেয়ে নাকি?' রোদে বিলিক দিয়ে উঠল মুসার সাদা দাঁত। 'নিজেকে তো ছেলেই ভাব। তোমার কথা বাদ...'

কিশোরও উঠে বসেছে। 'আসলেই দেরি হয়ে যাচ্ছে। বকা বেতে হবে আজকে।'

'এই, রিচারও কিছু হয়ে গেল না তো?' উদ্ঘিষ্ঠ কঢ়ে বলল 'রবিন। 'এতটা দেরি তো করার কথা নয়।'

'আরে দূর। এখানে কি হবে? দাঁড়াও, ডাকি,' মুখের কাছে হাত জড়ে করে চিকিরণ করে রিচার নাম ধরে ডাকল মুসা।

জবাব নেই।

আরও জোরে ডাকল সে।

এবারও সাড়া মিলল না। কি করছে এতক্ষণ?

চিকিরণ করে কিশোর বলল, 'রিচা, তাড়াতাড়ি করুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

কিন্তু কেউ বেরিয়ে এল না পাথরের ওপাশ থেকে। বিশাল পাথরে বাড়ি থেয়ে তধু প্রতিখনি তুলল তার কষ্টস্বর।

মুসা ডাকল আরও একবার।

'দেখো,' রবিন বলল, 'সত্যিই কিছু হয়েছে। আমার ভাঙ্গাগছে না ব্যাপারটা।'

'শরীর খারাপ হয়ে গেল না তো?' জিনা বলল, 'যা রোদের রোদ। এত দাপাদাপি সহ্য করতে পারেনি হয়তো। বেহশ-টেহশ হয়ে গেছে...'

উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'চলো তো দেখি?'

বিরাট পাথরটার দিকে পা বাড়াল সে। অন্যেরা পিছু নিল তার।

পাথরটা ঘুরে অন্য পাশে এসে থমকে দাঁড়াল গোয়েন্দাপ্রধান। চোখ মাটির দিকে। দলা পাকিয়ে পড়ে আছে জিনিসটা।

রিচার বাদিং সৃষ্টি। কিন্তু রিচা নেই। কোথাও দেখা গেল না তাকে। রোজার, জুন আর ডকের মতই গায়েব।

নয়

'অসম্ভব! এ হতে পারে না!' তোতলাতে শুরু করল কিশোর। 'কয়েক মিনিট আগেও ছিল এখানে। ধরতে গেলে আমাদের চোখের সামনে থেকেই উখাও হয়ে গেল।'

নিজেকেই দোষী ভাবতে আরম্ভ করল সে। কারণ দলটার দলপতি সে। অবচেতন ভাবেই রিচার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিল নিজের কাঁধে। মনে হতে লাগল দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে পারেনি সে।

‘প্রথমে গেল রোজার, তারপর জুন, তারপর ডক, এখন গেল রিচা,’ বিড়বিড় করল রবিন। ‘হচ্ছে কি বলো তো?’

‘কিন্তু এরকম একটা জায়গা থেকে যায় কি করে?’ অন্য তিনজনের মতই মূসা ও হতবাক হয়ে গেছে।

কিন্তু চুপ করে বসে রইল না ওরা। খাঁজতে শুরু করল। ছেট্ট সৈকত আর ওখানকার সমস্ত পাথরের আড়াল, গলিয়ুপচি কিছুই বাদ দিল না। রাফিকে দিয়ে গন্ধ শুর্কিয়ে শুর্কিয়েও খোঁজাল। কিন্তু কোন চিহ্নই পেল না রিচার। বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন।

এই খবর শনে প্রায় অসুস্থই হয়ে পড়ল টমাস। স্তন্ধুহয়ে গেল রলি বিংহ্যাম।

কিন্তু তাদেরকে স্তন্ধু হয়ে থাকার সুযোগ বেশিক্ষণ দিল না কিশোর। টমাসকে অনুরোধ করল তাড়াতাড়ি ইসপেষ্টর স্থিতকে ফোন করার জন্যে।

খবর পেয়ে বিদ্যুত্ত্ব দেরি করলেন না ইসপেষ্টর। ছুটতে ছুটতে এলেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন সেই জায়গাটায়, যেখান থেকে নির্বাজ হয়েছে রিচা। গত কয়দিনে চার চারজন লোক নির্বাজ হয়েছে তাঁর এলাকা থেকে, অর্থ তিনি কিছুই করতে পারছেন না, ব্যাপারটা পীড়া দিতে লাগল তাঁকে। মনে হতে লাগল, সব তাঁর অক্ষমতা। তাঁর নাকের ডগা থেকে তাঁকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে লোকগুলোকে তুলে নিয়ে গেল কিডন্যাপাররা, কিছু করতে পারলেন না তিনি, তেবে নিজের ওপরই রাগ হতে লাগল।

একই ভাবে কিশোরেও রাগ হচ্ছে নিজের ওপর।

সঙ্গে করে আরও লোক নিয়ে এসেছেন ইসপেষ্টর। সামান্যতম সূত্রের খোঁজে ছেট্ট সৈকতটা চষে ফেলতে শুরু করল ওরা। এই সুযোগে ছেলেমেয়েদের মুখে পূরো ঘটনাটা আরেকবার শুনতে বসলেন তিনি।

‘কি আর বলব?’ কিশোর বলল, ‘ভাবতেই পারিনি এমন কিছু ঘটে যাবে। সাঁতার কেটে উঠে রিচা ওই পাথরটার আড়ালে চলে গেল কাপড় বদলাতে। জিনা গেল ওদিকটায়। আমি, মুসা আর রবিন শয়ে পড়লাম। অনেক পরিশ্রম করেছিলাম তো, মনে হয় তন্দ্রাই এসে গিয়েছিল। নইলে জানলাম না কেন কিছু? কি করে উধা ও হলো আন্দাজই করতে পারছি না।’

আন্দাজ কেউই করতে পারল না। পুলিশেরা ও খুঁজে খুঁজে হয়রান। কিছু বের করতে পারল না।

ইসপেষ্টর বললেন, ‘ব্যাটারা জানল কি করে এই সময় এই নির্জন সৈকতে সাঁতার কাটতে আসবে তোমরা?’

কেউ ভবাব দিতে পারল না।

সেদিন বিকেলে হোটেলের ঘরে বসে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা চালাল ওরা। বেলকনির দিকের দরজাটা খোলা। সূর্য তখনও অন্ত যায়নি। আবহাওয়া গরম।

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল জিনা, 'কিছু একটা করা উচিত আমাদের। আর
সহ্য হচ্ছে না।'

'কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলব,' মুসাও রেংগে গেল। 'ওরা কিডন্যাপ করছে,
আমরাও করব। ধরে নিয়ে আসব মলিকে। আটকে রেখে কথা বলতে বাধা
করব।'

'গাধার মত কথা বোলো না,' কিশোর বলল। 'কোথায় আটকে রাখবে?
কথাই বা বলাবে কি করবে? টর্চার করতে পারবে? বেরিয়ে গিয়ে পুলিশকে বলে
দিলে আমাদেরকেই ধরে নিয়ে গিয়ে তখন গারদে ভরবে পুলিশ, কিডন্যাপিঙ্গের
দায়ে। ওভাবে হবে না। সৃত দরকার আমাদের। এমন কিছু, যা দিয়ে
কিডন্যাপারদের শিষ্ট নিতে পারি।'

'কিন্তু সৃত পাব কোথায়?' হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রবিন। 'খুঁজে খুঁজে
হন্যে হয়ে গেলাম। পুলিশও কি কম চেষ্টা করছে? কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ
কিছু দেখেছে কিনা জিজেস যে করব, তারও উপায় নেই। কেউ ছিল না সৈকতে।'

'কি করবে জানছ? কেউ না এলে রিচাকে নিল কিভাবে? নিচয় এসে ঘাপটি
মেরে বসে ছিল পাথরের আড়ালে। সুযোগ পাওয়া মাত্র ধরে নিয়ে গেছে।'

'রিচা চিংকার করল না কেন?' মুসা প্রশ্ন।

'চিংকার করার উপায় রাখেনি, তাই। পেছন থেকে আচমকা ঝাপিয়ে পড়েই
মুখ চেপে ধরেছে। তারপর মুখে রুমাল-টুমাল কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে। সিনেমায়
দেখোনি কিভাবে কিডন্যাপ করে?'

কি যেন ভাবছে জিনা। মুখ তুলে বলল, 'শোনো, একটা কথা তোমাদের
আগেই বলা উচিত ছিল। ইটগোলে তখন ভুলে গিয়েছিলাম। একটা সৃত আমি দিতে
পারি। ভুল দেখেছি বলে আবার হেসে উড়িয়ে দিয়ো না...'

অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর। 'আহা, অত ভণিতা না করে বলই না কি
পেয়েছ? হাসব কেন?'

কি সৃত পেয়েছে শোনার জন্যে আগ্রহে সামনে গলা বাড়িয়ে দিল রবিন আর
মুসা।

'রিচার কিডন্যাপিঙ্গের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানি না,' জিনা
বলল। 'সাঁতরাতে সাঁতরাতে একটা বড় পাথরের ওপাশে চলে গিয়েছিলাম, মনে
আছে?'

'আছে! অত সাক্ষি-প্রমাণ লাগবে না। কি দেখেছ বলে ফেলো।'

'জনি বিয়াওয়ার ইয়েট ফ্লাইং অ্যাঞ্জেল। খুব আস্তে আস্তে চলছিল জাহাজটা।'

'খাইছে!' চমকে গেল মুসা।

পিঠ সোজা হয়ে গেছে কিশোরে। চোখ চকচক করছে। 'সত্তি বলছ? আমি
তো কিছু দেখিনি! অবশ্য যাইওনি ওদিকটায়...'

'তুমি তো তীব থেকেই সরোনি,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'পাথরের অন্যপাশ
দিয়ে জাহাজটা গেলে তোমার দেখার কথাও নয়। আমিও ছিলাম তোমার সঙ্গে
তুমি দেখলে আমিও দেখতাম।'

তুড়ি বাজান মুসা। 'মনে হয় আমিও দেখেছি! ভাল করে খেয়াল করিনি, নইলে

চিনতে পারতাম। তবে একটা জাহাজের পেছনটা দেখেছি, মনে পড়ছে এখন।'

চূপ হয়ে গেল সবাই। তাবছে। তাহলে এই ব্যাপার। ওরা যখন পানিতে দাপাদাপি করছে ওই সময় আমেরিকান জাহাজটা চলছিল উপকূল ধরে। বিয়াও নিজে অথবা তার কোন লোক চোখে দূরবীন লাশিয়ে দেখছিল ওদেরকে। তারপর এসে...

জনি বিয়াওর ওপর কিশোরের সন্দেহ জোরাল হলো আরও। ইসপেষ্টেরকে কথাটা জানানো উচিত, কিন্তু জানাতে ইচ্ছে করল না। আবারও মুখের ওপর হাসবেন তিনি। হেসে উড়িয়ে দেবেন। নাহ, আর ঠাকে বলতে যাবে না। যা করার নিজেরাই করবে।

'শোনো,' বলল সে, 'রিচা নিখোঁজ হওয়ার একটু আগে ইয়ট দেখা যাওয়াটা একটা সাংঘাতিক সূত্র। আরও জোর দিয়ে বলতে পারছি এখন, কিডন্যাপিংগুলোর পেছনে বিয়াওর হাত আছে।'

'কিন্তু কেন করেছে?' মুসা জিজেস করল।

'সেটা জানলে তো রহস্যটা আর রহস্য থাকত না। তবে অঙ্ককারে আলোর সূক্ষ্ম একটা রেখা চোখে পড়ছে আবছাতাবে।'

'কিন্তু মুক্তিপেনের টাকা চেয়ে একটা মেসেজও তো এল না এখনও,' রবিন বলল।

'আসেনি, তার কারণ বিয়াওর টাকার দরকার নেই। অন্য কোন কারণে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কি কারণ, সেটাই এখন আমাদের জানা দরকার।'

'কি ভাবে?'

'আমি বলি,' হাত তুলল জিনা। 'আজ রাতে আবার যা তার জাহাজে।'

'গেলেই উঠতে দিল আরকি, হাহ,' মুসা মাথা ঝাঁকাল তাছিলোর ভঙ্গিতে।

'বলেকয়ে উঠতে গেলে কি আর উঠতে দেবে। চুরি করে উঠব। কিডন্যাপিঙ্গে বিয়াওর হাত যদি থাকেই হয়তো লোকগুলোকে নিয়ে গিয়ে তার জাহাজেই আটকে রেখেছে। আমি বলি কি, রাতের অঙ্ককারে চুপি চুপি গিয়ে জাহাজে উঠে পড়ব। জাহাজটা দূরে না থেকে ঘাটে নোঙ্র করা থাকলে সাতরে গিয়ে উঠতেও কোন অসুবিধে নেই। তারপর পুরো জাহাজে তল্লাশ চালিয়ে দেখে আসব হারানো মানুষগুলো আছে কিনা। একজনও যদি থেকে থাকে, তাহলেই হয়ে গেল। গিয়ে বলব ইসপেষ্টেরকে।'

'পাগল আরকি। খুঁজে দেখবে। যেন জাহাজে লোক নেই। এমনিতেই অত বড় জাহাজে লোকের ছড়াচূড়ি থাকে। আর বিয়াও যদি অপরাধী হয়ে থাকে তাহলে তো কথাই নেই। কড়া পাহারার ব্যবস্থা করবে।'

চূপ হয়ে গেল জিনা। রেগে গেল মুসার ওপর। ভাবল, কাজটা আমি করেই ছাড়ব। ভাল গোয়েন্দা বলে খুব অহঙ্কার তোমাদের। বেশ, আমিও কি করতে পারি দেখিয়ে দেব। মনে মনেই রাখল ইচ্ছেটা, প্রকাশ করল না।

কিশোর বলল, 'জাহাজটায় উঠে খুঁজতে পারলে খুবই ভাল হত। কিন্তু ওভাবে চুরি করে উঠতে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক। ভাবতে হবে। আর কোন উপায় বের

করতে পারি ভাল। না পারলে চুরি করেই উঠতে হবে। তবে আভকে না। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দেখি, ইতিমধ্যে মুক্তিপ্রণের খবর আসে কিনা।'

কিন্তু আগামী দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নয় জিন। মুসা তাকে রাগিয়ে না দিলে হয়তো কিশোরের কথা শুন্ত। এখন ঠিক করেছে, শুনবে না। রাতের অপেক্ষায় রইল।

অ্যাচিত ভাবেই একটা সুবিধে পেয়ে গেল সে। হঠাতে করে সেদিনই সন্ধ্যায় তার আরো-আম্বা লঙ্ঘনে চলে গেলেন। ওখানে আরেকটা বিশেষ সম্প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। কয়েক দিন থাকবেন তাঁরা। ছেলেমেয়েদেরকে সাউথবুনেই রেখে গেলেন। ফলে আর কোন ভয়ই রইল না জিনার। বাধা দেয়ার কেউ নেই। রাতবিরেতে কোথায় গেল না গেল তার জন্যেও কৈফিয়ত দিতে হবে না।

রাত হলো। সারাদিন অনেক পরিশ্রম গেছে। কাজেই বেশিক্ষণ জেগে রইল না গোয়েন্দারা, কেবল জিনা ছাড়া। তিনি গোয়েন্দা ধূমিয়ে পড়ার পরেও আরও আধঘণ্টা নিজের ঘরে অঙ্ককারে শয়ে রইল সে। তারপর উঠল। রাফিকে নিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে। মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে চলল। বিয়ওয়ার জাহাজটা যেন ঘাটেই বাঁধা থাকে।

প্রথমবার যেখানে ছিল তার চেয়ে খানিক দূরে নোঙ্র করা আছে জাহাজটা। কাছাকাছি আর কোন জাহাজ বা বোট নেই। ভালই হলো, ভাবল সে। সাঁতরে যাওয়ার সময় কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় কম।

জেটির কাছ থেকে খানিকটা দূরে চলে এল জিন। পানিকে তার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। এখান থেকে সাঁতরে চলে যাওয়াটা কোন ব্যাপারই না। ঠাদের আলোয় ভৃতুড়ে লাগছে ইয়েটার আবছা অবয়ব। পার্টির সময় যেমন আলোয় আলোয় ঝলমল করছিল তেমন নয়। অঙ্ককার করে রাখা হয়েছে। এটাও ভাল হয়েছে তার জন্যে। আলো থাকলে নজরে পড়ে যাওয়ার স্থানা বেশি থাকত।

বাদিং সূচু পরেই এসেছে সে। তার ওপর চাপিয়েছে টি-শার্ট আর প্যান্ট। অঙ্ককার মত একটা জায়গায় এসে শার্ট-প্যান্ট ঝুলে রাখল। রাফিকে সেগুলো পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে, তার না ফেরা পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকতে বলে এগোল পানির দিকে। নিঃশব্দে নেমে পড়ল কালো পানিতে।

দশ

সাগর শাস্তি। ঢেউ নেই। সাঁতরে জাহাজের কাছে পৌছতে অসুবিধে হলো না জিনার। তবে কঠিন কাজটা হবে ওপরে ওঠা। কি করে উঠবে? আগেই ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু ভাবেনি যখন কি আর করা। অন্য কোন ভাবে চেষ্টা করে দেখতে হবে। অনেক সময় রেলিং থেকে দড়ি ঝুলে থাকে। ওরকম কিছু একটা পেয়ে গেলে বেয়ে উঠতে অসুবিধে হবে না।

দড়ির আশায় নিঃশব্দে জাহাজ ঘিরে চক্র দিতে শুরু করল সে। দড়ি পেল না, তবে পেছন দিকে নিচু হয়ে থাকা খোলের এক জায়গায় খাঁজ দেখতে পেল, যেখান

দিয়ে গঠা সম্ব হতে পারে।

কাজটা মোটেও সহজ নয়। অনেক কষ্টে হাত-পায়ের আঙুল বাধিয়ে বাধিয়ে ওপরে উঠতে পারল অবশ্যে। পরিশমে হাঁপাচ্ছে। ওখানেই ডেকের ওপর বসে পড়ল জিরিয়ে নেয়ার জন্যে।

নিখর হয়ে বসে আছে তো। কান পেতে রেখেছে। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। জাহাজের সবাই বোধহয় ঘূরিয়ে পড়েছে। জিরানো হয়ে গেলে উঠে পড়ল দে। পা টিপে টিপে এগোল। নির্জন ডেক। একজন প্রহরীও চোখে পড়ল না। না না, আছে। ওই তো গলুইয়ের দিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা ছায়ামূর্তি।

আড়াল নেয়ার জন্যে এদিক ওদিক তাকাল জিন। তেমন কোন জায়গা নেই। আর কোন উপায় না দেখে একটা মই বেয়ে নেমে এল নিচে। বেড়ালের মত নিঃশব্দে এগিয়ে চলল প্যাসেজ ধরে। প্রতিটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল ভেতরে কেউ জেগে আছে কিনা। ঠিক কি খুঁজতে এসেছে জানে না। তবে তার অনুভূতি বলছে, মন্দ্যাবান কোন না কোন সূত্রপেয়ে যাবেই এখানে।

পার্টিতে যেদিন এসেছিল, সেদিন ঘুরে ঘুরে দেখেছিল জাহাজটা। সেই অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগল এখন। কোথায় কি আছে না আছে না জানা থাকলে এভাবে শক্ত এলাকায় ঘোরার সাহস পেত না।

বিয়াঙ্গার স্টাডির কাছে চলে এল। তার ধারণা এখানে কিছু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভেতরে কেউ নেই তো? কান পাতল দরজার গায়ে। কোন শব্দ নেই। আস্তে করে ঠেলা দিয়ে সামান্য ফাঁক করল পাল্লা। আবছা অন্ধকার ঘর। মৃদু একটা আলো জুলছে। একবার দ্বিধা করে চুকে পড়ল ভেতরে। চুকতে না চুকতেই বাইরের প্যাসেজে কথা শোনা গেল। দূজন মানুষ আসছে এদিকেই।

হাটবীট দ্রুত হয়ে গেল তার। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। লুকানোর জায়গা খুঁজছে। বড় একট সোফা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। অগ্রত্যা ওটার পেছনেই গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

এগিয়ে আসছে কষ্টস্বর। কেবিনের দরজা খুলন। আবার বক্ষ হলো। দুই জোড়া পা চোখে পড়ল জিনার। একজোড়া পুরুষের, একজোড়া মহিলার। লোকটা বিয়াঙ্গ। আর মহিলার কষ্ট মলির মত লাগল। আশ্চর্য! এত রাতে আমেরিকান কোটিপ্রিতির ইয়টে কি করছে সে? ভাগ্যটা ভালই মনে হচ্ছে জিনার। এতদিন পর মনে হয় রহস্যের জট খুলতে চলেছে নিভাস্ত কাকতালীয়ভাবেই।

‘গলাটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।’ দুটো গেলাসে তরল কিছু ঢালল বিয়াঙ্গ। একটা গেলাস মলিকে দিয়ে বলল, ‘না ও, আরাম করে বসো।’ মলির পাশে নিজেও সোফায় বসে বলল, ‘তারপর, আমার লেটেন্ট কাজের খবর শুনেছ তো?’

‘শুনেছি। কিন্তু বেশি রিক্ষ নিয়ে ফেলেছিলে। অঘের জন্যে পার পেয়েছে।’

বিয়াঙ্গকে তুমি তুমি করে বলতে শুনে আরও অবাক হলো জিন।

‘তা ঠিকই বলেছ,’ হাসল লোকটা। ‘শনলাম ডকের বৌ সাউথবুর্নে এসেছে। এক ফাঁকে গিয়ে লুকিয়ে দেখে তাকে চিনেও এলাম। কি করে তার কাছাকাছি

হওয়া যায় ভাবতে লাগলাম। সুযোগটা এসে গেল আপনাআপনি। সাগরের তীরে জাহাজ নিয়ে ঘূরছিলাম। দূরবীন দিয়ে দেখতে দেখতে চলেছি। হঠাৎ দেখি, পানিতে দাপাদাপি করছে ওই বিছু ছেলেমেয়েগুলো।'

প্রায় দম বন্ধ করে শুনছে জিনা। যাক, ভাগ্য এতদিনে প্রসন্ন হতে চলেছে। দুভাবে লাভবান হতে যাচ্ছে সে। এক, এই নির্বোজ রহস্যের সমাধান। দুই, তিন সোয়েন্দার ওপর টেক্কা দেয়া। অবশ্যই যদি ধরা না পড়ে নিরাপদে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

বিয়াঙ্গ বলছে, 'ওদের সঙ্গে ডকের বৌকেও দেখলাম। মনে হলো এইই সুযোগ। নৌকায় করে পিটারকে পাঠিয়ে দিলাম তীরে। কয়েকটা পাখরের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে বসে রইল সে। সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। সুযোগ পেয়ে আর দেরি করল না। ছেলেমেয়েগুলোর কাছ থেকে আলাদা হয়ে পাখরের আড়ালে কাপড় বদলাতে যেই গেল ডকের বৌ, পা টিপে টিপে পেছন থেকে গিয়ে তার মুখ চেপে ধরল পিটার। সহজেই সারা হয়ে গেল কাজ। টুঁ শব্দ করতে পারল না বেটি। ওর মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে এসে নৌকায় তুলল পিটার।'

জিনা ভাবছে, কিশোরের সন্দেহই তাহলে ঠিক। ভদ্রলোকবেশী কোটিপতি বিয়াঙ্গই তাহলে এই কিডন্যাপিঙ রহস্যের হোতা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

'অল্পের জন্যে বেঁচেছে,' মলি বলল। 'এই রিক্ষ নেয়া উচিত হয়নি। মেয়েটা চিৎকার করে উঠতে পারত। একা ওকে সামলাতে না-ও পারত পিটার। ছেলেমেয়েগুলোর কেউ চলে আসতে পারত। অনেক কিছুই ঘটতে পারত।'

'ঘটেনি যখন আর কি। তবে ঠিকই বলেছ, কাজটা করা উচিত হয়নি। বোজার আর জুনের ব্যাপারটা ছিল আলাদা। হেঁটে এসে চুকে পড়েছিল আমার শহায়...'

'তাহলে এখন তো আর কোন বাধা নিচ্য নেই,' জুন বলল। 'সব কটাকেই আটকালে। পুরো সম্পত্তি তোমার হয়ে যাচ্ছে।' একটা মৃহৃত চূপ করে রইল মলি। 'তো, আমাদের বিয়েটা কবে হচ্ছে?'

হাসল বিয়াঙ্গ। 'খুব শীঘ্ৰ। দলিল আমার নামে হয়ে গেলেই, ব্যস। আর কোন বাধা নেই।'

এই তাহলে ব্যাপার! মলির বস্ত তাহলে এই বিয়াঙ্গই। তার নির্দেশেই সমস্ত কাজ করেছে মলি আর পিটার।

মদ খাওয়া শেষ হলো দুজনের। গেলাস দুটো নিয়ে গিয়ে টেবিলে নামিয়ে রাখল বিয়াঙ্গ। আরও কয়েক মিনিট কথা বলল ওরা। তারপর উঠে বেরিয়ে গেল।

জিনা বুঝল, মদ খাওয়ার জন্যেই এখানে চুকেছিল দুজনে। ওরা বেরোনোর আগে নিজেদের আলোচনা থেকেই আরেকটা তথ্য জানিয়ে দিয়ে গেল, ডকের ওপর কাঠের পাথরটা ফেলেছিল মলি। সবার অলঙ্ক সে-ই ঠেলে দিয়েছিল ওটা।

মলি আর বিয়াঙ্গ বেরিয়ে যাওয়ার পর আরও মিনিট পাঁচেক একই ভাবে পড়ে রইল জিনা। তারপর বেরোল সোফার পেছন থেকে। ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোর ধরে

এগোল পা টিপে টিপে। পথে কারও সামনে আর পড়তে হলো না। নিরাপদেই চলে এল জাহাজের পেছন দিকে, যেখান দিয়ে উঠেছিল। প্রায় নিঃশব্দে নেমে পড়ল পানিতে। উঠতে কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু নামাটা সহজ।

ডেকে কেউ নেই। কারও চোখে পড়ারও স্থাবনা নেই। দ্রুত সাঁতের চলল।

তার জন্যে উদ্ধীর হয়ে বসে আছে রাফি। সাড়া পেয়েই ছুটে এল। মাথা চাপড়ে তাকে আদর করল জিনা। তেজা বাদিং সুটের ওপরই চাপাল শার্ট আর প্যান্ট।

হোটেলে ফিরে কাপড় বদলে নিল জিনা। তারপর এসে দাঁড়াল ছেলেদের ঘরের সামনে। দরজায় থাবা দিয়ে বলল, ‘অ্যাই, জলন্দি ওঠো।’

‘কি হলো, কি হলো,’ বলে ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

‘জরুরী খবর আছে। জলন্দি দরজা খোলো।’

দরজা খুলে দিল মুসা। কিশোর আর রবিনও জেগে গেছে।

রাফিকে নিয়ে ঘরে ঢকল জিনা। সব কথা খুলে বলল।

‘কাজটা ঠিক করোনি, জিনা,’ গভীর হয়ে বলল রবিন। ‘ধরা পড়লে কি হত ডেবেছ?’

মুসা বলল, ‘আমাকে অন্তত নিয়ে যেতে পারতে।’

‘তা পারতাম। তবে বিপদে তো আর পড়িনি। একটা কাজের কাজও করে এসেছি সেটাও নিশ্চয় স্থীকার করবে?’

‘করেছ, তবে অনেক বড় ঝুঁকি নিয়ে,’ কিশোর বলল। ‘যাকগে, যা হবার হয়েছে। ভবিষ্যতে এমন কিছু আর করতে যেও না।’ এক মুহূর্ত চূপ করে থেকে বলল, ‘বিয়াগুর ওপর আগেই সন্দেহ হয়েছিল আমার। এখন শিওর হওয়া গেল। কিন্তু আপারকে তো চিনলাম, এখন জানতে হবে কেন একাজ করল সে।’

‘সম্পত্তির কথা বলেছিল...’

‘হঁ,’ মাথা দোলাল কিশোর। ‘কি সম্পত্তি, কার সম্পত্তি; এখন সেটাই জানতে হবে।’

‘জানাটা কঠিন হবে না,’ মুসা বলল। ‘পুলিশে ধরে ভালমত চাপ দিলেই বেরিয়ে পড়বে।’

‘কিন্তু পুলিশকে আমরা বললে বিশ্বাস করবে?’ রবিনের প্রশ্ন।

‘না করাটাই স্বাভাবিক,’ কিশোর বলল। ‘আবার করতেও পারে।’

‘আমার মনে হয় বড় মানুষ কাউকে নিয়ে যাওয়া উচিত।’

‘কাকে?’ ভুরু নাচাল মুসা। ‘আংকেলও তো নেই...’

‘ট্যামসকে গিয়ে বলতে পারি আমরা। সে বিশ্বাস করলে ইসপেক্টরকে বিশ্বাস করাতে পারবে।’

‘চলো তাহলে এক্ষুণি,’ তর সইছে না আর মুসার।

‘এতরাতে যাওয়ার দরকার নেই। কাল সকালে গেলেও চলবে।’

দশ

পরদিন সকাল সকালই স্টুডিওতে চলে এল গোয়েন্দারা। কিন্তু ভীষণ ব্যস্ত টমাস। লোকজনের সামনে তাকে কিছু বলা গেল না। সুযোগের অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল ওরা। সেটা লক্ষ করল পরিচালক। কি ব্যাপার জিজেস করুন। তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল কিশোর।

সব শুনে তো টমাস থ। বিশ্বাসই করতে পারছে না। ওদের কথা অবিশ্বাসও করতে পারল না। কারণ ওদেরই একটা অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী নিয়ে ছবি তৈরি করছে। বিমৃঢ় কঠে বলল, ‘জনি বিয়াও এই কাণ করল? কিন্তু কেন? টাকার টো তার অভাব নেই? যাই হোক, আমাকে বলে ভাল করেছ। আমার মন্ত ক্ষতি করেছে সে। তাকে আমি ছাড়ব না। চার-চারজন লোককে নিয়ে আটকে রেখেছে। চলো, এখনি যাব ইসপেন্টের কাছে।’

শুটিং তখনকার মত বন্ধ রেখে গোয়েন্দাদের নিয়ে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এল সে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই থানার দিকে ছুটল তার শক্তিশালী ইঞ্জিনওয়ালা গাড়ি। দল বেধে ওরা থানায় ঢোকার সময় অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

কিন্তু অফিসে চুকে জানা গেল, হঠাৎ করে ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ইসপেন্টের শ্বিথ। তার জ্বায়গায় কাজ চালাচ্ছে একজন জুনিয়র অফিসার। অতিমাত্রায় ব্যস্ত। তাছাড়া কিডন্যাপিঙ্গের মত নাজুক ব্যাপারে নাক গলাতেও সে রাজি নয়।

শুনেটুনে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে বলল, ‘কয়েকটা ছেলেমেয়ের কথায় কান দিয়ে লাফানোর সময় আমার নেই।’

জিনার গাল লাল হয়ে গেল। টমাসও বিরক্ত হলো। অফিসারকে বোরানোর চেষ্টা করল, এর আঁচোও এধরনের কাজ ওরা করেছে। অনেক পুলিশ অফিসারেরই বিশ্বাস আছে ওদের ওপর। ওদের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু লাভ হলো না। একে তো কিডন্যাপিঙ্গ, তার ওপর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে সে সাধারণ লোক নয়। অনেক বড় ধনী। তায় আবার বিদেশী।

‘সবই বুঝলাম, মিস্টার টমাস,’ বলল সে। ‘কিন্তু আপনি নিজেকে আমার জ্বায়গায় বিসয়ে একবার ভাবুন। আমি ইসপেন্টের শ্বিথের জ্বায়গায় কাজ করছি কয়েকদিনের জন্যে। এই থানার ইনচার্জ আমি নই। এই অবস্থায় আমার ক্ষমতা কতখানি বুঝতেই পারছেন। ভুল করলে মাপ করা হবে না আমাকে। তা-ও যদি সাধারণ লোকটোক হত এক কথা ছিল। ইটাবন্যাশনাল ইস্যু হয়ে যাবে এটা। সরি, শুধু একটা মেয়ের মুখের কথার ভরসায় জনি বিয়াওর মত লোকের বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে পারব না।’

রেংগেমেগে মুখ খুলতে যাচ্ছিল জিনা, তার আগেই ফেটে পড়ল মুসা, ‘দেখুন, স্নার, আর যাই করি, থানায় মিথ্যে কথা বলতে আসব না! মিথ্যুক নই আমরা! আপনি কার পক্ষে সাফাই গাইছেন? একটা কিডন্যাপারের। যে চারজন মানুষকে

তুলে নিয়ে গেছে। তাদেরকে ছাড়িয়ে আনা আপনার দায়িত্ব।'

'দেখো ছেলে,' অফিসারও রেগে গেল, 'আমাকে দায়িত্ব শেখাতে এসো না। তোমার যা বয়েস, আমার চাকরির সেই বয়েস। যা ও এখন। আমাকে কাজ করতে দাও।'

আর কিছু করার নেই। লোকটাকে বোঝানো যাবে না। গোয়েন্দাদের নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল টমাস।

ওদেরই মত যেন হতাশ হয়েছে রাফিও। কান ঝুলে পড়েছে, লেজ চুকে গেছে দু-পায়ের ফাঁকে। অন্য সময় হলে সবাই হাসাহাসি করত তার এই ভঙ্গ দেখে। কিন্তু এখন হাসার মেজাজ নেই কারও।

থানা থেকে বেরিয়েই ফেটে পড়ল জিনা, 'ওরকম হাঁদা বলেই প্রমোশন হয় না ব্যাটার। আবার বলে কিনা তোমার যা বয়েস আমার চাকরির সেই বয়েস। হ্রহ! মুখ ডেঙচে বলল, 'শুধু একটা মেয়ের কথায় কিছু করতে পারব না! কার কথায় পারবি, ব্যাটা বেকুব কোথাকার!'

'থাক জিনা,' শাস্তিকষ্টে বলল কিশোর, 'গালাগাল করার দরকার কি? কথাটা তো ঠিকই বলেছে। তার জায়গায় আমাদের যে কেউ হলেও এইই করতাম। জনি বিয়াগার মত একজন লোককে ঘাটাতে হলে আঁটঘাট না বেঁধে স্কুব নয়।'

'ইসপেঞ্চের শ্বিথ থাকলে অবশ্য এ-ব্যাপারটা ঘটত না,' মুসা বলল। 'তিনি কিছু করার চেষ্টা করতেন।'

'নেই যখন কি আর করা,' রবিন বলল।

সবাই রেগে রেগে কথা বলছে। রাফির মনে হলো গরম হয়ে তারও কিছু বলা উচিত। বলল 'হ্রহ! হ্রহ!'

'এই চূপ থাক!' ধরক লাগাল জিনা। মেজাজ ভাল নেই। এখন এসব রাসিকতা পছন্দ হচ্ছে না।

নজ্জা পেয়েই যেন কাঁচুমাচু হয়ে গেল বেচারি রাফি।

'শোনো,' কিশোরের কথারই প্রতিধ্বনি করল টমাস, 'অফিসার একেবারে ভুল বলেনি। প্রমাণ ছাড়া পুলিশও কিছু করতে পারে না। তবু, ইসপেঞ্চের আসুন, বলে দেখি। তিনি হয়তো কিছু করতে পারবেন।'

কিন্তু অত সময় চুপচাপ অপেক্ষা করার ধৈর্য গোয়েন্দাদের নেই। স্টুডিওতে ফিরে বিশ্বামৈর সময় আলোচনায় বসল ওরা। সবার সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল কিশোর, পুলিশের সাহায্য ছাড়াই কিডন্যাপ হওয়া মানুষগুলোকে উদ্ধারের চেষ্টা করবে ওরা। রাতের বেলা অভিযান চালাবে ফ্রাইং অ্যাঞ্জেলে।

সেদিন শুটিঙ্গের পর সোজা বন্দরে চলে এল ওরা। আংকেল-আন্টি নেই, কৈফিয়তেরই ঝামেলা নেই, তাই হোটেলে যাওয়া লাগল না। বন্দরে এসে ছোট একটা দাঢ়চানা নৌকা ভাড়া করল।

'মাঝারাতের আগে যাওয়াটা উচিত হবে না,' কিশোর বলল।

'এখনও তো অনেক দেরি,' মুসা বলল। 'তেক্ষণ কি করব তাহলে?'

'চলো ঘূরি। আর তো কিছু করার দেরি না।'

'তার চেয়ে চলো, হোটেলে গিয়ে জিবিয়ে নিই,' জিনা বলল। 'নৌকা তো

হলোই । সময়মত এসে নিয়ে যাব ।'

'তা মন্দ বলোনি ।' মাথা বাঁকাল কিশোর, 'ঠিক আছে । চলো ।'

রাত এগারোটায় আবার বন্দরে ফিরে এল ওরা । নৌকাটা খুলে নিয়ে দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চলল । কিশোর আর মুসা দাঁড় বাইছে । জিনা ধরেছে হাল । অন্ধকার রাত । তবে তারার আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ফ্লাইং অ্যাঞ্জেলের আবহা অবয়ব ।

কালো বিরাট ছায়াটার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে নৌকা ।

জাহাজের কাছে এসে কোন জায়গায় নৌকা বাঁধতে হবে দেখিয়ে দিল জিনা । পেছনের সেই জায়গাটায় চলে এল, যেখান দিয়ে আগের দিন ইয়টে উঠেছিল ।

'রবিন,' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর, 'তুমি আর রাফি থাকো । পাহারা দাও । সন্দেহজনক কিছু দেখলে শিস দেবে ।'

মাথা বাঁকাল রবিন । যদিও সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তার । কিন্তু এসব অভিযানে দলপতির আদেশ মানতে হয়, নইলে বিপদ বাড়ে ।

কোনখান দিয়ে উঠতে হবে দেখিয়ে দিল জিনা । পানি থেকে উঠতে খুব কষ্ট হয়েছিল তার । নৌকা থেকে উঠতে অতটা হলো না । একের পর এক ডেকে উঠে এল ওরা । পথ দেখাল জিনা ।

জুতো খুলে নৌকায় রেখে খালিপায়ে এসেছে । ফলে হাঁটার সময় একটুও শব্দ হলো না ।

নৌকায় বসে কড়া নজর রাখছে রবিন । টান টান হয়ে আছে স্নায় । রাফির কানে কানে বলল, 'দেখ, একটা শব্দও করবি না । যা-ই ঘটে ঘটুক, আমি না বললে তুই কিছু করতে যাবি না । খবরদার বলে দিলাম ।'

কি বুল রাফি সে-ই জানে, তবে চুপ করে রইল । শব্দ করল না । কিন্তু শব্দটা এল অন্য জায়গা থেকে । বিচিত্র একটা ফড়ফড় শব্দ । চমকে গেল রবিন । টের পেল শক্ত হয়ে গেছে রাফি ।

আবার হলো শব্দটা । কোনখান থেকে আসছে বুঝতে পারল না রবিন । অন্ধকার সাগরের দিকে তাকাল । কিছুই চোখে পড়ল না ।

তৃতীয়বার শব্দ হলো । এবার একটু অন্যরকম । নথের আঁচড়ের শব্দের মত । ঘাট করে ওপর দিকে মাথা তুলন রবিন । অন্ধকারে নড়ে উঠল কি যেন । বুঝে ফেলল সে । পোর্টহোলে বসে আছে একটা সী-গাল । জেগে গেছে পাখিটা । কোন কিছু বিরক্ত করেছে ওকে । কিশোরবাই হবে হয়তো ।

'চুপ, রাফি! ডাকাডাকি করবি না । বেশি পা সুড়সুড় করলে কাল দিনের বেলা সৈকতে যত খুশি সী-গাল তাড়াস । এখন চুপ ।'

চুপই রইল রাফি । শব্দ করল না ।

এগারো

কোন মড়াচড়া চোখে পড়ল না । কিন্তু জিনা জানে প্রহরী একজন আছে গলুইয়ের অভিনয়

কাছটায়। সেকথা বলল মুসা আর কিশোরকে। এমনিতেই সাবধান ছিল, আরও সাবধান হলো ওরা।

হঠাৎ সূভ্রসূভ্র করতে লাগল মুসার নাকের ভেতর। হাঁচি আসছে। আপ্পারে, মরেছি, ভাবল সে। এই হাঁচি আসিস না, আসিস না! এই নীরবতার মধ্যে হাঁচি দিলে কামানের আওয়াজের মত ফাটোবে।

দুই আঙুলে নাকের ফুটো টিপে ধরল সে। নাত হলো না। হাঁচিটা বেরিয়েই গেল। এবং আন্তে বেরোল না। বিকট শব্দ।

তবে ভাগ্যটা ভাল ওর। ঠিক ওই মুহূর্তে ওদের কাছেই খুব জোরে একটা দরজা লাগানোর শব্দ হলো। তাতে ঢাকা পড়ে গেল হাঁচির শব্দ।

ডেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। তেরপনের একটা বড় বাণিলের মধ্যে ডাইভ দিয়ে পড়ল তিনজনেই। চোখে অঙ্ককার সয়ে এসেছে। জনি বিয়াওকে চিনতে পারল।

রেলিঙের কাছে গিয়ে খুঁকে দাঁড়াল বিয়াও। সাগরের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখও তুলছে না, অন্য কোনদিকেও তাকাচ্ছে না। এই সুযোগে তেরপনের ভেতর থেকে বেরিয়ে ছায়ায় গা ঢেকে চলে এল আবার জাহাজের পেছনে।

সিগারেট ধরাল লোকটা। এখনও চোখ ফেরাচ্ছে না সাগরের দিক থেকে। একমনে সিগারেট টানতে লাগল। অঙ্ককারে ভয়ঙ্কর এক দৈত্যের চোখের মত লাগছে সিগারেটের আগুন।

কিছুক্ষণ টেনে পেঢ়া সিগারেটটা পানিতে ছুঁড়ে ফেলে ঘূরে দাঁড়াল সে। হাঁটতে শুরু করল।

ফিসফিস করে কিশোর বলল, ‘আমি ওর পিছু নিছি। তোমরা ভালমত খোঁজো। জাহাজে থাকলে ওদেরকে বের করা চাই।’

মই বেয়ে নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল বিয়াও। পেছনে নামল কিশোর। এগিয়ে চলল একটা করিডোর ধরে।

জাহাজের বেশির ভাগ আলোই নিভান্নে। যা জুলছে তা-ও অতি সামান্য।

ভালই হলো, ভাবছে সে। বেশি আলো থাকলে ধরা পড়ে যেতাম।

এত রাতে নাবিকেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়। কিন্তু বিয়াও ঘূরে বেড়াচ্ছে কেন? তদারক করছে? নাকি ঘৃম আসছে না? অনিদ্রায় ভুগছে?

আহ, বন্দিদের কাছে যদি যেতে এখন ভাল হত। কিন্তু অতটা আশা করা বোধহয় উচিত হচ্ছে না। যাই হোক, বিয়াওর পিছ ছাড়ল না সে।

একটা মোড়ের ওপাশে হারিয়ে গেল লোকটা।

মোড়ের কাছে প্রায় দৌড়ে এল কিশোর। দেখল, একটা কেবিনের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফাঁক দিয়ে ভেতরে বিছানা চোখে পড়ল তার। বিয়াওর শোবার ঘর। দূর, হলো না। শুতে গেল লোকটা। সারা রাতে আর মনে হয় বেরোবে না। তাদেরকেই এখন খুঁজে বের করতে হবে বন্দিদের। আরেকটা প্যাসেজ ধরে এগোল সে।

কিশোরকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল মুসা আর জিনা। চিন্তাই লাগল। এভাবে লোকটার পিছু নেয়া কি ঠিক হলো কিশোরের? যদি ধরা পড়ে যায়? অবশ্য যা

হবার হয়ে গেছে। এখন আর তৈবে লাভ নেই। ফেরাতে পারবে না কিশোরকে।
‘এসো, পুরো ডেকটায় ঘুরে দেখি,’ মুসার কানে কানে বলল জিনা। ‘চেনা
থাকা ভাল। পরে কাজে লাগতে পারে।’

‘তুমি দেখো। আমি কিশোরের পেছনে যাই। বিপদে পড়লে সাহায্য করতে
পারব।’

‘আমিও আসব নাকি?’

‘না, তুমি এখানেই থাকো। বেশি লোক যাওয়ার দরকার নেই।’

আপত্তি করল না জিনা।

নিঃশেষে মহিয়ের দিকে এগোল মুসা, যেটা দিয়ে নেমে গেছে কিশোর।

অঙ্করারে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে যাওয়ার সময় দিল জিনা। তারপর এগোল।
খুব সতর্ক রইল যাতে প্রহরীর চোখে না পড়ে। সামনের দিকে গলুইয়ের কাছাকাছি
গেল না।

কয়েক মিনিটেই পুরো ডেকটায় ঘোরা হয়ে গেল তার। তেমন কিছু দেখল না
যেটা কাজে লাগতে পারে। কেবল কয়েকটা লাইফবোট আর হ্যাচওয়ে দেখে
এল।

যেখান থেকে শুরু করেছিল আবার সেখানে ফিরে এসে ভাবল অহেতুক
দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে নিচে নেমে যাবে। কিশোররা গেছে পেছনে, সে যাবে
সামনে। কিন্তু সেটা করতে হলে প্রহরীর অনেকে কাছ দিয়ে যেতে হবে। ঝুঁকি হয়ে
যাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতেও ইচ্ছে করছে না। ঝুঁকিটা নেয়াই স্থির করল সে।

পা টিপে টিপে এগোল জিনা। কিন্তু এইবার আর আগের মত সহজে কাজ
সাবলতে পারল না। বসে থাকতে থাকতে বোধহয় বিরক্ত হয়েই উঠে পড়ল
লোকটা। শরীরটৈ একটু খেলিয়ে নেয়ার জন্যে ইঁটতে শুরু করল। এদিকেই
আসছে।

মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল জিনা। আর কোন উপায় না দেখে
একটা লাইফবোট ঢাকা তেরপলের তলায় চুকে পড়ল।

ঠিক তার পাশেই এসে দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। সিগারেট ধরাল।

আটকা পড়ল জিনা। এই বেকায়দা অবস্থায় কতক্ষণ থাকতে হবে জানে না।
লোকটা যতক্ষণ থাকবে এখান থেকে বেরোতে পারবে না সে।

মই বেয়ে ওদিকে একটা প্যাসেজে নামল মুসা। এমাথা ওমাথায় তাকাল।
নির্জন। কিশোরও নেই, কেউ নেই।

‘গেল কোথায়?’ আনমনেই বিড়বিড় করল সে।

মান আলোয় কয়েকটা দরজা চোখে পড়ল কেবল। সব বন্ধ। কোন শব্দ নেই
কোথাও। অতটাই নৌব, নিজের নিঃশ্বাসের শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছে সে। কি
করবে এখন? কেন এসেছে সেটা ভাবল। বন্দিদের খুঁজতে এসেছে, সুতরাং সেটাই
করবে। এগিয়ে চলল একদিকে।

কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না। ভারি কাপেট তার পদশব্দ যেমন ঢেকে
দিচ্ছে, অন্য আরেকটা পায়ের শব্দও ঢেকে দিচ্ছে। তাই টের পেল না কিছু।

এক জায়গায় আরেকটা পথ চলে গেছে তার পথটাকে ত্রস করে। কোনটা

দিয়ে এগোবে তাবার অবকাশও পেল না সে। মুখোযুধি হলো জনি বিয়াওর।

ভীষণ চমকে গেল সে। দৌড় দেয়ার কথা ও মনে রইল না। অবশ্য এখন আর দিয়েও লাভ নেই। দেরি হয়ে গেছে।

চমকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই পুরোদমে চালু হয়ে গেল তার মগজ। ভাবতে আরম্ভ করল কি করা যায়। সে তো ধরা পড়েছেই, আর কেউ যাতে না পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিছু একটা করে দলের অন্যদের পালানোর সুযোগ করে দেবে।

ভয় যে পেয়েছে সেটা বুঝতে দেয়া চলবে না। তাই লজ্জিত হাসি হাসল সে। তার কাঁধ যখন চেপে ধরল বিয়াও তখনও চুপ করে রইল। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল না।

‘অ্যাই ছেলে, এখানে কি করছ?’ ধমক দিয়ে বলল বিয়াও। ‘এতরাতে জাহাজে কি?’

‘স্যার, যদি শাস্তি হয়ে শোনেন আমার কথা, সব বলি।’

‘কি বলবে?’

‘জাহাজে এভাবে ওঠার জন্যে প্রথমেই মাপ চেয়ে নিছি। সরি। চুরি করে উঠেছি সত্যি, তবে চুরি করার জন্যে উঠিনি।’

‘কিসের জন্যে উঠেছি তাহলে?’ আরও জোরে ধমক দিল বিয়াও।

চেহারা শাস্তি রাখার চেষ্টা করল মুসা। সময় নষ্ট করতে চাইছে। যত বেশি সময় যাবে কিশোরের পালানোর সুযোগ তত বেশি পাবে। তাহাড়া কথা বলে বলে বিয়াওর মুখ থেকে কথা বের করারও চেষ্টা চালাতে হবে। জানতে হবে বন্দিদেরকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

টানতে টানতে তাকে একটা স্যালুনের কাছে নিয়ে এল বিয়াও। ধাক্কা দিয়ে চুকিয়ে দিয়ে নিজেও চুকল। তারপর তার হাত ছেড়ে দিয়ে মুখোযুধি দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলল, ‘হ্যাঁ, এবার বলো তোমার কি বলার আছে?’

‘আশা করি আমার ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারবেন, স্যার,’ চেহারাটাকে যতটা সত্ত্ব নিরাহ করে তুলতে চাইল সে। এসব ভান-ভণিতাগুলো কিশোর ভাল পাবে। অভিনয় সে কর্তৃত করতে পারছে জানে না। তবু হাল ছাড়ল না। ‘বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরেছিলাম।’

‘বাজি?’

‘হ্যাঁ, স্যার। আপনার জাহাজে উঠে সারারাত থাকব। কারও চোখে পড়ব না। কিন্তু আমি হেরে গেলাম। ধরা পড়ে গেলাম। খুব খারাপ হলো আমার জন্যে। অত সাধের ক্যামেরাটা আর পাব না। ওরা বলেছিল, যদি আমি জিতে যাই, তাহলে ভাল একটা ক্যামেরা কিনে দেবে।’

ভুরু ঝুঁকে তার দিকে তাকাল বিয়াও। বিশ্বাস করবে কিনা ভাবছে বোধহয়।

মুসা যখন বিয়াওকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিশোর তখন একটা আবিষ্কার করে বসেছে। ভাগ্যক্রমেই চকচকে জিনিসটা চোখে পড়ল তার। প্যাসেজের কার্পেটের ধারের সরু ফাঁকে দেয়াল ঘেঁষে পড়ে আছে। একটুকরো

সেলোফেন। কিভাবে যেন ভ্যাকুয়াম ক্রিনারের আকর্ষণ এড়িয়ে গেছে।

নিচু হয়ে সেটা তুলে নিল সে। দেখেই চিনেছিল, শুঁকে আরও নিশ্চিত হলো। ডক যে পিপারমেন্ট চিবাতে পছন্দ করে তার মোড়কের কাগজ।

তার মানে এখানে আনা হয়েছিল ডককে। হয়তো এখনও আছে।

নতুন উদ্যমে খৌজা শুরু করল সে। প্রতিটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল ভেতর থেকে সন্দেহজনক শব্দ আসে কিনা। সামনে পেছনেও নজর রেখেছে। কেউ আসছে কিনা দেখছে। ধরা পড়লে চলবে না।

আরেকটা করিডোরে চুকল সে। আগেরগুলোর চেয়ে এটা অন্ধকার। লম্বা করিডোরের ছাতে একটা মাত্র আলো। অন্ধ পাওয়ারের বাব। পথের শেষ মাথায় দরজা।

সেটার সামনে এসে দাঁড়াল সে। বেরোতে হলে পিছিয়ে যেতে হবে। যেদিক দিয়ে এসেছে সেনিকে। আর পথ নেই। দরজার ওপাশে পথ আছে তবে নবে হাত রাখল সে। তাড়াহড়ো না করে আস্তে মোচড় দিল। কিন্তু ঘূরল না ওটা। তালা দেয়া।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ওপাশে কি আছে ভাবতে লাগল সে। খোলা তো গেল না। ফিরে যাবে কিনা ভাবছে এই সময় শোনা গেল গোঙানি। পরক্ষণেই একটা চাপা কষ্ট।

হাঁটবীট দ্রুত হয়ে গেল কিশোরের। আনন্দে দুলে উঠল মন।
কষ্টটা চিনতে পেরেছে। ডক নরম্যানের।

এখানেই তাহলে আছে। বন্দিকে ওই কেবিনেই তাহলে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাকি তিনজন কোথায়?

শোনা গেল আরও একটা কষ্ট। মহিলার গলা। ‘খুব কষ্ট হচ্ছে? দাঁড়াও, একটা বালিশ দিয়ে দিই নিচে। কষ্ট কর হবে।’

আর দেরি করল না কিশোর। তজনীন নথ দিয়ে আস্তে আস্তে আঁচড় কাটতে শুরু করল দরজায়। কয়েকটা আঁচড় দিয়ে চাবির ফুটোতে ঠোঁট রেখে চাপা গলায় বলল, ‘রিচা! ডক! আমি এসেছি! আমি কিশোর।’

বারো

কথা বন্ধ হয়ে গেল। দরজার ওপাশ থেকেও আঁচড়ের শব্দ হলো। রিচা জবাব দিল, ‘কিশোর! এসেছ! বের করতে পারবে আমাদের?’

‘মনে হয় না,’ কষ্টস্বর নামিয়ে রেখে যতটা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব বলল কিশোর, ‘আমরা কেবল খুঁজতে এসেছি। জানেন কোথায় রয়েছেন? জনি বিয়াওর জাহাজে।’

‘আমাদের কিডন্যাপ করেছে তাহলে! কেন?’

‘পরে বলব।’

‘আমাদের আগে বের করার চেষ্টা করো। ডকের অবস্থা ভাল না। সাংঘাতিক ব্যথা।’

এখানে বেশিক্ষণ থাকলে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। কিশোর বলল,

‘থাকুন। ঘাবড়াবেন না। যত তাড়াতড়ি পারি পুলিশ নিয়ে চলে আসব। রোজার আর জুনও আছে আপনাদের সঙ্গে?’

‘নী। ওরা কোথায় জানি না।’

আপাতত আর কিছু জানার নেই। পিছিয়ে এল কিশোর। আরও দুটো প্যাসেজ দেখেছে, যেগুলোতে যায়নি। গিয়ে দেখবে নাকি? কোন কেবিনে পেয়েও যেতে পারে বাকি দুজনকে।

এসেছে যখন দেখেই যাওয়া উচিত। পেলে ওদেরকেও আশ্বাস দিতে পারবে।

ওই প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে এসে আরেকটা প্যাসেজে চুকল সে। প্রতিটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কান পাতল। নব ধরে মোচড় দিয়ে দেখল। নবের তালার ফুটোয় চোখ রেখে ভেতরে উঁকি দিল। এভাবে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে এসব করতে গিয়ে মন্ত ঝুঁকি নিছে। যে কেউ চলে আসতে পারে। লুকানোর জায়গা পাবে না তখন। ধরা পড়ে যাবে।

কিন্তু এত ঝুঁকি নিয়েও লাভ হলো না। পেল না বাকি দুজনকে।

নিচয় অন্য কোথাও রেখেছে, ভাবল সে। এখং সেটাই স্বাভাবিক। বন্দরে নৌকৰ করে আছে জাহাজ। ওরকম পরিচিত দুজন মানুষকে দীর্ঘ সময় ধরে এখানে আটকে রাখাটা বিপজ্জনক। যে কোন সময় পুলিশ এসে হানা দিতে পারে। খুঁজতে পারে। ডককেও বাইরেই রাখত। কিন্তু সে অসুস্থ। তাই জাহাজে রেখে ডাক্তার দেখিয়েছে প্রথমে। তারপর রিচাকে ধরে এনেছে তার স্বামীর সেবা-যত্ন করতে। বুকিটা ভালই করেছে বিয়াগ।

পা টিপে টিপে এগোল কিশোর। ভাবনা চলেছে।

বিয়াগ নিচয় ভেবেছিল, ডক একটু সৃষ্ট হলেই তাকেও জাহাজ থেকে সরিয়ে দেবে। কিন্তু সরানোর মত ভাল হয়নি বোধহয় ডক। ন্য সরানোর আরও একটা কারণ থাকতে পারে। রিচ। তাকে খেঁজাখুঁজি করে যখন হাল ছেড়ে দেবে পুলিশ তখন সরানো হবে জাহাজ থেকে। রোজার আর জুনকে যেখানে রাখা হয়েছে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে।

থেমে গেল সে। সামনে একটা ট্যাপডোর। নিচে নামার পথ। নিচে নামা পেলে ওখানেও খোঁজা যাবে রোজার আর জুনকে।

কিন্তু নিচে নেমে ওদের কাউকেই পেল না কিশোর। ধুলো জমে থাকা একটা ঘর। ছান আলো। দড়ির বাণিল, ইয়েট পরিষ্কার রাখার নানা রকম সরঞ্জাম, ইঞ্জিন মেরামতের যন্ত্রপাতি, খাবারের বাক্স, বস্তা, টিনে বোঝাই। জাল ছড়িয়ে রেখেছে মাকড়সা।

মই বেয়ে আবার ওপরে উঠে আসতে যাবে এই সময় নেমে আসার শব্দ কানে এল তার।

চমকে গেল সে, তবে মাথা গরম করল না। লুকানোর জায়গা খুঁজতে লাগল। বড় একটা মলাটের বাক্স উল্টে থাকতে দেখে তার ভেতরই গিয়ে সেঁধোল। তারপর বাস্তৱের একটা কোণ সামান্য একটু তুলে দেখতে লাগল। নাবিকের জুতো পরা একজোড়া পা চোখে পড়ল একেবারে তার কাছেই। সরে গেল সেটা। কোণটা আরেকটু উঠু করল কিশোর। দড়ির বাণিল আর খাবারের বাস্তৱের কাছে গিয়ে

ଦାଁଡ଼ାଳ ଲୋକଟା ।

‘ଇସ, ଆରେକୁ ସରେ ଗେଲେଇ ହତ,’ ଭାବଲ ସେ । ‘ଏକଦୌଡ଼େ ତାହଲେ ଉଠେ ଯେତେ ପାରତାମ ମହି ବେଯେ । ଆମାକେ ଦେଖିତ ନା ।’

କିନ୍ତୁ ତାକେ ହତାଶ କରେ ଦିଯେ ଲୋକଟା ଗେଲ ତୋ ନା-ଇ, ବରଂ ତାର ବାକ୍ସେର କାହାକାହିଇ ଆରେକଟା କାଠେର ବାକ୍ସେ କି ଯେନ ଖୁଜିତେ ବର୍କ କରଲ ।

କି ଖୁଜିଛେ?

ଜାନା ଗେଲ ଶିଗଗିରଇ । ଏକଟା ବୋତଲ ବେର କରେ ନିଲ ଲୋକଟା । ବୁଝାତେ ପାରଲ କିଶୋର, ମନିବେର ଦାମୀ ମଦ ଚୁରି କରତେ ଏସେହେ ସେ । ବୋତଲେର ଛିପି ଖୁଲେ ଢକଟକ କରେ ଗଲାଯ ଢାଳତେ ଲାଗଲ ।

‘ବୋତଲଟା ନିଯେ ସରେ ଗେଲେଇ ତୋ ପାରୋ ମିଆ,’ ମନେ ମନେ ତାଗାଦା ଦିଲ କିଶୋର । ‘ଯା ପାଓୟାର ତୋ ପୈଯେଇ ଗେଛ । ନିଯେ କେଟେ ପଡ଼ୋ । ତୁମିଓ ବାଁଚୋ, ଆମିଓ ବାଁଚି । ଏଖାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତୋମାର ବିପଦ, ଆମାର ଓ ।’

କିନ୍ତୁ ଯାଓୟାର କୋନ ଲଙ୍ଘନ୍ତିରେ ନେଇ ଲୋକଟାର । ମନେ ହଞ୍ଚେ ଏଖାନେଇ ନିରାପଦ । ବାଇରେ ଗେଲେ ତାର ହାତେ ଏହି ବୋତଲ କେଉ ଦେଖେ ଫେଲିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାକରି ନିଯେ ଢାନାଟାନି ପଡ଼ିବେ । ସୁତରାଂ ଏଖାନେ ବସେଇ ଶେଷ କରେ ଯାଓୟାର ଜନ୍ୟ କଯେକଟା ଖାଲି ବନ୍ଦାର ଓପର ବସେ ପଡ଼ିଲ ସେ । ଆଯୋଶ କରେ ଚମୁକ ଦିତେ ଲାଗଲ ବୋତଲେ ।

ବାକ୍ସେର ନିଚେ ବେକାଯାଦା ଅବଶ୍ୟ ଥେକେ ଖିଚ ଧରତେ ଆରମ୍ଭ କରଲ କିଶୋରେର ଡାନ ପାୟେର ପେଣ୍ଟିତେ । ବିପଦ ଆରଓ ଆଛେ । ତାର ଦେରି ଦେଖେ ଅସ୍ତିର ହୟେ ଉଠିବେ ମୁସାରା । ତାକେ ଖୁଜିତେ ଚଲେ ଆସତେ ପାରେ । ଏଖାନେ ଏସେ ଚୁକଲେ ମୁଣ୍ଡକିଲ ହବେ ।

ରହସ୍ୟାଟାର କିଳାରା ହତେ ଚଲେଇ । ଏସମୟେ ଧରା ପଡ଼ା ଚଲିବେ ନା । ତୀରେ ଏସେ ତରୀ ଡୋବାନୋ ହୟେ ଯାବେ ତାହଲେ ।

ତାକେ ଟେନଶେନେ ରାଖାର ଜନ୍ୟେ ଯେନ ଅନେକ ସମୟ ନିଯେ ମଦ ଶିଲତେ ଲାଗଲ ଲୋକଟା । ଶେଷ ଆର କରତେ ଚାଯ ନା ।

କିଶୋରେର ମନେ ହଞ୍ଚେ ସମୟ ଏଖାନେ ଆଟିକେ ଗେଛେ ।

ଆରଓ ପ୍ରାୟ ଦଶ ମିନିଟ ପର ଯାଓୟାର ଜନ୍ୟେ ଉଠିଲ ଲୋକଟା । ବାକ୍ସେ ନାମିଯେ ଫେଲେଛିଲ କିଶୋର, ଲୋକଟାର ଓଠାର ଶବ୍ଦ ପୈଯେ ଆଣେ ଉଚ୍ଚ କରଲ ଆବାର କୋଣାଟା । ବୋତଲେର ମୁଖେ ଆବାର ଛିପି ଲାଗିଯେ ଦିଯେଇଁ ଲୋକଟା । ପୁରୋଟା ଶେଷ କରତେ ପାରେନି । ଆବାର କୋନ ସମୟ ଏସେ ଥାବେ । ଆପାତତ ଲୁକିଯେ ରାଖାର ଭାଲ ଏକଟା ଜ୍ଞାଯଗୀ ଖୁଜିଛେ ।

କିଶୋରେର ବାକ୍ସ୍‌ଟାଇ ଯେନ ପଚନ୍ଦ ହଲୋ ତାରଓ । ଏଗିଯେ ଏଲ । ଧୂକଧୂକ କରଛେ କିଶୋରେର ବୁକ । ବାକ୍ସ୍‌ଟାଇ ପୁରୋଟା ଟାନ ଦିଯେ ତୁଲେ ଫେଲିଲେଇ ସର୍ବନାଶ ।

କିନ୍ତୁ ତୁଲିଲ ନା । ବାକ୍ସେର ଏକଟା ଧାର ତୁଲେ ବୋତଲଟା ପ୍ରାୟ କିଶୋରେର ପା ଧେମେ ରେଖେ ଦିଯେ ଚଲେ ଗେଲ । ମହି ବେଯେ ଓଠାର ପର ଟ୍ୟାପଡୋର ବର୍କ ହେୟାର ଆଓୟାଜ ହଲୋ ।

ସ୍ଵନ୍ତିର ନିଃଖାସ ଫେଲିଲ କିଶୋର । ଆର ଏକଟା ମୁହଁତ ଦେରି ନା କରେ ବେରିଯେ ଏଲ ବାକ୍ସେର ନିଚ ଥେକେ । ନିଃଶବ୍ଦେ ମହି ବେଯେ ଉଠେ ଏସେ ସାବଧାନେ ଟ୍ୟାପଡୋର ଖୁଲେ ଉକି ଦିଲ ।

କେଉ ନେଇ ।

প্যাসেজে বেরিয়ে খুব সতর্ক হয়ে এগোল। আর কেউ না থাকলেও এইমাত্র যে লোকটা বেরিয়ে এল সে থাকতে পারে।

কিন্তু কারও সামনেই পড়তে হলো না তাকে। নিরাপদে বেরিয়ে এল ডেকে।

ছায়ার মত নিঃখন্দে ডেক পেরিয়ে এসে রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল।

নৌকায় বসে আছে রবিন আর রাফি। জিনাও ফিরেছে। জাহাজের গায়েই বাঁধা আছে নৌকাটা।

আস্তে করে নৌকায় নেমে এল সে-ও।

‘ফিরলে তাহলে,’ ফিসফিস করে বলল জিনা। ‘অনেক সময় লাগালে। মুসা কোথায়?’

জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করল কিশোর, ‘কিছু পেলে?’

‘না। আমাকে আটকে দিয়েছিল। পাহারা দিচ্ছে যে লোকটা সে এমন ভাবে কাছে চলে এল, আর কেন উপায় না দেখে একটা লাইফবোটের মধ্যে চুকলাম। অনেকক্ষণ পর সরল লোকটা। যেতে আর সাহস হলো না। ফিরে এলাম।’

‘আমাকেও আটকে দিয়েছিল,’ কিশোর বলল। ‘তাই দেরি হলো। চুরি করে মদ খেতে চুকেছিল এক নাবিক। একটা বাস্ত্রের নিচে গিয়ে লুকাতে হলো আমাকে। যাই হোক, আমি পেয়ে গেছি...’

‘কি?’ একই সঙ্গে প্রশ্ন করল রবিন আর জিনা। রবিন জিজেস করল, ‘সূত্র?’

‘সূত্রের চেয়ে বেশি। ডক আর রিচাকেই পেয়ে গেছি আমি। একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে ওদের। ওদের সঙ্গে কথাও বলে এসেছি।’

‘কাজই করেছ একটা!’ জিনা বলল।

উত্তেজিত কঠে রবিন জানতে চাইল, ‘বের করে নিয়ে এলে না কেন?’

‘পুলিশের কাছে যাব। তারাই এসে করবে। মুসা এত দেরি করছে কেন?’

ঠাণ্ডা পড়ছে বেশ। খোলা নৌকায় বসে বসে সাগরের বাতাসে কাঁপ ধরে গেল গোয়েন্দাদের। মুসা আসছে না এখনও। উদ্বেগ বাড়ছে। দুচিত্তা হচ্ছে।

‘কিছু হলো না তো?’ রবিন বলল, ‘গিয়ে দেখা দরকার।’

‘হ্যাঁ,’ চিত্তিত ভঙ্গিতে বলল জিনা। ‘দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি...’

‘থামো! হাত তুল কিশোর। ওই দেখো, আলো।’

রবিন আর জিনা দেখল। সাগরের শান্ত পানিতে আলো এসে পড়েছে। নিচয় কোন পোর্টহোল দিয়ে।

‘জিনা, নৌকার দড়িটা আরেকটু ঢিল করো তো,’ কিশোর বলল।

খুলে দড়ি আরেকটু লম্বা করে দিল জিনা। জাহাজের কাছ থেকে আরও খানিকটা সরল নৌকা। যে পোর্টহোল দিয়ে আলো আসছে সেটা এখন চার্খে পড়ল ওদের।

‘ওটা মেইন সালুন,’ আন্দাজ করল কিশোর। ‘আগে কিন্তু আলোটা দেখিনি। এত রাতে কে জীলাল? মনে হয় মুসার কিছু হয়েছে। দেখা দরকার...’

‘কি করে?’ জিজেস করল রবিন।

‘আবার যেতে হবে আরকি।’

‘আমি যাব?’

‘না। আমি গেলেই সুবিধে। জাহাজের ভেতরে বাইরে ভালমত চিনে এসেছি আমি। আমার পক্ষেই যাওয়া সহজ।’

আবার ডেকে উঠে এল কিশোর। বুদ্ধি বের করে ফেলেছে। রেলিঙে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিল নিচে। সেই দড়ি বেয়ে নেমে চলে এল আলোকিত জানালাটার কাছে। ভেতরে উঠি দিল।

তার অনুমান ঠিক। মুসা রয়েছে ভেতরে। তবে একা নয়। তার সঙ্গে রয়েছে জনি বিয়াগো।

তেরো

দুর্গুরু করছে কিশোরের বুক। সাংঘাতিক মুশকিলে পড়েছে। বিয়াগোর হাতে পড়েছে মুসা। নিচয় তার মুখ থেকে কথা আদায় করে নেবে লোকটা। জেনে যাবে ইয়েটে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে ওরা।

দড়িতে ঝুলে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। হাতের পেশীতে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। কোন কিছুতে পা ঠেকিয়ে হাতের ওপর শরীরের ভার কিছুটা কমাতে না পারলে বেশিক্ষণ আর থাকতে পারবে না এখানে।

পা দিয়ে ঝুঁজতে শুরু করল কিশোর। পোটহোলাটা বেশ বড়। কার্নিসটা ছড়ানো। তাতে পা রেখে দড়ি ধরে কোনমতে বসতে পারল সে। কান পেতে শুনল ভেতরের কথা।

‘তাহলে,’ বিয়াগোর শুকনো কষ্ট শোনা গেল, ‘তুমি বলতে চাইছ, বন্দুদের সঙ্গে বাজি ধরে ইয়েটে উঠেছ? কিন্তু আমি যে তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার কেমন জানি লাগছে।’

‘লাগলে আর কি করব,’ মুসা বলল নিরাশ উঙ্গিতে। ‘আমি যা বলার বললাম। বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে।’

‘তুমি চুরি করতে চুকেছ। বাজিটাজি সব ফালতু কথা। সত্যি কথা বলো, ছেড়ে দেব। নয়তো পুলিশের কাছে যেতে হবে। কোনটা চাও?’

যা দেখাব দেখেছে কিশোর। আর এখানে থেকে নাও নেই। দড়ি বেয়ে ডেকে উঠে এল আবার। তাড়াতাড়ি ফিরে এল নৌকায়।

‘কুইক! নৌকা ছাড়ো। সাবধান, একটু শব্দও যেন না হয়,’ বলতে বলতে নিজেই নৌকার বাধন ঝুলে দিতে লাগল।

দাঢ় তুলে নিক জিনা। ‘মুসাকে দেখেছ?’

‘দেখেছি।’

‘কি করছে?’

‘পরে। সব পরে বলব। এখন কথা বোলো না। জাহাজের কাছ থেকে সরে যাও তাড়াতাড়ি।’

কিশোরও দাঢ় তুলে নিল।

মৃত জাহাজের কাছ থেকে নৌকা সরিয়ে আনল কিশোর। তারপরেও চুপ রইল সে। তীরে না তেড়া পর্যন্ত কথা বলল না।

তীরে নেমে মুসার কি হয়েছে জানাল সে।

মুষড়ে পড়ল রবিন, ‘তাহলে এখন কি করা? বিয়ও ব্যাটা মুসাকে না মারপিট
করে! লোকটা ভীষণ পাজি। ওকে দিয়ে সব সত্ত্ব।’

‘মুসাকে ছাড়িয়ে তো আনার চেষ্টা করতে পারি?’ জিনা বলল।
‘না। গেলে আমাদেরও আটকে দেবে,’ কিশোর বলল।

‘একটা কাজ কিন্তু করতে পারি,’ তুড়ি বাজাল রবিন। ‘মুসা জাহাজে উঠে
গায়ের হয়েছে, একথা গিয়ে পুলিশকে বলতে পারি। এখানে এসে তাকে খোঝার
জন্যে চাপাচাপি করতে পারি ওদেরকে।’

‘তা পারি। এক টিলে তিন পাখি মারা হয়ে যাবে তাহলে। পুলিশ এসে তাকে
উদ্ধার করবে। ডক আর রিচাকে পাবে কেবিনে। বিয়ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে
তখন আর কোন অসুবিধে হবে না তাদের। রোজার আর জুনকে কোথায় বেরেছে
তা-ও জেনে নিতে পারবে।’

‘চলো একশুণি থানায়,’ তর সইছে, না আর জিনার।

আরেকবার থানায় রওনা হলো ওরা। আশা করছে, এবার ওদের কথা বিশ্বাস
করাতে পারবে পুলিশকে।

কিন্তু আবারও নিরাশ হতে হলো ওদেরকে। ইসপেষ্টের শ্বিথ আসেননি।
ডিউটি অফিসার ওদের কথা বিশ্বাস করল না। বরং আবার ওরা তাকে বিরক্ত
করতে এসেছে তেবে ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দিল।

নাহ, এভাবে হবে না। মাথামোটা লোকটাকে বোঝানো কঠিন। রেগেমেগে
থানা থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। হোটেলে গেল না। কাছাকাছি একটা ওষুধের
দোকানে এসে অ্যাটেনডেন্টের কাছে ফোন করার অনুমতি চাইল।

মাথা নেড়ে সেটো তার দিকে ঠেলে দিল লোকটা।

ডি঱েষ্টেরি ওল্টাল কিশোর। ইসপেষ্টের শ্বাখের বাসার নম্বর খুঁজতে লাগল।

রবিন বলল, ‘তিনি খুব অসুস্থ বোবাই যায়। নইলে অফিসে চলে আসতেন।
কিছু কি করতে পারবেন এখন?’

‘কথা বলেই দেবি।’

নম্বরটা পাওয়া গেল। তবে ইসপেষ্টেরকে রিসিভারের কাছে আনতে অনেক
বেগ পেতে হলো কিশোরকে। ফোন ধরলেন মিসেস শ্বিথ। তিনি কিছুতেই লাইন
দিতে চাইলেন না। বিরক্ত করতে চাইলেন না অসুস্থ মানুষটাকে। কিন্তু কথার
ওস্তাদ কিশোর অনেক অনুরোধটোধ করে শেষ পর্যন্ত রাজি করাতে পারল
মহিলাকে।

শোনা গেল ইসপেষ্টের খসখসে কষ্ট, ‘কিশোর? এত রাতে?’

‘স্যার, সাংঘাতিক জরুরি খবর আছে। নইলে এত রাতে ডিস্টাৰ্ব করতাম না
আপনাকে।’

‘বলে ফেলো।’

দ্রুত এবং অন্ত কথায় সব জানাল কিশোর।

বাধা না দিয়ে চুপচাপ শুনলেন ইসপেষ্টের। সব কথা আরেকবার বলতে
বললেন কিশোরকে। কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন, ‘বেশ, এখনি থানায়
ফোন করে আমার ডেপুটিকে বলে দিছি। আমিও যাচ্ছি। ওখানেই দেখা হবে

তোমাদের সঙ্গে।'

রিসিভার রেখে অ্যাটেনডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। সঙ্গীদেরকে জানাল সুব্ধবর।

থানার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি নিয়ে পৌছলেন ইস্পেষ্টার। তাঁর গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল গোয়েন্দারা। তাদেরকে নিয়ে অফিসে ঢুকলেন তিনি।

বদলে গেছে ডিউটি অফিসারের ভাবভঙ্গ। ওদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে তাতে লজ্জা পাচ্ছে বোঝাই যায়।

ওরা ভেবেছিল, অফিসে এসেই বিরাট পুলিশ ফোর্স নিয়ে ইয়টে তল্লাশি চালাতে রওনা হয়ে যাবেন ইস্পেষ্টার শ্বিথ। কিন্তু তা না করে ওদেরকে টেবিলের সামনে বসিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করে চললেন।

রাত পোহাল। সৰ্ব উঠল। তারপরেও বেরোলেন না তিনি।

'সার্চ ওয়ারেন্টের জন্যে বসে আছি,' অবশ্যে বললেন ইস্পেষ্টার। 'পেলেই রওনা হব। তোমাদেরকে আর দরকার নেই। হোটেলে চলে যাও। ঘুমিয়ে নাওগো।'

কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না গোয়েন্দাদের। তাদেরকেও সঙ্গে মেয়ার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল ইস্পেষ্টারকে।

কিন্তু তিনি রাজি হলেন না।

কিছুতেই যখন হোটেলে যেতে চাইল না ওরা, তখন বললেন, 'বেশ, হোটেলে না যাও এখানেই থাকো। ইজি চেয়ার আছে, ঘূমাতেও পারো। আমরা যখন যাব, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জেটি পর্যন্ত যেতে পারো। ব্যস এর বেশি না।'

একেবারেই না যেতে পারার চেয়ে এটা ভাল। আর কথা বলল না ওরা। ইজি চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এত টেনশনের মধ্যে ঘূম ভাল হলো না। এরকম অবস্থায় হওয়ার কথা নয়। অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে লাগল। বেশির ভাগই দুঃস্ময়। তেজে গেল ঘূম। দেখে শরীর শক্ত হয়ে গেছে।

নাস্ত্র ব্যবস্থা করলেন ইস্পেষ্টার।

কুটি, মাখন আর ডিমভাজা পেট পুরে খেয়ে কড়া করে এককাপ চা খাওয়ার পর রাতজাগার ক্লান্সি অনেকটাই দূর হলো গোয়েন্দাদের।

ওয়ারেন্ট এল। দলবল নিয়ে রওনা হলেন ইস্পেষ্টার। গোয়েন্দারাও চলল সঙ্গে।

জেটিতে অপেক্ষা করছে পুলিশের বোট।

গোয়েন্দাদেরকে বললেন ইস্পেষ্টার, 'তোমরা থাকো এখানে। মুসা আর অন্য দুজনকে পেলে নিয়ে এখানেই আসব। দেখতে পাবে।'

ছেড়ে দিল বৈট। তীব্র গতিতে ছুটল।

সেদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল কিশোর, 'মুসা আর অন্য দুজনকে পেলে... যদি না পায়?' ঘট করে সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে। 'এই, আমাদের ভাড়া করা নোকাটা এখনও আছে। জাহাজের কাছে চলে গেলেও তো পারিব?'

রবিন আর জিনাও রাজি। কিছু না বুঝেই রাফি বলল, 'হাউ!'

পুলিশের বোট রওনা হওয়ার কয়েক মিনিট পরেই গোয়েন্দাদের নৌকাও এগোল ফ্রাইং অ্যাঞ্জেলের দিকে।

দুর থেকেই দেখল ওরা, ইয়টের গায়ে ভিড়ে আছে পুলিশের বোট। আরেক দিক দিয়ে ঘূরে ওরাও চলে এল জাহাজের কাছে। পেছন দিকে এনে টেকাল।

আসার সময়ই ঠিক করেছে কিশোর, ওরাও উঠবে জাহাজে। কেন যেন মনে হতে লাগল ওর, মুসাকে উদ্ধার করতে ওদের সাহায্য দরকার হবে পুলিশের। বিয়াঙ্গা আর নাবিকেরা ব্যস্ত থাকবে এখন অন্য দিকে। পুলিশ থাকবে ওদের সঙ্গে। কাজেই পেছন দিক দিয়ে জাহাজীদের অলঙ্ক্ষে উঠে পড়াটা কঠিন হবে না।

তার ধারণাই ঠিক। রাতে যেখানে নৌকা বেঁধেছিল, সেখানেই এখনও বাঁধল। রাফিকে চুপ করে নৌকায় বসে থাকার নির্দেশ দিয়ে রবিন আর জিনাকে নিয়ে দেকে উঠে এল।

চোদ

ইয়টের ডেতবে যেন মৌচাকের গুঞ্জন। ইস্পেষ্টের শিথের সঙ্গে ঘূরে বেড়াচ্ছে পুলিশ অফিসারেরা, কেবিনে কেবিনে খুজছে। পাথরের মত মুখ করে মেইন স্যালুনে বসে আছে বিয়াঙ্গা আর মলি অ্যালকট। পুলিশ হানা দেয়াতে যেন সাংঘাতিক অপমানিত বোধ করছে।

হাঁৎ ছেলেমেয়েদের ওপর চোখ পড়ল ইস্পেষ্টের। ভুরু কুঁচকে প্রায় চিৎকার করে বললেন তিনি, ‘এ কি! তোমাদের না জেটিতে থাকতে বলেছিলাম?’

কেন্দে ফেলল জিনা। ‘মুসার জন্যে ভীষণ খারাপ লাগছে আমাদের, স্যার।’ ফৌপাতে ফৌপাতে বলল, ‘ওকে জলদি খুঁজে বের করুন। ইস্স, কি জানি কষ্ট হচ্ছে ওর।’

জিনার এই ব্যবহারে কিশোর আর রবিন তো থ। অনেক চেষ্টায় মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখল। আড়চোখে তাকাতে লাগল পরম্পরের দিকে।

জিনার এই অভিন্ন বুরতে পারলেন না ইস্পেষ্টের। নরম হয়ে বললেন, ‘থাক, থাক, কেন্দো না। এসেই যখন পড়েছ, থাকো। দেখি, কোথায় আছে মুসা।’

এসব কথা বিয়াঙ্গার কানেও গেল। বুবাতে পারল, তার জাহাজে তন্ত্রাশির জন্যে এই ছেলেমেয়েগুলোই কেনন ভাবে দায়ী। কঠিন দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল ওদের দিকে। বলল, ‘ও, তোমরাই তাহলে সিয়ে বানিয়ে বলেছ। ইস্পেষ্টের, কয়েকটা বাচ্চার কথায় আপনি আমার জাহাজে সার্ট করতে চলে এলেন?’

জবাব দিলেন না ইস্পেষ্টের।

রেগে উঠে কিছু বলতে-যাচ্ছিল জিনা, হাত তুলে তাকে থামালেন তিনি।

পুলিশের কাজ পুলিশ চালিয়ে গেল। কিন্তু বাঁদ্দের কাউকে পাওয়া গেল না। যেন বাঁতাসে মিলিয়ে গেছে তিনজনে।

ডক আর রিচাকে যে কেবিনটাতে রাখা হয়েছিল সেটায় চুকে মনে হলো, এখানে বহু বছর কোন মানুষ বাস করোন।

‘এঘৰেই ছিল?’ কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ইসপেষ্টর। ‘তুমি
শিওৱ? ভুল্টুল কৰোনি তো?’

‘না,’ জোর গলায় জবাব দিল কিশোর। ‘দৰজাৰ ফাঁক দিয়ে কথাও বলেছি
ওদেৱ সঙ্গে।’

‘কেউ হয়তো চালাকি কৰেছে তোমার সঙ্গে?’

‘না। ডক আৱ রিচাই ছিল। সয়িয়ে ফেলা হয়েছে ওদেৱকে। নাহয় ধৰলাম,
ওদেৱ ব্যাপারে ভুল কৰেছি আমি। কিন্তু মুসা? নিজেৰ চোখে তাকে দেখেছি মেইন
স্যালুনে মিস্টাৰ বিয়াওৰ সঙ্গে কথা বলতে। বিয়াও বলেছে তাৰ কথাৰ জবাব না
দিলে মুসাকে আটকে রাখবে।’

ইসপেষ্টর কিশোৱেৱ কথা অবিশ্বাস কৱলেন বলে মনে হলো না, কিন্তু তাঁৰ
অফিসাৱেৱা কেউই কৱল না মুখ দেখেই বোঝা গেল। বিৱৰণ চোখে কিশোৱেৱ
দিকে তাকাল ওৱা।

কি কৱবে বুঝতে পাৱছে না কিশোৱ। এটা কি ঘটল? এমন হবে ভাবেনি সে।
তবে ভাবা উচিত ছিল। কাউকে মুক্ত তো কৱতে পাৱলই না, সবাৰ হাসিৰ পাত্ৰ
হলো। মাঝখান থেকে পুৱো ব্যাপারটা চলে গেল বিয়াওৰ পক্ষে। নিৱাই একটা
ভঙ্গি কৱে রেখেছে সে।

মৰিয়া হয়ে বলল কিশোৱ, ‘স্যার, বিশ্বাস কৰুন, প্রীজ! ডক আৱ রিচাকে এই
জাহাজেই বন্দি কৱে রাখা হয়েছিল। নিচয় মুসা ধৰা পড়াৰ পৰ সন্দেহ হয়েছিল
বিয়াওৰ। তাড়াতাড়ি কৱে তিনজনকেই সয়িয়ে দিয়েছে জাহাজ থেকে। নিচয়
বুঝে ফেলেছিল এইবাৰ এখানে তগাণি হৰেই।’

কিন্তু কথাৰ সপক্ষে কোন প্ৰমাণই দিতে পাৱল না সে। পুলিশ অফিসাৱেৱাও
হিয়ায় পড়ে গেছে। কি কৱবে ঠিক কৱতে পাৱছে না। বন্দিদেৱ পায়নি বলে ওৱাও
হতাশ। গেল কিশোৱেৱ ওপৰ রেগে।

এৱকম কিছুই চাইছিল বিয়াও। রাগ দেখিয়ে ইসপেষ্টরকে বলল, ‘কাজটা ঠিক
কৱেননি আপনি ইসপেষ্টর। উচু মহলে লোক আছে আমাৰ। এৱ জন্যে পষ্টাতে
হবে আপনাকে।’

কোন জবাব দিতে পাৱলেন না ইসপেষ্টর। দলবল নিয়ে থানায় ফিরে এলেন।

সে যে কিছুই ভুল দেখেনি, একথা আৱেকবাৰ তাঁকে বলতে গেল কিশোৱ,
কিন্তু অন্য মনস্ক হয়ে আছেন ইসপেষ্টর। একে শৰীৰ খাৱাপ। তাৰ ওপৰ এভাৱে
অপদস্ত্ৰ হয়ে এসে মেজাজও খাৱাপ। ভাৱি গলায় বললেন, ‘পুৱো ব্যাপারটাই
কেমন জগাখিচড়ি পাকিয়ে গেল।’

অন্য অফিসাৱেৱা তাকিয়ে আছে তাঁৰ দিকে। তিনি কি বলেন শুনতে চাইছে।
সবাই বুঝতে পাৱছে পুলিশেৱ এ বোকামিৰ খবৰ পত্ৰিকায় বড় হেডলিং ছাপা হবে।
লজ্জাৰ সৌমা থাকবে নৈ। একজন বলল, ‘এমনিতেই তো যত দোষ পুলিশেৱ।
এবাৰ দূৰ দূৰ কৱবে লোকে।’

মুখ কোলো কৱে থানা থেকে বেৱিয়ে এল গোয়েন্দাৱা। হোটেলে ফিরে
গোসল সেৱে খানিকক্ষণ ঘূমিয়ে নিল। ঘূম থেকে উঠে থেয়ে নিল পেট ভৱে।
অনেকটা ভাল বোধ কৱছে এখন। আবাৰ কাজে মনোযোগ দিতে পাৱবে।

কিশোর বলল, 'বসে বসে আঁঙ্গুল চুম্বলে হবে না আমাদের। মুসাকে উদ্ধার করার জন্যে কিছু করতেই হবে।'

'আব্বা আম্মারও চলে আসার সময় হয়েছে,' জিনা বলল। 'এসে পড়লে আর কিছু করতে পারব না। করতে দেবে না।'

'তাহলে যা করার তার আগেই করতে হবে,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

জিনাও বলল, 'ঠিক।'

রাফি ভাবল তারও কিছু বলা দরকার। সে বলল, 'হাউ!'

'এক কাজ করতে পারি,' পরামর্শ দিল রবিন, 'দলে বড় কাউকে নিতে পারি আমরা। ছেট বলে পুলিশ তো আমাদের কথা বেড়ে ফেলে দেয়। বড় কেউ সাক্ষি দিলে আর উডিয়ে দিতে পারবে না।'

নিচের ঠোটে দুবার চিমটি কাটল কিশোর। ভাবছে। কথাটা রবিন ঠিকই বলেছে। আবার যদি কিছু করতে যায় ওরা, হয়তো কিছু করতে পারবেও, কিন্তু পুলিশকে বললে আবার অপদস্থ হওয়ার স্মাবনাই বেশি।

'বেশ,' বলল সে, 'বড় একজনকে নেয়া যায়। কিন্তু কাকে নেব?'

'হেনরি টমাসকে। চলো, তাকে গিয়ে বলি।'

'আমিও তার কথাই ভাবছিলাম। চলো।'

বাসায়ই পাওয়া গেল পরিচালককে। রোবার। ছুটি। কাজে বেরোয়নি। হাতে কফির কাপ। খবরের কাগজ পড়ছে। শোয়েন্ডারের দেখে অবাক হলো।

'আরে, তোমরা? কি ব্যাপার? মুসা কোথায়? অসুখ-টসুখ করেনি তো?'

রাতের আর সকালের সব কথা খুলে বলল ওরা।

ওদের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টমাস, 'আমি আছি তোমাদের সঙ্গে। বিয়াগাই তাহলে আটকে রেখেছে। মহাপাজি লোক তো। দুঃখ আছে। কপালে দুঃখ আছে ওর।'

উজ্জ্বিল হয়ে পড়েছে টমাস। বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে শাস্তি করল ওরা। তারপর শুরু হলো আলোচনা। কি ভাবে কি করবে তার প্ল্যান। সবাই একমত হলো, রাফির ঘ্যাণশুভ্রির ওপরই নির্ভর করতে হবে। তাকে দিয়ে গন্ধ ঢুকিয়ে বের করতে হবে বন্দিদেরকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে। টমাস বলল, তার ছবির অভিনেতা ও টেকনিশিয়ানদেরও সাহায্য নেয়া হবে। বললেই সাহায্য করতে রাজি হয়ে যাবে ওর।

একের পর এক টেলিফোন করে চলল টমাস। ঠিকই বলেছে। সাহায্য করতে কেউ অরাজি হলো না।

সবার আগে এল রলি বিংহ্যাম ও বব উইলস। রলির গাড়িতে করে। তারপর এক এক করে অন্য অভিনেতা ও টেকনিশিয়ানদের গাড়ি এসে থামতে লাগল টমাসের ফ্যাটের সামনে।

সবাই এলে নিজের পরিকল্পনার কথা খুলে বলল কিশোর।

তর্কিবিতর্ক হলো। কি করে করলে ভাল হয় একটা সিদ্ধান্তে এল সবাই।

দল বেঁধে নিচে নামল ওরা।

একটা পুরানো সাইকেল এনে নিজের ভ্যানে তুলতে তুলতে টমাস বলল, 'নিয়ে নিলাম সঙ্গে। কাজে লেগে যেতে পারে। হয়তো এমন জায়গায় চলে গেলাম যেখানে গাড়ি চলল না। তখন লাগবে।'

সাইকেলটা দেখে খুশি হলো কিশোর। কিছু বলল না। সাংঘাতিক খেপে খেপেছে জনি বিয়াঙ্গার ওপর। মনে মনে বলল, 'আসছি আমরা, দাঁড়াও। তোমাকে একটা শিক্ষা না দিয়েছি তো আমার নাম কিশোর পাশা নয়।'

পনেরো

জাহাজঘাটায় চলে এল ওরা। কোনখানে বন্দিদের নামাতে পারে আন্দাজ করে নেয়ার জন্যে। ফ্লাইং অ্যাঞ্জেলের ডিঙ্গিটা কোথায় বাঁধা থাকে জানে গোয়েন্দারা। গভীর পানিতে নোঙ্গ করা থাকে জাহাজ। সেটা থেকে ডিঙ্গিতে করেই সাধারণত যাতায়াত করে যাত্রীরা।

জায়গামতই আছে ডিঙ্গিটা। মুসার একটা শার্ট বের করে রাফির নাকের কাছে ধরল কিশোর। বলল, 'ভাল করে শোক। তারপর খুঁজে বের কর।'

শার্টটা শুকল রাফি। আশেপাশে কয়েক পা হেঁটে এসে বসে পড়ল আবার। কান, লেজ ঝুলে পড়েছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকাল কিশোর আর জিনার দিকে।

'মনে হয় না এখানে এভাবে কিছু পাওয়া যাবে,' গভীর হয়ে বলল টমাস। 'বিয়াঙ্গাকে এত বোকা ভাব ঠিক হবে না। বন্দিদের এরকম একটা সরগাম জায়গায় এনে নামাবে না।'

'সেটাই ভাবছি,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তবে হাতের কাছেই রাখবে। দরকার পড়লেই যাতে তাড়াতাড়ি আবার কোথাও সরিয়ে ফেলতে পারে।'

রবিন বলল, 'অন্য কোনখান দিয়েও তো নামাতে পারে। যেখানে লোকজনের চোখে পড়ার ভয় নেই।'

বব বলল, 'তা-ও হতে পারে। এক কাজ করি, চলো, উপকূল ধরে হেঁটে যাই। রাফিকে মাটি শৈৰীকাতে শৈৰীকাতে যাব।'

'তাতে সারাজীবন লেগে যাবে,' টমাস বলল। 'সহজ কিছু করা দরকার।'

কিশোর বলল, 'লোকজনের চোখে পড়বে না, এরকম একটা জায়গাই আছে। যেখানে কাপড় ঝুলে রেখে নৌকা নিয়ে জিনা গিয়ে জাহাজে উঠেছিল। চলুন, ওখানে গিয়ে খুঁজি।'

এইবার কাজ হলো। জায়গাটায় পৌছার সঙ্গে সঙ্গে নাক উঁচু করে শুকতে লাগল রাফি। মাটিতে নামাল। তুলতে আর চায় না। লেজ নাড়তে লাগল। তারমানে মুসার গন্ধ পেয়ে গেছে এখানে তার শক্তিশালী নাক।

শব্দ করে কয়েকবার নিঃখাস টানল সে। তারপর এগিয়ে চলল। পাহাড়ের দিকে গেছে একটা রাস্তা। সেটার দিকে এগোতে যেতেই তাকে থামাল কিশোর। ফিরে তাকিয়ে সবাইকে বলল, 'সাইকেল নিয়ে আমি ওর পিছে পিছে যাব। বেশ কিছুটা দুরত্ব রেখে আপনারাও আসন্ন গাড়িতে করো। সাবধান থাকতে হবে। কারও চোখে পড়া চলবে না।'

স্টুডিওর ভ্যান থেকে সাইকেলটা নামিয়ে দিল একজন টেকনিশিয়ান।

পাহাড়ী পথ ধরে চলল দলটা। সরু রাস্তা। পথ একবার উঠছে, একবার নামছে। নামার সময় সহজ, ওঠার সময়ই যত পরিষ্পৰ। তার ওপর আরেকটা অসুবিধে, দুহাতে হ্যাণ্ডেল ধরতে পারছে না। এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরেছে, আরেক হাতে রাফির গলার চেন।

তাদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে থেকে এগোচ্ছে দুটো গাড়ি। একটা টমাসের, আরেকটা স্টুডিওর ভ্যান। রালি নিজের গাড়িটা ফেলে রেখে টমাসের গাড়িতে উঠেছে জিনা, রবিন আর মলির সঙ্গে। দুটোতেই যখন জায়গা হয়ে যাচ্ছে অহেতুক আরেকটা নেয়ার মানে হয় না। গাড়ির মিছিল নিয়ে এগোলে চোখে পড়ে যাওয়ার স্থাবনা আছে।

এমন ভঙ্গি করছে কিশোর, যেন কোন উদ্দেশ্য নেই, পাহাড়ে ঘূরতে বেরিয়েছে।

হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ের একটা সরু কাঁচা পথে নেমে পড়ল রাফি। সাইকেল থেকে নামল কিশোর। ছোট্ট একটা বনের মধ্যে চুকচে পথটা। এলাকটা নির্জন।

গাড়ি থামাল টমাস। সে আর রবিন বেরিয়ে এসে দাঁড়াল কিশোরের পাশে।

‘এখানে গাড়ি আনা যাবে না,’ কিশোর বলল।

‘না পারলে নেই। হেঁটেই যাব।’

‘কিশোর, তোমার আর একা যাওয়া ঠিক হবে না,’ রবিন বলল। ‘আমিও আসছি। আমাদের পেছনে খানিকটা দূরে থাকবে অন্যেরা। সাহায্যের দরকার হলেই যেন ডাকতে পারি।’

‘ডাকবে কি করে?’ বলেই দু-আঙুলে ছুটকি বাজাল টমাস। ‘হইসেল! দরকার হলেই বাঁশি বাজিয়ে আমাদের ডাকবে। তাহলে দূর থেকেও শুনতে পাব।’

স্টুডিও ভ্যানটার কাছে দৌড়ে গেল সে। দুটো গাড়ি পাশাপাশি রাখা হয়েছে এখন। একটা হইসেল বের করে নিয়ে এল। তার সঙ্গে এল জিনা।

‘আমিও যাব,’ জিনা বলল। ‘দুজনের জায়গায় তিনজন হলে অসুবিধে হবে না। চলো।’

জিনার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল কিশোর। মুরব্বি মুরব্বি ঝোব। কিশোর যাতে মানা করতে না পারে সে জন্যে। আরেক দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

মানা করল না কিশোর। করে লাভও নেই। শুনবে না জিনা।

টমাসের হাত থেকে হইসেলটা নিয়ে রাফিকে নিয়ে আবার এগোল তিনজনে।

ওদেরকে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যেতে দেখে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল টমাস।

তবে গোয়েন্দাদের কোন অস্বস্তি নেই। বরং উত্তেজিত। নীরবে এগিয়ে চলেছে। রাফির দিকে চোখ।

‘জিনা, সত্যিই বের করতে পারবে তো রাফি?’ কষ্টস্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

‘পারবে। ওর ভাবসাব দেখছ না? অন্য কোন দিকে নজর নেই, কোন দিকে নেই। গন্ধ না পেলে এরকম করে চলত না।’

‘শৃঙ্খলা!’ ঠোঁটে আঙুল রেখে ওদের থামাল কিশোর। হাত তুলল, ‘ওই দেখো!

রাফির শেকল টেনে ধরেছে সে। সঙ্গে পেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে বুদ্ধিমান কুকুরটাও। লেজ ঢোকানো দুপায়ের ফাঁকে। একেবারে চুপ।

কিশোর যা দেখেছে সেটা জিনা আর রবিনও দেখল।

খানিক দূরে একটা পুরানো খামারবাড়ি। গাছপালার আড়ালে ঢাক। ডালপাতার ফাঁকফোকর দিয়ে অতি সামান্যই চোখে পড়ে। পোড়ো। লোকজন আছে বলে মনে হয় না।

‘দেখে মনে হচ্ছে মানুষ নেই,’ আনমনে বলল কিশোর, ‘তবে অসতর্ক হওয়া চলবে না। কাউকে ধরে এনে লুকিয়ে রাখার চমৎকার জায়গা। কেউ জানতেই পারবে না। কয়েক মাইলের মধ্যে মানুষের বসতি নেই।’

‘হ্যাঁ,’ মাথা দোলাল রবিন। ‘কাউকে কিন্ডনাপ করে এনে লুকিয়ে রাখার ভাল জায়গা। জনি বিয়াধার জেলখানা কিনা চুকলেই দেখতে পাব।’

‘চুকছি না কেন তাহলে?’ তাগাদা দিল জিনা। মাঝে মাঝে দুঃসাহসী হয়ে পড়ে সে। এটা তেমনি একটা মুহূর্ত। মুসাকে উদ্ধার করার জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

‘তাড়াছড়া করা চলবে না,’ কিশোর বলল। ‘তাহলে সব পও হতে পারে। জানালা যেদিকে আছে সেদিকে এগোব না আয়ো।’

‘কিন্তু ওরা তেতরে আছে কিনা শিওর হয়ে নিলে ভাল হত না?’ রবিন বলল।

‘বোকার মত কথা বলো না,’ জিনা বলল। ‘ওরা যে আছে রাফিই তার বড় প্রমাণ। মুসার গন্ধ খুঁকে খুঁকে এসেছে সে। দেখছ না তেতরে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।’

শেকল টানছে রাফি। বারবার তাকাচ্ছে জিনা আর কিশোরের মুখের দিকে এগোনোর অনুমতি চাইছে। শব্দ করতে নিষেধ করা হয়েছে তাকে সে জন্যে মুখে কোন আওয়াজ করছে না।

‘ঠিক আছে, এগো,’ শেকল তিল করে দিল কিশোর।

আরও কিছুটা এগোনোর পর আবার খেমে যেতে হলো। বাড়ি আর বাগান ঘিরে কাঁটাতারের বেড়া। গাছ আর ঝোপের জন্যে একেবারে কাছে না এলে চোখে পড়ে না।

তার ধরে টেনে ফাঁক করার জন্যে হাত বাড়াল রবিন, যাতে ফাঁকের তেতর দিয়ে মাথা গলিয়ে দিতে পারে।

থাবা দিয়ে তার হাত সরিয়ে দিল কিশোর। ‘থবরদার! ছোবে না! ছুলেই হয়তো অ্যালার্ম বেজে উঠবে। বিদ্যুৎ নেই তাই বা জানছ কি করে?’

‘চুকব কি করে তাহলে?’ হতাশ কষ্টে জিজেস করল জিনা।

‘একটাই পথ, তারের নিচ দিয়ে। গর্ত করতে হবে। মাটি নরম। পহজেই পারা যাবে। রাফিকে লাগিয়ে দেব। আমরা ও সাহায্য করব তাকে।’

নির্দেশ দিল জিনা। কি করতে হবে ভালমত বুঝিয়ে দিল রাফিকে। সাবধান করে দিল, কোনভাবেই যেন তারে ছোয়া না লাগে।

গর্ত খুড়তে খুই ভাল লাগে রাফির। অনেক মজা। হাড় লুকিয়ে রাখতে, খরগোশের বাড়ি খুঁজতে, বেড়ার নিচ দিয়ে পার হতে, এরকম অনেক কারণেই গর্ত খুড়তে হয় কুকুরদের। এখন বেড়া পার হওয়ার ব্যাপার। মহাআনন্দে কাজে লেগে গেল সে। তাকে সাহায্য করল কিশোররা।

‘কষ্ট তো করছি,’ জিনা বলল, ‘কেউ দেখে না ফেললেই হয়।’

‘দেখবে না,’ রবিন বলল। ‘দেখছ না কি ঘোপঘাড়। এর মধ্যে দেখা যাবে না।’

‘ব্যস, হয়ে গেল,’ বলল কিশোর। ‘চোকা ধাবে।’

রাফিকে ঢুকিয়ে দেয়া হলো আগে। নির্বিশে তারের অন্যপাশে চলে গেল সে। তারপর সাবধানে, অতি সাবধানে শয়ে পড়ে গর্তে মাথা ঢোকাল কিশোর। মাটিতে প্রায় দেবে গিয়ে ইঝি ইঝি করে পাড় হতে লাগল। তারে ছোয়া লাগার ভয়ে বুক কাঁপছে। যদি বিদ্যুৎ থাকে?

কোনৰকম অঘটন না ঘটিয়ে নিরাপদেই পেরিয়ে এল সে-ও। তারপর পেরোল জিনা। সব শৈশবে রবিন।

এপাশে এসে মাটিতে বসেই আধ মিনিট জিরিয়ে নিল ওরা। পরিষ্মত ফটটা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি কাবু হয়েছে হাই ভোল্ট বিদ্যুতের ভয়ে। জিরিয়ে নিতে নিতেই দেখল, কারও চোখে পড়ল কিনা।

সাড়া পাওয়া গেল না। কেউ নেই। অন্তত ওদের চোখে পড়ল না। দাঁড়াতে চাইছে না রাফি। যাওয়ার জন্যে অস্থির।

উঠল ওরা। কোন দিকে না। তাকিয়ে সোজা একটা মাটির নিচের ঘরের ভেন্টিলেটের সামনে এসে দাঁড়াল রাফি। লেজ নাড়তে লাগল।

ভেন্টিলেটের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। ফিরে তাকাল সঙ্গীদের দিকে। ‘মনে হচ্ছে এখানেই আছে।’

অন্য দূজনও এসে বসে পড়ল তার পাশে। ভেন্টিলেটের ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাল। কিছু চোখে পড়ল না। শুধুই অন্ধকার।

সত্যই দেখতে পেয়েছে তো রাফি?

ঘোলো

ভেন্টিলেটের ওপরের ঢাকনাটা অনেক পুরানো। মরচে পড়ে আছে। কিশোর বলল, ‘এটা সরাতে হবে। এসো, হাত লাগাও।’

তিনজনে ধরে টানতেই খলে এল ঢাকনাটা। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঢুকিয়ে দিল কিশোর। ভেতরে একবার তাকিয়েই মাথা বের করে এনে পা ঢুকিয়ে দিল। দুপ করে পড়ল তিন-চার ফুট নিচের কফলার গাঁদার ওপর।

তার পাশে লাফিয়ে নামল রাফি। মৃদু গরগর করল একবার। প্রায় ছুটে গিয়ে একটা দরজার পান্না আঁচড়াতে শুরু করল।

একবার দ্বিতীয় করে কিশোরও এগিয়ে গেল। চাপ দিয়ে বুঝল, ওপাশ থেকে ফিল

লাগানো। জোরে জোরে ঠেলতে লাগল সে। পচে নরম হয়ে শিয়েছে বোধহয় খিলটা, সামান্য চাপেই ভেঙে গেছে। কিংবা মাথাটা সামান্য একটু ঢোকানো ছিল, খুলে গেছে। যা-ই হোক, পান্না খুলতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। ঘটকা দিয়ে খুলে গেল।

আনন্দে অশ্ফুট শব্দ করে উঠল সে। ওই তো আছে ওরা! সারি দিয়ে শয়ে আছে ক্যাম্পবেডে। রোজার, জুন, ডক, রিচা ও মুসা। সবারই হাত-পা বাঁধা, মুখে কাপড় ধোঁজা। ইস, সাংঘাতিক কষ্টের মধ্যে রাখা হয়েছে বেচারাদের।

রবিনও নেমেছে ডেন্টিলেট দিয়ে। এসে দাঁড়াল কিশোরের পাশে। পকেটনাইফ বের করল কিশোর। দুজনে মিলে মুক্ত করতে লাগল বন্দিদের।

‘খাইছে!’ হাত ডলতে ডলতে বলল মুসা, ‘রক্তই বন্ধ হয়ে গেছে। এলে তাহলে শেষ পর্যন্ত। আমি তো আশাই ছেড়ে দিছ্ছিলাম।’

অন্যেরও গোয়েন্দাদের দেখে মুসার মতই খুশ হলো। উচ্ছুসিত হয়ে প্রশংসা করতে লাগল তারা।

ডক জানাল, তার কাঁধের ব্যথা এখন অনেক কমে গেছে।

রোজার বলল, ‘নিজের ওপরই এতদিন রাগ হয়েছে আমার। এত সহজে আমাকে ধরতে দিলাম বলে। জুনের অবশ্য দোষ নেই। আমাকে খুঁজতে শিয়েই বিয়াওর খণ্ডে পড়েছে।’

‘আর আমি কি করলাম?’ তিক্ত কষ্টে বলল রিচা। ‘দিনদুপুরে ধরা পড়লাম ওদের হাতে। একটু সাবধান থাকলৈ আর এমন হত না।’

‘তোমারও দোষ নেই,’ ডক বলল। ‘তুমি কি আর জানতে ওরকম জায়গাতেও ঘাপটি মেরে থাকবে ব্যাটারা।’

‘সব কথা পরেও শোনা যাবে,’ তাড়া দিল কিশোর, ‘তাড়াতাড়ি চলুন এখন এখান থেকে। বলা যায় না, বিয়াওর লোক এসে পড়তে পারে। ওরা নেই নাকি কেউ...’

তার কথা শেষ হলো না। বেজে উঠল তীক্ষ্ণ ছাইসেল।

‘জিনা! প্রায় চিৎকার করে বলল রবিন। ‘নিচয় বিপদে পড়েছে!'

ডেন্টিলেটের দিকে দৌড় দিল ওরা। ওখান দিয়েই বেরিয়ে যেতে পারবে।

বেরিয়ে এসে দেখল কেন বাঁশি বাজিয়েছে জিনা। দুজন লোকের সঙ্গে ধন্তাধন্তি করছে টমাস।

বাঁশি ওনে কিশোরদের মতই ভ্যানের লোকেরাও দৌড়ে এল। সবার আগে ছুটতে দেখা গেল রলি আর ববকে।

এতজনের সঙ্গে পারল না দুই নাবিক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাত-পা বাঁধা হয়ে মাটিতে পড়ে থাকতে হলো।

গোয়েন্দারা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হতেই অস্তির হয়ে অপেক্ষা করছিল টমাস। মিনিট শুণেছে কেবল। ধীরে ধীরে কেটেছে সময়। শেষে দৈর্ঘ্য হারিয়েছে সে। দলের অন্যদের বলেছে, ‘আমি আর থাকতে পারছি না। দেখি শিয়ে, কি হলো?’

রলি বাঁধা দিয়েছে, ‘কিন্তু ওরা বলে গেছে বিপদে পড়লে বাঁশি বাজাবে।’

‘যাতে না পড়ে পড়ার আগেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি যাচ্ছি।’

কিছুদূর এগোলে টমাসেরও চোখে পড়েছে বাড়িটা। আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়েছে, একটা ঝোপের মধ্যে নড়াচড়া। চট করে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে সে। ঝোপ থেকে বেরিয়েছে দুজন নাবিক, ফাইৎ অ্যাঞ্জেলের লোক। জায়গাটা পাহারা দিচ্ছিল। টহুল দিতে দিতে অন্য দিকে চলে গিয়েছিল বলে কিশোর গোয়েন্দারের দেখতে পায়নি। আবার ফিরে এসেছে এদিকে। ওদের চোখে সন্দেহের ছায়া। টমাসের ভারি জুতোর শব্দ কানে গেছে।

লুকিয়ে বাঁচতে পারল না টমাস। তাকে দেখে ফেলল প্রহরীরা। জাপটে ধরল। টেচামেটি কানে গেল জিনার। দেখল, দুজন লোকের সঙ্গে খণ্ডধন্তি করছে পরিচালক। আর কোন উপায় না দেখে সাহায্যের জন্যে বাঁশি বাজিয়েছে সে।

মুক্ত হয়ে আসা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে কোলাকুলি, হাত মেলানো, আর শুভেচ্ছা বিনিয়ম চলল। জানা গেল, বাড়িটাতে আরও লোক আছে।

ছুটল সবাই আবার। পালিয়ে যাচ্ছিল মলি, পিটার ও বিয়াঙ্গার আরও একজন নাবিক। ধরে ফেলা হলো ওদের।

হাত বাড়তে বাড়তে টমাস বলল, ‘পালের গোদাটাকে ধরতে হবে এবার। চলো, খানায়। যথেষ্ট প্রমাণ হাতে এসেছে। এবার আর ধূনফূন করতে পারবে না পুলিশ। না এসে পারবে না।’

না আসার প্রয়োগ উঠে না। বরং শোনার সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ডিউটি অফিসার। বাড়ি চলে গিয়েছিলেন ইস্পেষ্টের শ্বিথ। খবর পেয়ে ছুটে এলেন। খামারবাড়িটাকে ঘেরাও করল পুলিশ। আসামীদের হাজতে ভরা হলো।

বিশ্বামের জন্যে হোটেলে চলে গেল রোজার, জুন, ডক ও রিচা।

মলিকে প্রশ্ন করতে লাগল পুলিশ।

মরমে মরে গেছে যেন তরুণী অভিনেত্রী। সব কথা খুলে বলতেই হলো পুলিশের কাছে। জানা গেল, রাতের বেলা বন্দিদের দেখতে খামারবাড়িতে আসে বিয়াঙ্গ।

তাকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাতচ্ছবি ঠিক করলেন ইস্পেষ্টের। অপরাধস্থলে অপরাধীকে ধরতে পারলে আদালতে অপরাধ প্রমাণ করা সহজ হবে।

টোপ হিসেবে পাঁচজন লোককে শুইয়ে রাখা হবে ক্যাম্পবেডগুলোতে। অন্ন আলোয় তাদের দেখে সহজে চিনতে পারবে না বিয়াঙ্গ। ঘরে অনেক পিপে আছে। ওগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকবে সশস্ত্র পুলিশ। বিয়াঙ্গ ঘরে চুকলেই তাকে আটকে ফেলা হবে।

কিশোর অনুরোধ করল, তাদেরকেই টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হোক। রোজার, জুন, মলির জায়গাঙ্গ অভিনয় করতে পারবে সে, রবিন আর জিনা। মুসা তো মুসার জায়গায়ই থাকবে। ডকের জায়গায় দরকার হলে ডককেও রাখা যেতে পারে।

ডেবে দেখলেন ইস্পেষ্টের। পছন্দ হলো তাঁর। কিশোরের অনুরোধ রাখলেন।

ব্যাসময়ে গিয়ে ক্যাম্পবেডগুলোতে শয়ে পড়ল পাঁচজনে। মাথার ওপর চাদর

টেনে দিল কিশোর, রবিন ও জিনা। ডক আর মুসার সে প্রয়োজন পড়ল না। বরং মুখ খুলেই রাখল, বিয়াও যাতে সন্দেহ করতে না পাবে। করলেও অবশ্য কিছু এসে যায় না। ওঘরে একবার চুকলেই পড়বে ফাঁদে। কি জন্যে চুকেছে তার সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে না।

চপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল সবাই।

নিদিষ্ট সময়ে এল বিয়াও। ঘরে চুকেই ডকের দিকে এগোল, ‘এখন কেমন আছ, ডক? ব্যাধি নিচয় করছে। তোমার জ্যোতি নিয়ে আমি চিন্তিত আছি।’

‘আমাকে নিয়ে আর চিন্তা করার কিছু নেই, আমি ভালই আছি।’ মুখ বাঁকিয়ে বলল ডক, ‘এবার নিজের চিন্তা শুরু করো। বড়ই খারাপ সময় আসছে তোমার।’

‘আমার খারাপ সময়...’

‘হ্যাঁ, একটা পিপের আড়াল থেকে উদ্যত পিস্তল হাতে বেরিয়ে এলেন ইস্পেষ্টার শিখ, ‘আপনার। পাঁচজন লোককে কিডন্যাপ করার দায়ে অ্যারেস্ট করা হলো আপনাকে। ধানায় শিয়ে শুনব, কেন করেছেন।’

‘আ-আপনি ভুল করেছেন ইস্পেষ্টার...’

‘মোটেও না,’ চাদর সরিয়ে উঠে বসল কিশোর। ‘আপনার জারিজুরি সব খতম, যিস্টার বিয়াও। আপনার চামচারাও ধরা পড়েছে।’

‘তু-ত্রুমি!'

‘হ্যাঁ, আমি, কিশোর পাশা। বড় বেশি ছেলেমানুষ ডেবেছিলেন আমাদের, তাই না? পুলিশকেও বোকা ডেবেছিলেন। উচু মহলের সঙ্গে খাতির আর কোন কাজে আসবে না আপনার।’

‘জেলখানায় শিয়ে চোরডাকাতের সঙ্গে খাতির করুনগে এখন,’ হেসে বলল মুসা। ‘আপনাকে তখনই সাবধান করেছিলাম, তিন গোয়েন্দাকে অবহেলা করবেন না...’

‘বাংলায় কি যেন একটা কথা আছে না কিশোর?’ রবিন বলল, ‘ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অতি চালাকের গলায় দড়ি।’

সতেরো

আমেরিকায় ফিরে এসেছে তিন গোয়েন্দা। বসে আছে এখন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে। জিনা আর রাফিও রয়েছে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে। কুকুর চুকতে দিতে কোন আপত্তি নেই পরিচালকের।

রবিনের দেয়া কেসের ফাইলটা পড়লেন না পরিচালক, আবার তার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, ‘এক কাজ করবে। এখন থেকে ফাইলগুলো তোমাদের কাছেই রাখবে। রেকর্ড থাকবে তোমাদের কাছে, আমার যখন যেটা দরকার চেয়ে নেব। বলো এখন গৱাটা, তোমাদের মুখেই শুনি।’

বলতে শুরু করল রবিন। মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করল কিশোর, মুসা আর জিনা।

বিয়াওকে গ্রেপ্তার করার পর থামল।

পুরো পনেরো সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন পরিচালক। তারপর জিজেস

করলেন, টোকার তো অভাব নেই বিয়াওয়ার। কিডন্যাপিজের মত জঘন্য একটা কাজ কেন করতে গেল?

‘গোভ, স্যার,’ জবাব দিল কিশোর। ‘অনেক পাওয়ার লোড।’
তাকিয়ে রইলেন পরিচালক। অপেক্ষা করছেন।

বলতে লাগল কিশোর, ‘বছর চল্লিশকে আগে রোজার আর ডকের এক নানা উইলিয়াম জোনস দেশান্তরী হয়ে আমেরিকায় পাড়ি জমান। তাঁর বাড়ি ইংল্যাণ্ডে। আত্মীয়-স্বজনরা বিদেশে যেতে বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, দেশে থেকেই কোন কাজ করতে। দু-একটা কাজ জুটিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু চাকরিবাকরি ধাতে সইল না জোনসের। কারও কথায়ই কান না দিয়ে শেষে চলে এলেন আমেরিকায়। এখানে এসে কপাল খুলে গেল তাঁর। এক ব্যবসায়ীর নজরে পড়ে গেলেন। পছন্দসই কাজ পেয়ে কাজ নিয়ে মেতে রইলেন। কাজের চাপে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে প্রারলেন না। রাগ করে আত্মীয়রাও তাঁর কোন খৌজ করল না।

‘বহু বছর কোন খৌজখবর নেই। কতদিন আর মনে থাকে। আত্মীয়রা তাঁর কথা ভুলেই গেল। তাছাড়া মনে রাখার মত কোন চরিত্র তিনি ছিলেনও না তাদের কাছে। তারা ভুলেও জোনস কিন্তু তাদের ভোলেননি। একটা দুর্বলতা থেকেই শিয়েছিল। বোনের দুই মেয়ের দুই ছেলে হয়েছে খবর পেলেন একদিন। সম্পর্কে ওরা তাঁরও নাতি।’

‘রোজার আর ডক?’

‘হ্যাঁ। তিনি ওদের খবর জানলেও ওরা তাঁর কথা জানত না। তাদেরকে বলা হয়নি কখনও। ছন্দছাড়া বাটগুলে একজন মানুষের কথা বলার প্রয়োজনই মনে করেনি কেউ। আত্মীয়দের কেউ কেউ ধরে নিয়েছিল জোনস আমেরিকায় শিয়ে মারা গেছেন।

‘ইংল্যাণ্ডে আর ফিরে যাননি জোনস। বিয়ে করেননি। নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না। আমেরিকায়ই একটা এতিম ছেলেকে ছেলের মত মানুষ করেন। ছেলেটা বৃদ্ধিমান। লেখাপড়া শিখল। সহজেই ঢুকে গেল জোনসের বিশাল ব্যবসার মধ্যে। তাকে নিজের কারখানার ম্যানেজার বানিয়ে দিলেন জোনস।’

‘প্লাস্টিকের ব্যবসা?’

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

‘জনি বিয়াওয়ার?’

আবারও মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

‘বলে যাও।’

আগের কথার খেই ধরল কিশোর, ‘জোনসের পালকপুত্র বিয়াওয়া। ভাবল, সব সম্পত্তি তারই হবে একসময়। সুতরাং মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে গেল সে। কোম্পানির আবারও উন্নতি হলো। এই সময় একদিন জানল, জোনসের আবারও উন্নতরাধিকারী আছে। তাঁর দুর সম্পর্কের দুই নাতি। উকিলকে ডেকে উইল করিয়েছেন জোনস, সম্পত্তি তিনি ভাগ করে দিয়েছেন। এক ভাগ পাবে বিয়াওয়া, বাকি দুই ভাগ রোজার ও ডক। পাবে জোনসের মৃত্যুর পর।

‘এ খবর শুনে মাথা গরম হয়ে গেল বিয়াও। কি করা যায় ভাবতে লাগল। সম্পত্তির দুই ভাগ কিছুতেই সে অন্যকে দিতে রাজি নয়। সুযোগ এসে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। অসুখে পড়লেন জোনস। ডাক্তার রায় দিয়ে গেল ক্যাপ্সার। আর বেশিদিন আয়ু নেই জোনসের।

‘দুই নাতিকে দেখার প্রবল আগ্রহ চেপে রাখতে পারলেন না জোনস। বিয়াওকে ডেকে অনুরোধ করলেন, ইংল্যাণ্ড থেকে তাদের নিয়ে আসার জন্যে।

‘বিয়াও দেখল এইই সুযোগ। সামান্যতম প্রতিবাদ না করে সেদিনই বেরিয়ে পড়ল সে। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে খুঁজে বের করল রোজার আর ডককে। কৌশলে আটকে ফেলল।’

থামল কিশোর।

পরিচালক বললেন, ‘আটকে রেখে কি নাভ হত? জোনস মারা গেলে তাঁর উকিল জানিয়ে দিত কাকে কাকে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন তিনি। দুই ভাইকে মেরে ফেলার ইচ্ছে ছিল নাকি বিয়াওর?’

‘না। জাহাজে আটকে রেখে জোনসের কাছে গিয়ে বলত ওদেরকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পটিয়েপাটিয়ে পুরো সম্পত্তি তখন তার নামে লিখিয়ে নিত। বংশের কেউ না থাকলে বিয়াওকেই সব দিয়ে যেতেন জোনস।’

‘কিন্তু ছাড়া পেলেই তো গিয়ে আদালতে বিচার চাইত রোজার আর ডক। তখন?’

‘ওরা জানতেই পারত না ওদের এক বাটগুলে নানা কোটিপতি হয়ে এত টাকার সম্পত্তি রেখে মারা গেছেন। আটকে রাখার বেসারত হিসেবে ওদেরকে কয়েক লাখ করে টাকা দিয়ে দিত বিয়াও। তার নামে কেস করা তো তখন দূরে থাক, তাকে মাথায় করে নাচত ওরা। পুলিশকে কিছু বলত না।’

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে পরিচালক বললেন, ‘হঁ, লোড বড় ভয়ানক জিনিস। লোডে পাপ, পাপে মৃত্যু...’ মুখ তুললেন তিনি। ‘মলিও নিচয় লোডে পড়েই বিয়াওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল? টাকার লোডে প্রত্যাখ্যান করেছিল পিটারকে?’

‘হ্যাঁ, সারা,’ জবাব দিল রবিন। ‘পিটারকে বিয়ে করার কথা দিয়েও বিয়াওর সঙ্গে পরিচয়ের পর সে কথা রাখেনি মলি।’

মুসা বলল, ‘অখ্য পিটার কিন্তু তাকে সত্যিই ভালবেসেছিল।’

‘খুব ভাল হয়েছে এখন,’ ঝাঁঝাল কঢ়ে বলল জিনা। ‘বিয়াওকে তো পেলেই না, পিটারকেও হারাল। শয়তানগুলোর এমনই হয়।’

কয়েক সেকেণ্ড নীরব হয়ে রইলেন পরিচালক। তারপর বললেন, ‘এবার তোমাদের কথা বলো। ছবিটা নিচয় শেষ করেছিলে?’

‘করেছি,’ জবাব দিল রবিন। ‘সম্মেলন শেষ হওয়ার পরও আরও কয়েক দিন সাউথবুন্নে থাকার সিকান্ড নিয়েছিলেন কেরিঅটি। পুরোপুরি ছুটি কাটানোর জন্যে। সম্মেলনটাকে কাজ হিসেবেই ধরেছিলেন তিনি।’

‘যাক, বেচারা ট্রাসকে আর লোকসান দিতে হলো না।’

‘না। বরঞ্জারও একটা চমৎকার ছবির কাহিনী পেয়ে গেল। অবশ্য আপনি যদি আপত্তি না করেন।’

‘আমি আপত্তি করব মানে?’

‘তিনি গোমেন্দার সব কাহিনীই তো আপনার কাছে জমা দিই আমরা। পছন্দ হলে আপনি ছবি করবেন, সেরকমই কথা আছে। টমাস যেটা করেছে সেটা আপনার পছন্দ হয়নি বলেই সে করতে পেরেছে। এখন এই কিডন্যাপের কাহিনীটা যদি আপনার পছন্দ না হয়...’

‘আমার খুবই পছন্দ হয়েছে।’

‘তাহলে আপনিই করছেন?’

‘করতে অসুবিধে নেই। তবে টমাসও করতে পারে। সে করবে ইংল্যাণ্ডের দর্শকদের জন্যে, তার মত করে। আমি করব আমেরিকার জন্যে আমার মত করে। কাহিনী সামান্য এদিক ওদিক করে নিলেই হবে। তাছাড়া এই কাহিনীতে তারই অধিকার বেশি। এতে সে নিজে অংশগ্রহণ করেছে।’

শ্বষ্টির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর, ‘ঠিক একথাই বলবেন, আমি জানতাম। টমাসকে কালই চিঠি লিখে জানিয়ে দেব, আপনার আপত্তি নেই।’

‘আবার অভিনয় করতে যাচ্ছ নাকি তোমরা?’

‘জানি না। আমার অভিনয়ের ইচ্ছে নেই। তবে ইংল্যাণ্ডে আবার বেড়াতে যাওয়ার লোভটা আছে ষোলো আনা। ছবি করলে সামনের গরমেই আমাদের নিয়ে যাবে টমাস। খরচ-খরচা সব তার।’

‘আপত্তি না করে ভালই করেছি। আমার ওপরই খেপে যেতে তোমরা,’ হাসলেন পরিচালক।

‘না না, স্যার, কি যে বলেন?’

‘দেখো, অভিনয় করতে শিয়ে আবার কোন রহস্যে জড়াও।’

‘জড়ালে তো ভালই হয়,’ আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকাল জিনা। ‘জট ছাড়ানোর সুযোগ পাবে।’

হাসল সবাই।

কিশোর বলল, ‘আজ তাহলে উঠি, স্যার।’

‘আরে বসো, বসো, এতদিন পর এলে। তাছাড়া নতুন মেহমান নিয়ে এসেছ। আমাদের রাফিয়ান। তাকে না খাইয়ে ছাড়ি কি করে? কি রে রাফি, কি খাবি?’ কলিং বেলের সুইচে চাপ দিলেন তিনি।

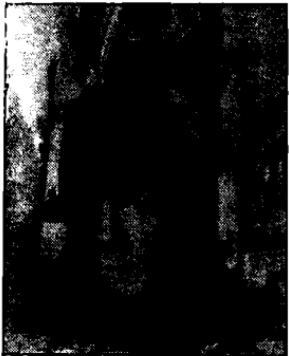
তার দিকে নজর দেয়ায় খুশি হলো রাফি। এতক্ষণ মনমরা হয়ে ছিল বেচারা। মুখ তুলে বেশ জোরাল ঘরে বলল, ‘হউ! হউ!’

‘কি বলল?’ জানতে চাইলেন পরিচালক।

বকবাকে সাদা দাঁত বের করে হাসল মুসা। অনুবাদ করে দিল, ‘চিকেন স্যাগউইচ, স্যার। ফ্রুট কেক আর আইসক্রীম। বেশি করে আনাতে হবে। ব্যাটা আবার রাষ্ট্রস। অঞ্জে পেট ভরে না।’

হো হো করে হেসে উঠলেন পরিচালক।

দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল বেয়ারা। তাজ্জব হয়ে গেছে। সদাগন্তীর ডেভিস ক্রিস্টোফারের অত্থাসি তো দূরের কথা, মুচকি হাসিও দেখেনি কখনও।



আলোর সঙ্কেত

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৭৪

কুকুরটাকে কোলে নিয়ে গেটের ডেতে চুকল
মুসা।

বাগানে ফুলগাছের মরা-পাতা বাছছেন মিসেস
আমান। ভুঁই কুচকে তাকালেন। ‘এই ঘেয়োটাকে
আবার জোগাড় করলি কোথেকে?’

কুষ্ঠিত হাসি হাসল মুসা। ‘দেখো, মা, ফেলে
দিয়ে আসতে বোলো না, প্রীজ! ওর শরীর খুব
খারাপ।’

‘পেলি কোথায়?’

‘রাস্তায় পড়ে ছিল। পিটিয়ে আধমরা করেছে পাঞ্জি ছেলেগুলো। একটা কানও
কেটে দিয়েছে, এই দেখো না...’

‘ওসব দেখার আমার দরকার নেই। পানিটানি খাওয়া, একটু সুস্থ হলে নিয়ে
গিয়ে ফেলে দিয়ে আয়। কতবার বলেছি, এসব আমার পছন্দ না, বাড়িতে ঢোকাবি
না, তা-ও আনে,’ গজগজ করতে করতে আবার পাতা বাছায় মন দিলেন তিনি।

‘কি হয়েছে, মুসা?’ পেছনে শোনা গেল বাবার কষ্ট।

ফিরে তাকাল মুসা। গ্যারেজের দরজায় বেরিয়ে এসেছেন মিস্টার আমান।

সেদিকে এগিয়ে গেল মুসা। কুকুরটাকে নামিয়ে রাখল বাবার পায়ের কাছে।

কুকে বসলেন আমান। আস্তে করে টেমে দেখলেন বী কানটা। গোড়ার কাছে
অনেকখানি কেটেছে। ‘কি করে কাটল?’

‘চুরি দিয়ে কোপ মেরেছে।’

‘খুব বেশি কাটেনি। কপাল ভাল ওর। কোপটা লাগেনি ঠিকমত।’

‘কিন্তু রক্ত তো বন্ধ হচ্ছে না।’

এদিকে না তাকিয়েই মিসেস আমান বললেন, ‘নিজেরা ডাক্তারি করতে না
বসে পশু হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেই হয়।’

‘ঠিক বলেছ,’ মুসা বলল, ‘তবে হাসপাতালে নেয়ার দরকার নেই। কাছেই
একজন পশু-ডাক্তার আছে, তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।’

মুসাদের ইকুনের দুই রুক পরেই থাকেন ডাক্তার। দেখে জিজেস করলেন,
‘তোমার কুকুর?’

‘অ্যা!...হ্যাঁ! জখমটা কি খুব বেশি?’

‘না না, তেমন কিছু না, গোটা দুই সেলাই লাগবে, ব্যস। শক্ত করে ধরে
রাখো, নড়চড় যাতে না করে। ব্যথা তেমন পাবে না। নাম কি?’

‘মুসা। মুসা আমান।’

ভুঁই কুচকে তাকালেন ডাক্তার, ‘কুত্তার সেকেও নেম।’

‘ওটা আমার নাম।’

‘তোমার কথা জিজ্ঞেস করছি না। কুকুরটা?’

‘চিতা,’ কোন কিছু না ডেবেই বলে দিল মুসা।

‘হঁ, ভাল নাম। চিতাবাঘ রাখলে মানাত না। চিতাবাঘ, অর্থাৎ লেপার্ড হলো
বিড়াল গোষ্ঠীর প্রাণী। আর চিতা কুকুর গোষ্ঠীর। কাজেই...’

‘জানি।’

‘জানো? শুড বয়। লেখাপড়া তাহলে করো।’

বই পড়ে যে এ-জ্ঞানটা অর্জন করেনি মুসা, বিবিনের কাছ থেকে শুনে শিখেছে,
সেকথা আর বলল না। তবে সে-জ্ঞন্যে লজ্জিত নয় সে। একভাবে শিখলেই
হলো—বই পড়েই হোক, আর কারও কাছে শুনেই হোক।

পাঁচ মিনিটেই কাজ শেষ হয়ে গেল ডাক্তারের। ফিস দিতে গেল মুসা, নিলেন
না তিনি। ‘লাগবে না। তেমন তো কিছু করিনি। যাও, নিয়ে যাও, সেরে যাবে।
জায়গাটা চুলকাতে দেবে না। চুলকালে ক্ষতি হতে পারে।’

‘কিন্তু আটকাব কি করে?’ জিজ্ঞেস করল উদ্ধিষ্ঠ মুসা। ‘এখনই দেখেন না
চুলকানোর জন্যে কেমন শুরু করে দিয়েছে।’

‘এক কাজ করতে পারো,’ নাক চুলকালেন ডাক্তার। ‘একটা কার্ডবোর্ড গোল
করে কেটে গলায় পরিয়ে দিয়ো। তাহলে আর কাটাটা নাগাল পাবে না।’

‘কিন্তু গলায় এতবড় কার্ডবোর্ড, সহ্য করবে? খুলে ফেলতে চাইবে তো।’

‘শক্ত দেখে দেবে। যাতে ছিড়তে না পারে। এছাড়া আর কোন উপায়ও
নেই। যদি পা বেঁধে ফেললে রাখতে না চাও।’

‘নাহ, সেটা অমানুষের কাজ হয়ে যাবে।’

‘তাহলে এই-ই করোগে।’

কুকুরটাকে নিয়ে বাড়ি রওনা হলো মুসা। কথা বলতে বলতে চলল, ‘শোন,
তোর আগের নাম কি জানি না। নতুন নাম দিলাম, চিতা। জবাব দিবি কিন্তু।
মনিব-টনিব নিচ্য নেই তোর। তাহলে পথে ফেলে পেটাতে পারত না। কি, চিতা
ভাকলে জবাব দিবি তো?’

কি বুঝল কুকুরটা কে জানে। সেবা-যন্ত্র পেয়ে দুর্বলতা অনেকখানি কেটেছে।
মৃদু গলায় বলল, ‘ঘাট।’

বিশাল কুকুর, সাংঘাতিক ভাবিঁ। হাঁপিয়ে গেছে মুসা। আর কোলে রাখতে না
পেরে নামিয়ে দিয়ে বলল, ‘হাঁট এবার। পারবি তো?’

জবাব না দিয়ে রাস্তায় বসে পড়ল কুকুরটা। একটা পা তুলে চুলকানোর জন্যে
নিয়ে গেল জখমী কানটার কাছে।

ঝট করে তার পা চেপে ধরল মুসা। ‘না না, এই কাজও করিসনে! প্লাস্টার,
ওষুধ, সব যাবে!’

অবাক হয়ে মুসার মুখের দিকে তাকাল কুকুরটা। পা ছাড়ানোর চেষ্টা আর
করল না। বোধহয় ভাবল, আমার কাছে কাছে আর থাকবে কতক্ষণ? দাঁড়াও, একা
হয়ে নিই, প্রাণভরে চুলকে নেব।

কিন্তু তার ভাবনাও যেন পড়ে ফেলল মুসা। বলল, ‘সে সুযোগ আর তোকে দেয়া হচ্ছে না বাড়ি গিয়েই কার্ডবোর্ডের কলার লাগাব।’

গেটের ভেতর চুকে এবার আর মাকে চোখে পড়ল না। পাতা তোলা শেষ বোধহয়, ঘরে চলে গেছেন। বাগানের কোণে ছায়ায় বসে কাজে লেগে গেল মুসা। একটুকরো কার্ডবোর্ড জোগাড় করে অনে গোল করে কাটল। তার মাঝখানে গোল ছিপ করল একটা, কুকুরটার গলার মাপে। কার্ডবোর্ডের বড় একটা রিং তৈরি হয়ে গেল। মাথা গলে চুকবেও না, বেরোবেও না। তার একধার কেটে ফাঁক করে দাকিয়ে দিল কুকুরের গলায়। কাটাটা আবার সরু তার দিয়ে সেলাই করে জুড়ে দিল।

‘ব্যস, হয়েছে। এবার হাঁটি তো দেখি।’

হাঁটল কুকুরটা। পা তুলে চুলকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু শক্ত হার্ডবোর্ডের ওপর দিয়ে কেনমতেই কাটা কানের নাগাল পেল না।

‘অসুবিধে লাগছে? কয়েকটা দিন সহ্য কর, ঠিক হয়ে যাবে।’

গ্যারেজের দরজায় বেরোলেন মিস্টার আমান। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কুকুরটার দিকে। তারপর হা-হা করে হেসে উঠলেন, ‘এ-কি! রানী প্রথম অ্যালিজাবেথের রাফ পরিয়ে দিয়েছ দেখি! হা-হা-হা-হা!’

‘হাসছ কেন? অত হাসির কি হলো? ডাক্তার পরাতে বলল, পরিয়ে দিলাম।’

কুকুরটা বোধহয় ভাবল, তারও কিছু বলা দরকার, আমানের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্থে ‘হাউ! হাউ!’ করল দৃষ্টি বার।

আরও জোরে হেসে উঠলেন তিনি। ‘দেখো দেখো মুসা, কুত্তাটা তোমার পক্ষ নিয়েছে।’

অত হাসাহাসি শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মুসার আশ্চর্য। অবাক হয়ে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর ফেটে পড়লেন, ‘এই জন্যেই, এই জন্যেই এসব রাখতে দিই না আমি বাড়িতে। কাজকর্ম ফেলে রেখে যত সব আদিয়েতা ওর হয়ে যায়। যাই মুসা, ওটা কি নাচিয়েছিস?’

‘কেন কলার, দেখতে পাচ্ছ না?’

‘এটা কি ধরনের কলার হলো?’

‘বাবা বলল, অ্যালিজাবেথিয়ান…’

‘চুপ, গাধা কোথাকৰি! খোল জলনি, খোল…’

‘বা-রে, ডাক্তার যে বলল লাগাতে?’

‘তাহলে কুত্তাটাকেই ফেলে দিয়ে আয়, যেখান থেকে অনেছিস সেখানে। এই ভাঙ্ড যেন ছিতীয়বার আর আমার চোখে না পড়ে। ওফ, অসহ্য! গজগজ করতে করতে আবার ভেতরে চলে গেলেন মিসেস আমান।

বাবা জিজেস করলেন, ‘মুসা, এটাকে রাখার ইচ্ছে নাকি তোমার?’

‘হ্যা, বাবা, কিন্তু মা…’

কয়েক দিনের জন্যে দূরে কোথাও সরিয়ে রাখো। কান ভাল হয়ে গেলে কলাটা খলে ফেলে দিয়ো। তারপর দেখা যাক। সহ্য করিয়ে নেয়া যাবে আস্তে আস্তে। যদি কুত্তাটা কোন গোলমাল না করে।’

‘ବାବା, ଓର ନାମ ଚିତା ରେଖେଛି ।’

‘ଭାଲ ନାମ । ଅୟାଇ କୁକୁର, ଚିତା ବଲଲେ ଜ୍ଵାବ ଦିବି?’

ঘাড় নাড়িয়ে যেন জবাব দিল সে, ‘ঘৃণ্ণ !’

হেসে, কাজ করতে চলে গেলেন বাবা। মস্বা ভাবতে লাগল, কোথায় রাখা
যায় কুকুরটাকে? কিশোরদের স্যালভিজ ইয়াড? নাহ, মেরিচাটীও তেমন পছন্দ
করেন না। রবিনদের বাড়িতেও রাখার মত ঘর নেই। বাইরে বেঁধে রাখলে পারা
যায়। কিন্তু একটা আহত জানোয়ারকে বাইরে বেঁধে রাখা কি উচিত হবে? বাইরে
রাখলে তো তাদের বাড়িতেই...

‘ଆରି, ମୁସା, ଏଟା କି?’

ଫିରେ ତାକାଳ ମୁସା । ଓଦେର ଝାଧନି ଡେଇଜି । ‘କି ଆବାର, କୁକୁର । ଦେଖ୍ଜ ନା?’

ମୁଖ ପିଣ୍ଡ ଜୁଲିଯେ ଦିଯେ ହି-ହି କରେ ହାସନ ମହିଳା । ‘କୁକୁର! ଓ-ମା, ଆମି ତୋ
ଭାବଲାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଫୋନ ଅନ୍ତରେ ହି-ହି’

‘অত হিং-হির কি হলো?’ ধমকে উঠল মসা. ‘যাও, ঘরে যাও।’

আরও জোরে হি-হি করে কুকুরটার দিকে তাকাতে তাকাতে ঘরে চলে গেল
ডেইজি।

ନାହଁ, ଏଥାନେ ଆର ଥାକୁ ଯାବେ ନା । ଆପାତତ ସ୍ୟାଲିଭିଜ ଇମ୍ବାଡ଼େଇ ଚଲେ ଯାବେ ।
କିନ୍ତୁ ଚିତାକେ ନିୟେ ଗେଟେର ବାଇରେ ସବେ ବେରିଯେଛେ, ପଡ଼େ ଗେଲ ଏକେବାରେ ଟେରିଯାର
ଡ୍ୟାଲେର ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ।

ଥମକେ ଦଡ଼ାଳ ତିନ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରାର ଚିରଶତ୍ରୁ । କଙ୍କାଳସାର ଲୟା ଏକଟା ଆୟୁନ
କୁକୁରଟାର ଦିକେ ତୁଳେ ଖ୍ୟାକ-ଖ୍ୟାକ କରେ ହାସିଲ । ‘ବା-ବା ବା-ବା, ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରାଗିରି ଛେଡେ
ଏବର ସାର୍କିସେର ଦଲେ ନାମ ଲେଖାତେ ଯାଛ ନାକି?’

‘ছাগলের মত বা-বা করছ কেন? যেখানেই যাই, তাতে তোমার কি, উঁটকি
কোথাকার!’

একটুও রাগ করল না টেরি। হাসির পরিমাণ আরও বাড়াল। ‘এই ফরিদা
কুত্তাটাকে জোগাড় করলে কোথেকৈ? একেবারে একটো ভাদাইয়া। অতই যদি
কুত্তা পোষার শর্খ হয়েছিল, আমাকে বললেই হত, দান করে দিতাম একটা। কতই
তে আচ্ছে আমার।’

‘ভাদাইয়া’ গালিটা পছন্দ হলো না চিতার। উটকি হাসছে খ্যাক-খ্যাক করে, মেঁ রাগল খক-খক করে, লাফ দিয়ে এগোলো তার দিকে। হাস্যকর ভঙ্গিতে দুলে উঠল গলাৰ কলাৰ।

টেরিও নাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে ব্যঙ্গ করল, ‘ও-মা, আবার কামড়াতে আসেগো! এই ভাদাইশ্বা, তোর আবার রাগও আছে দেখি?’

‘না রাগ নেই,’ মুসা বলল, ‘শুটকির গান্ধি সহজ করতে পারে না তো, তাই অমন খেপেছে।’

তবুও রাগলনা টেরি। 'গুটকি তো ভাল জিনিস, জানো না বুঝি? অনেক দাম। দুনিয়ার অনেক লোকের প্রিয় খাবার। ফকিরা কুণ্ডা তো, ডাস্টবিন থেকে মরা ইন্দুর খেয়ে অভ্যাস, ভাল গন্ধ আর সহজ করতে পারে না।'

টেরির মত ধৈর্য নেই মুসার। আর শান্ত থাকতে পারল না। রেগে উঠে হকুম দিল কুকুরটাকে, 'যা তো চিতা, দে ব্যাটাকে কামড়ে, দেধি তোর বাহাদুরি! পটকিপিরি যেন আর জীবনে করতে না আসে!'

ঘাউ করে বাধের ইঁক ছাড়ল চিতা। নিরীহ ভালমানুষ কুকুরটার যে এত রাগ আছে, এত জোরে হক্কার ছাড়তে পারে, মুৰাও কল্পনা করেনি। চমকে গেল। পটকিপিরও হাসি চলে গেছে।

আরেকবার ঘাউ করে উঠে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল চিতা। গলার বোজ্জটা অসুবিধে করছে। সে-জন্মেই বেঁচে গেল টেরি, নইলে কুকুরের কামড় তাকে খেতেই হত। ঘুরে মারল দোড়। কয়েক পা গিয়েই একটা পাথরে হোচ্চট খেয়ে আছাড় ক্ষে। গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল চিতা।

'বাবাগো, খেয়ে ফেলন গো!' বলে চিত্কার করে কোনমতে উঠে আবার দোড় দিল টেরি।

পেছনে কিছুদুর তেড়ে গেল চিতা। তারপর 'ত্যাদড় ছোকরাটাকে যথেষ্ট শিক্ষা দেয়া হয়েছে' তেবে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে এল।

হাসতে হাসতে বাঁকা হয়ে গেছে মুসা। কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল। কিশোর আর ববিনকে বলার জন্ম তর সইছে না। তাড়াতাড়ি এগোন। কিস্ত বেশিদূর যেতে পারল না। পিছে লাগল কয়েকটা ছেলে। টিটকারি দিতে লাগল। হাততালি দিয়ে, কুকুরটাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে, গান গেয়ে গেয়ে খেপাতে শুরু করল মুসাকে। এদের মধ্যে একটা ছেলে আছে, পটকির দলের।

কত আর সওয়া যায়? ইয়ার্ডে যাওয়া বাদ দিয়ে মুখ গোমড়া করে আবার চিতাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল মুসা। ঠিক করেছে, মা এবার কিছু বললেই হয়, মুখের ওপর জবাব দিয়ে দেবে।

গেটের ডেতের কুকুতেই তাঁর সঙ্গে দেখা। 'অ্যাই দেখো, আবার নিয়ে এসেছে! ঝাটাপেটা করে না তাড়ালে আর ফেলবি না, না!'

মনে মনে যতই ঠিক করুক জবাব দেবে, মায়ের মূখে মূখে কথা বলার সাহস নেই মুসার, মিনমিন করে বলল, 'মা, ও একটু ভাল হয়ে উঠুক...কয়েকটা দিন...'

'না! ভাল কুভা হলেও এককথা ছিল। একটা ঘেয়ো, তা-ও আবার কান কাটা, পাগল হয়ে গিয়ে শেষে জলাতঙ্গই ছড়াবে না কি...'

'মা, কান কাটলে পাগল হয় না কুকুর...'

'চূপ, আবার বেশি কথা! আমি বলেছি, এ-বাড়িতে কুকুর-বেড়াল থাকবে না, ব্যস থাকবে না, আর কোন কথা নেই, আর যেন বলতে না হয়।'

মুখ চুন করে গ্যারেজের দিকে রওনা হলো মুসা। কুকুরটা বুদ্ধিমান। কি করে যেন বুঝে গেছে, তাকে নিয়েই যত অশান্তি। চুপচাপ মুসার সঙ্গে সঙ্গে গেল সে, টু শব্দ করল না।

গ্যারেজের পেছনে একচিলতে জায়গা আছে। সেখানে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। কুকুরটার সঙ্গে কথা বলতে লাগল মুসা, 'চিতা, আজই আমরা চলে যাব, বুঝালি। এ-বাড়িতে আর না। আমার ইচ্ছেমত একটা কোন জানোয়ার

পালতে পারব না, এখানে কে থাকে? বল, কেউ থাকে এরকম জায়গায়?’

‘মাথা নেড়ে কুকুরটা বলল, ‘হাউ!’

‘বৃক্ষি আছে তোর, সব বৃক্ষিস। আজ রাতেই চলে যাব আমরা। সবাই যখন ঘূমিয়ে পড়বে, চুপি চুপি বেরিয়ে আসব আমি। মা-কে দেখিয়ে তো যাওয়া যাবে না, চুরি করেই যাব। আমার তাঁবুটা নেব, সাইকেল নেব। একটা সুন্দর জাঙ্গা আছে, গোড়েন শিঞ্চিৎ, কিশোর বলে সোনালি ঝর্ণা, সেখানে চলে যাব। দেখবি, তোরও ভাল লাগবে। তোর কান ভাল না হওয়া পর্যন্ত ফিরব না। কি বলিস?’

‘হাউ!’

‘ভেরি শুড়। লক্ষ্মী ছেলে। তাহলে এই কথাই রইল। তুই এখানেই থাক, খবরদার, একটুও বেরোবি না। মা দেখলে আর রক্ষে থাকবে না। আমি তোর খাবার এখানেই দিয়ে যাব।’

সুতোং গভীর রাতে, বাড়ির সবাই যখন ঘূমিয়ে, সেই সময় পা টিপে টিপে নিচতলায় নেমে এল মুসা। জিনিসপত্র আগেই গুছিয়ে সবার অলঙ্কাৰ নিয়ে শিয়ে রেখে এসেছে গ্যারেজের পেছনে। সাইকেলটা বের কৰে চলে এল সেখানে। তার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কৰেছে কুকুরটা। বেরোয়নি। জিনিসগুলো পাহারা দিয়ে রেখেছে।

তাঁবু আৰ খাবাৰ-দাবাৰগুলো সাইকেলের ক্যারিয়াৰে তুলে নিল মুসা। বেধে নিল দড়ি দিয়ে, যাতে পড়ে না যায়। ব্যাকপ্যাকটা পিঠে বেধে বলল, ‘চল, চিতা। খবরদার, কোন শব্দ কৰিব না।’

সাইকেল ঠেলে নিয়ে গেটেৰ বাইৱে বেরোল সে। কুকুরটা ছায়াৰ মত নিঃশব্দে এল তাৰ সঙ্গে সঙ্গে।

সাইকেলে চাপল মুসা। আস্তে আস্তে প্যাডাল কৰে এগিয়ে চলল। চিতা চলল তাৰ পাশে পাশে।

রাতের অন্ধকারে যে হারিয়ে গেল দুজনে, বাড়িৰ কেউ জানল না। তেমনি নীৱৰ হয়ে আছে বাড়িটা। কেবল মাঝে মাঝে ক্যাচকোচ কৰিছে রাম্ভাঘৰেৰ দৱজাৰ কজা, খুলে বেরোনোৰ পৰ পান্নাটা লাগাতে তুলে শিয়েছিল মুসা।

পৰদিন সকালে অনেক বেলায়ও মুসাৰ সাড়া না পেয়ে তাকে ডাকতে গেলেন মা। দেখেন, দৱজা খোলা। ঘৰে কেউ নেই। বাথৰুমেও না। গেল কোথায় ছেলেটা? তাকে না বলে তো কোথাৰ যাব না!

বিছানার ওপৰ বড় একটা সাদা খাম পড়ে থাকতে দেখলেন তিনি।

তুকু কুঁচকে গেল তাঁৰ। তুলে নিলেন। শুধু খোলা। তেতোৱে একটুকৰো কাগজ। একটা চিঠি।

গভীৰ মুৰে ডাইনিং রংমে নেমে এলেন তিনি। টেবিলে চা খাচ্ছেন আৰ খবৰেৰ কাগজ পড়ছেন মিস্টাৰ আমান। নীৱবে তাঁৰ সামনে এনে চিঠিটা ফেললেন মুসাৰ আস্মা।

তুকু কুঁচকে একবাৰ, স্ত্ৰীৰ মুৰেৰ দিকে তাকিয়ে চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়লেন আমান। মুসা লিখেছে :

ମା,

କହେକ ଦିନେର ଜନ୍ୟେ ଚଲେ ଗେଲାମ । ତିତାର କାନ ଭାଲ ନା ହଲେ ଆର କିରବ ନା । ତାବୁ ଆର ଦରକାରୀ ଜିନିସପତ୍ର ନିଯେ ଗେଲାମ । ଦୁଃଖିତା କୋରୋ ନା । ରବିନ ଆର କିଶୋର ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେ ବୋଲେ, ପିକନିକେର ଜନ୍ୟେ ନୃତ୍ନ ଯେ ଜାୟଗାଟା ବେହେଛି ଆମରା, ସେଥାନେ ଗେଛି, ସୋନାଲି ଝନ୍ନାୟ ।

—ମୁସା ।

ପଡ଼େ ଗୁଡ଼ିର ହେଁ ଆମାନ ବଲନେ, ‘ଅତ୍ତା ନା ଧମକାଲେଓ ପାରତେ । ଏକଟା କୁତ୍ତା ନାହଯ ଏନେହେଇ । ଅନେକ ଛେଲେଇ ପୋଷେ ଓରକମ !’

‘ତାଇ ବଲେ ନା ଜାନିଯେ ଚଲେ ଯାବେ?’

‘ଯାବେଇ ତୋ । ମୁସା ଅନେକ ଭାଲ ଛେଲେ । ନାହଲେ ତୁମି ଯେମନ ଧମକା-ଧମକି କରୋ, ଅନେକ ଛେଲେଇ ସହ୍ୟ କରତ ନା, ଅନେକ ଆଗେଇ କିଛୁ କରେ ବସତ । ସେ ତୋ କିଛୁଇ ବଲେ ନା ।’

‘ଆମି ତୋ ଓର ଭାଲର ଜନ୍ୟେଇ ବକି । ତାଇ ବଲେ କି ଆମି ଓକେ ଭାଲବାସି ନା?’

‘ବାସୋ, ନିଚିଯାଇ । କିନ୍ତୁ ଏକଟା କଥା ମନେ ରାଖା ଦରକାର ଆମାଦେର, ଓ ଏଥିନ ଆର ଅତ ଛାଟ ନେଇ । ସେଇ ମତଇ ଆଚରଣ କରା ଉଚିତ ତାର ସ୍ଵର୍ଗେ । ବେଶ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରଲେ ବିଗଡ଼େ ଯେତେ ପାରେ ।’

ଦୁଇ

ଦୁପୂର ବେଳା ବାସ ଥେକେ ନାମଲ ରବିନ । ମେଇନ ରୋଡ ଥେକେ ନେମେ ଏଲ ଏକଟା ଆକାବାକା ପଥେ । ପଥଟାର ଦୁଇ ଧାରେ ଝୋପଝାଡ଼, ତାର ମଧ୍ୟେ ମାଥା ଉଚ୍ଚ କରେ ଆଛେ କିଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଛ । ପିଠିୟେ ବୀଧା ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ, ଆରେକଟା ବ୍ୟାଗ ହାତେ ଝୋଲାନୋ । ଖମିକଟା ହେଟେ ଏସେ ତାକାଲ ଏନ୍ଦିକ ଓଦିକ । ମୁସାକେ ଝୁଙ୍ଗଳ । ଏଇ ଝୋପଝାଡ଼ର ମଧ୍ୟେ ଓକେ ଝୁଙ୍ଗେ ବେର କରା କଠିନ ହବେ । କୋଥାଯ ଆଛେ କେ ଜାନେ ।

କପାଲେର ଘାମ ମୁହଁଲ ସେ । ଜିରାତେ ବସନ ଏକଟା ଝୋପେର ପାଶେ । ମିନିଟିଖାନେକ ପରେଇ ‘ହୁକ୍’ କରେ ଏକଟା ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ ହଲୋ ଆରେକଟା ଝୋପେର ଭେତର ।

ମାଥା ସୋଜା କରେ ସେଦିକେ ତାକାଲ ରବିନ । ସନ୍ଦେହ ହଲୋ । କିଛୁ ଆଛେ ଓର ମଧ୍ୟେ । ଉଠେ ପାଯେ ପାଯେ ଏଗୋଲ ସେଦିକେ । ସାମନେ ଥେକେ କିଛୁ ଦେଖା ଗେଲ ନା । ଘୂରେ ଚଲେ ଏଲ ପେଛନେ । କଟାଝୋପେର ଭେତର ଶୁଯେ ଥାକତେ ଦେଖିଲ ମୁସା ଆର ଏକଟା କୁକୁରକେ ।

‘ବାହ, ବେଶ ଆରାମେଇ ଆହ ଦେଖଛି ।’

ଚୋଖ ମେଲିଲ ମୁସା । ଲାକ୍ଷିଯେ ଉଠେ ବସନ, ‘ଏସେହ ! ତୋମାର ଜନ୍ୟେଇ ବସେ ଆହି । କୋଥାଯ ଆବାର ଗିଯେ ଝୁଙ୍ଗବେ । କଥନ ଯେ ଚୋଖ ଲେଗେ ଏଲ...ଜାନତାମ ତୁମି ଆସବେ ।’

‘ସକାଲେ ଗିଯେଇ ପେଯେ ଗେଲାମ ତୋମାର ଚିଠି । ଚଲେ ଏଲାମ ।’

‘କିଶୋର ଆସେନି?’

‘ନାହ । ଗିଯେଛିଲାମ । ଆଟିକେ ଦିଯେଛେନ ମେରିଚାଟି । ଏକଗାଦା ମାଲ ଏନେ ହାଜିର କରେଛେନ ରାଶେଦଚାଚା । ଆରା ଆନତେ ଗେହେନ । କିଶୋର ଫଳେକ ଦିନ ଆର ବେରୋତେ

পারবে বলে মনে হয় না। বলে এসেছি, ফাঁক পেলেই চলে আসতে।'

'ইঁ। তিনজন নাহলে জমে না। ছুটির শুরুতেই এবার ঘাপলা হয়ে গেল। বাকিটা কি হবে কে জানে। তারপর, মা কিছু বলন?'

'সাবধানে থাকতে বলেছেন।'

'চিতার কথা কিছু বলন না?'

'না। এটাই তাহলে তোমার চিতা? কুকুরটা কিন্তু ভালই মনে হচ্ছে। রেখে দেয়ার ইচ্ছে নাকি?'

'দেখি। মাকে নিয়ে মুশকিল। রাখতে দেবে কিনা আপ্পাই জানে।'

এদিক ওদিক তাকান রবিন। আবার ফিরল মুসার দিকে, 'ক্যাম্প করেছ কোথায়?'

'ঝর্নাটার কাছে। যেটা সেদিন দেখে গিয়েছিলাম আমরা।'

'চলো, যাই।'

রোপ থেকে বেরোল মুসা। রবিনের পাশাপাশি ইঁটতে ইঁটতে বলল, 'কিশোর এলে আরও মজা হত। চিতার কান শুকাতে কয়েক দিন লাগবে। ততদিন চুটিয়ে পিকনিক করতে পারতাম। জায়গাটা সত্যি ভাল, তাই না? কয়েক মাইলের মধ্যে মানুষজন নেই। একলা শুধু আমরা।'

মুসার প্রায় পা ঘেঁষে চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল চিতা। নাক তুলে বাতাস প্রক্ষেত্রে লাগল।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'অ্যাই চিতা, তুই আমাকে চিনিস?'

কুকুরটা শুধু বলল, 'ঘোও।'

কি করে চিনবে? আর কি কখনও দেখেছে? তবে দেখো, ভাব হতে দেরি হবে না। শুব ভাল মানুষ ও। বৃদ্ধিও আছে।'

'কিন্তু ও ওরকম করছে কেন?'

কুকুরটার দিকে ভাল করে তাকান মুসা। 'বোধহয় খরগোশের গন্ধ পেয়েছে।'

পা তুলে কাটা কানটা চুলকানোর চেষ্টা করল চিতা। হার্ডবোর্ডের জন্যে নাগাল পেল না।

'কলার লাগিয়েছ বটে একটা। হাহ হা! বৃদ্ধিটা কার?'

'ডাক্তারের।'

'ওর অসুবিধে হয় না?'

'তা তো কিছুটা হয়ই। বেশি অসুবিধে খরগোশের গর্তে ঢোকার। অথচ আদার পর থেকে এই কাজটাই বেশি করতে চাইছে।'

'জিনার রাফিয়ানের মত।'

'আসলে সব কুকুরেই এক স্ফৱাৰ।'

'ইঁ। আচ্ছা, রাত্তায় কুকুর এল কোথাকে? ছাড়া থাকার তো কথা নয়। কার কুকুর?'

'কি জানি।'

ছোট একটা পাহাড় ডিঙালো ওৱা। মুসা বলল, 'পাহাড়ের ঢালে একটা

পুরানো কটেজ দেখেছি। অনেক আগের বাড়ি। লোকজন থাকে না। দেয়াল ধসে
গেছে। রোজ-ব্যাস্তারের ঝাড়ে হেয়ে আছে দেয়াল।'

'ভেতরে চুকেছে?'

'মাথা খারাপ! একলা চুকব!'

হাসল রবিন, 'ভৃত্যের ভয়ে?'

'দেখো, সব সময় ঠাট্টা কোরো না। যা বাড়ির বাড়ি, ওটাতে ভৃত থাকতেই
পারে।'

লোকজন এদিকে বিশেষ আসে বলে মনে হয় না। জন্ম-জানোয়ার, বিশেষ
করে খরগোশ আর শেয়াল চলাচলের ফলে খুব সরু একটা পথ তৈরি হয়েছে।
সেটা ধৰে এগোল ওরা।

ঁশিয়ার করে দিল মুসা, 'দেখে চলো! যাওয়ার সময়ও একটা র্যাটলস্নেক
দেখে গেছি। রাস্তার ওপরেই শয়ে ছিল।'

ম্যাপ দেখে গোড়েন স্পিঙ্গকে তাদের নতুন পিকনিক স্পট হিসেবে বাছাই-
করেছে তিন গোয়েন্দা। এক রোববারে এসে দেখেও গিয়েছে। বেশিদূর ঘূরতে
পারেনি। অনেক জায়গাই অচেনা রয়ে গেছে।

'গোসলের জায়গা আছে নাকি কাছাকাছি? লেক-টেক?' জিজেস করল
রবিন। 'ঘেমে গেছি। পানিতে নামতে পারলে ভাল হত।'

'জানি না। দেখার সময় পাইনি। ওই যে দেখো, বাড়িটার খানিকটা দেখা
যাচ্ছে।'

তাঁবুটাও শীঘ্ৰ চোখে পড়ল রবিনের। ঝর্নার ধার ঘেঁষে পেতেছে। পানি
পাওয়ার সুবিধের জন্যে।

কাছে এসে তাঁবুর ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল সে। নরম ডালপাতা পুরু করে
বিছিয়ে বিছানা করেছে মুসা। এক কোণে একটা মগ, এক ব্যাগ কুকুরের বিস্কুট,
কয়েকটা খাবারের টিন, আর আধখাওয়া একটা পাঁউরুটি রাখা।

তাড়াহড়োর জন্যে তেমন কিছু আনতে পারেনি মুসা, বুঝল রবিন। সে নিজে
যে অনেক কিছু নিয়ে এসেছে সেটা ভেবে খুশি হলো। প্রচুর স্যাগউইচ তৈরি করে
দিয়েছেন তার মা। কয়েক দিন চলবে। এখনই কয়েকটা খেয়ে ফেললে মন্দ হয়
না। খিদে পেয়েছে।

তাঁবুর ছায়ায় বসে খাবারের প্যাকেট খুলল রবিন। স্যাগউইচ আর টমেটো
বের করল। দেখে দারুণ খুশি মুসা।

আয়েশ করে চিবাতে লাগল দুজনে। স্যাগউইচে এক কামড় দেয়, তারপর
আরেক কামড় দেয় টমেটোতে। চিঁতা খাচ্ছে তার জন্যে আনা বিস্কুট। একটা
স্যাগউইচও দেয়া হয়েছে তাকে।

কয়েক কামড়েই সেগুলো গিলে নিয়ে উঠে পড়ল সে।

'কোথায় যায়?' রবিনের প্রশ্ন।

'মনে হয় পানি খেতে। চলো, আমরা ও খেয়ে আসি।'

মগ নিয়ে রওনা হলো ওরাও। ঝোপঝাড়ের অভাব নেই। কোথাও ঘন,

কোথাও পাতলা। তার ডেতর দিয়েই এগোল। ঝর্নাটা খুব সুন্দর। পাড়ে তৈরি করা হয়েছে কটেজ। বাড়ির কাছ থেকে খানিক দূরে এক জায়গায় থেকে গেছে ঝর্না। ওখানে প্রচুর পাথর পড়ে আছে পানিতে। ওগুলোতে বাড়ি থেয়ে যাচ্ছে স্নোত। পাথরের জন্যে পাড়ের মাটির ক্ষতি করতে পারছে না পানি, ক্ষয় করতে পারছে না। বাকের কাছে পানির সামান্য ওপরে পড়ে আছে বড় একটা সাদা পাথরের ফলক।

টলটলে পরিষ্কার পাঁচি, দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে। পানিতে হাত চুবিয়ে বলে উঠল রবিন, ‘আহ, একেবারে বরফ! যা তেষ্টা পেয়েছে, মনে হচ্ছে সব খেয়ে ফেলতে পারব।’

পানি খেয়ে এসে তাঁবুর পাশে শয়ে পড়ল ওরা। কথা বলতে লাগল।

‘যা-ই বলো,’ রবিন বলল, ‘জায়গাটা ভারি চমৎকার। মানুষ নেই, জন-চেনই, হইচই নেই। শুধু পাখি আর খরগোশ। খুব ভাল লাগছে।’

‘ঠিক। বিরক্ত করার কেউ নেই,’ হাই তুলন মুসা।

এই সময় শোনা গেল শব্দটা। দূরে। ঠিক করে পাথরে বাড়ি লাগল ধাতব কোন জিনিস। পর পর কয়েকবার শোনা গেল একই শব্দ, তারপর খেমে গেল।

উঠে বসেছে মুসা। ‘কিসের শব্দ কিছু বুঝলে?’

‘না। অনেক দূরে। এত চুপচাপ এখানে, বহু দূরের শব্দও শোনা যায়।’

কয়েক মিনিট পর আবার শুরু হলো শব্দ। আগের বারের মতই কয়েকবার হয়ে খেমে গেল। ততক্ষণে ঘৃমিয়ে পড়েছে দূজনে। বাতাসে কেবল এখন ঘাসের ওটি ফাটার পুট-পুট-পুট আওয়াজ। ফাটছে, আর ছড়িয়ে দিচ্ছে কালো বীজগুলো।

ফিরে এসে মুসার পায়ের ওপর বসে পড়ল চিতা।

চমকে জেগে গেল মুসা। ‘এই, এই শয়তান, সর! বসার আর জায়গা পেল না! কানা নাকি?... খাইছে, এ-ব্যাটা ওই হাস্তি নিয়ে এল কোথেকে?’

চেচামেচিতে রবিনও জেগে গেল। তবে পুরোপুরি জাগল না, চোখ আধবোজা করে বলল, ‘আমি হাড়তাড় আনিনি।’

‘তোমার কথা বলিনি। ও পেল কোথায়?’

‘পুরোই জেগে গেল রবিন। ‘খরগোশ মেরেছে হয়তো।’

‘মা, খরগোশের হাড় নয়। থেকেছে রাস্তায় রাস্তায়, ফকিরা স্বত্বাব কি আর সহজে যায়। যা পায় তুলে নিয়ে আসে। জলদি বল, কোথায় পেয়েছিস?’

চিতাটা মনে করল, মুসাও ভাগ চাইছে। হাড়টা মুখে নিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, ‘ইউ।’

‘দূর ব্যাটা, সর এখান থেকে! আমি আর কাজ পেলাম না, তোর পচা হাস্তি থেকে যাই।’

উঠে বসে হাই তুলতে তুলতে রবিন বলল, ‘হয়তো কাছেই অন্য কেউ ক্যাম্প করেছে। কেড়ে আনিন তো? অন্য কোন কুত্তার কাছ থেকে?’

‘আনতেও পারে। এই ফেল, ফেলে দিয়ে আয়! জলদি যা! রাস্তা থেকে আর কখনও কিছু তুলে আনবি তো মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।’

আবার শুরু হলো সেই ধাতব শব্দ।

এবার আর গুরুত্ব না দিয়ে পারল না গোয়েন্দারা ।
মুসা বলল, ‘তোমার কথাই ঠিক । আরও কেউ ক্যাম্প করেছে । চলো, দেখে
আসি ।’

তিন

রোদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল দুজনে । পায়ের কাছে রয়েছে চিতা ।

কটেজটাকে পাশ কাটানোর সময় রবিন বলল, ‘চলো, ভেতরটা দেখে যাই ।
নিচয় অনেক পুরানো ।’

‘যাব?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো । দিনের বেলা ভূতের ভয় নেই ।’

চওড়া দরজায় এসে দোড়াল ওরা । পাথরে তৈরি ধনুকের মত খিলান । পান্নার
চিহ্নও নেই । বছদিন আগেই গায়েব । ভেতরে অনেক বড় একটা ঘর । পাথরের
মেঝে । এক সময় সমান ছিল, এখন উচ্চনিচু হয়ে আছে । ফাঁকে ফাঁকে ঘাস
গজিয়েছে ।

জায়গায় জায়গায় ধসে পড়েছে দেয়াল । আলো আসছে সেপথে । একটা
জানালা মোটামুটি ঠিকই আছে, বাকিশুলোর জায়গায় কেবল ফোকর । কিছু
নেই । এক কোণ থেকে পাথরের সঞ্চ সিঙ্গি উঠে গেছে ।

‘ওপর তলায়ও ঘর আছে,’ রবিন বলল । ‘ওই যে, আরেকটা দরজা ।’

সেটা দিয়ে ছোট আরেকটা ঘরে যাওয়া যায় । সেখানে পুরানো একটা সিংক
আছে । আর কিছু ভাঙচোরা জিনিস, একটা হ্যাণ্ড-পাস্পের অবশিষ্ট ।

‘দেখার তেমন কিছু নেই । ওপর তলার অবস্থাও ভাল হবে না । এই যে,
আরেকটা দরজা,’ বলতে বলতে নিয়ে বন্ধ পাল্লায় ঠেলা দিল মুসা ।

এক ঠেলাতেই মরচে পড়া ভাঙা কজা থেকে পাল্লাটা ছুটে গিয়ে থপাস করে
পড়ল বাইরের ঘাসের ওপর । অ্যত্রে, অবহেলায় জংলা হয়ে আছে ওখানে ।

‘খাইছে । এতটা পচে গেছে কল্পনাই করিনি ।’

পেছনের উঠানে উকি দিয়ে দেখতে দেখতে রবিন বলল, ‘ছাউনি ছিল এখানে ।
খৌয়াড় ছিল । হাঁস-মূরগী পালত । ওই দেখো, একটা শুকনো ডোবা ।’

অনেক কিছুই ছিল এখানে, সব ধূঃস হয়ে গেছে । ছোট একটা আস্তাবলও
আছে, ঘোড়া আর নেই তাতে । পড়ে আছে মরচে পড়া লোহার নাল । দেয়ালে
গাঁথা কৌলকে এখনও বোলানো রয়েছে একটা লাগাম ।

‘পুরানো বাড়িতে ঢুকলেই আমার কেমন গা হমহম করে, বুঝলে,’ মুসা বলল ।
‘মনে হতে থাকে, এই বুঝি সাংঘাতিক কিছু ঘটল । কিন্তু অবাক লাগছে, এখানে সে
রকম কোন অনুভূতি হচ্ছে না । মানুষগুলো এখানে সুখেই ছিল মনে হয় । মনে হচ্ছে,
এখনই মূরগী কক্ষ-কক্ষ করবে, হাঁস ডাকবে...’

কাঁক-কোয়াক! কাঁক-কোয়াক!

কক-কক! কক-কক! কক-কক!

বলতে না বলতেই ডেকে উঠল হাঁস-মুরগী। ভীষণ চমকে গেল দুজনে। ঘটে
করে তাকাল পরম্পরের মুখের দিকে।

‘আপ্পারে, এ-কি?’ চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। ‘হাঁস-মুরগীর ডাকই
গুলাম তো! কোথায় ওশুলো?’

রবিনও তাজ্জব হয়ে গেছে। বিড়িবিড়ি করল, ‘এখন ঘোড়া ডেকে না উঠলেই
বাঁচি।’

বলেও সারল না সে, ঘোড়ার নাক ডাকার আওয়াজ হলো।

‘আপ্পারে, গেছিরে, ভূত!’ বলেই দৌড় দিতে গেল মুসা।

হাত ধরে ফেলল রবিন। ‘দাঁড়াও। দেখি।’

মুসার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে চোখ উল্টে পড়ে যাবে।

আবার মুরগীর কক-কক শোনা গেল।

‘বিশ্বাস করতে পারছি না!’ আনমনে বলল রবিন। ‘শোনার ভুল একসঙ্গে
দুজনের হতে পারে না। তারমানে সত্যি ডাকছে। চলো তো, আস্তাবলের ওদিকে
যেতিঃ?!

‘চিতাটা গেল কোথায়? এই চিতা, চিতা?’ গলা চড়িয়ে ডাকতে সাহস পেল
না মুসা।

চিতার সাড়া নেই। জবাবে শোনা গেল শিস। অনেক সময় কুকুরকে ডাকে
যেতাবে মানুষ।

জোরে ডাক দিল রবিন, ‘চিতা! কোথায় তুই?’

ঝোপের ডেতর থেকে বেরিয়ে এল কুকুরটা। কেমন যেন বোকা বোকা ভঙ্গি।
লেজ নাড়ছে।

আরও অবাক হয়ে গেল দুই গোমেন্দা। নীল রঙের একটা ফিতে বাঁধা লেজে।

‘আই, তুই ফিতা কোথায় পেলি?’ মুসার চোখ যেন আর কোটেরের মধ্যে
থাকতে চাইছে না। ‘বাঁধন কে? রবিন, আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না...’

জবাব দিল না রবিন। কুকুরটার লেজ থেকে ফিতেটা খুলে নিল। তারপর
বলল, ‘আর যাই হোক, ভূত নয়। ভূতে ফিতে বাঁধে না।’

‘বলাও যায় না। কৃত রকমের ভূত আছে।’

কুকুরটাকে জিজ্ঞেস করল রবিন, ‘কোথেকে আনলি এটা?’

ফ্যালফ্যাল করে কেবল তাকিয়ে রইল চিতা। কিছু বোঝাতে পারল না।

মুসাকে নিয়ে বাড়িটায় খুঁজতে শুরু করল রবিন, কিছুই পেল না। মানুষের
ছায়াও দেখল না। হাঁস নেই, মুরগী নেই, ঘোড়া নেই।

ভুরু নাচিয়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, ‘এবার? এবার কি বলবে?’

‘আগের কথাই। ভূতুড়ে মনে হলেও ভূতের কাও নয়। পাশ দিয়ে হয়তো কেউ
যাচ্ছিল, আমাদের কথা শনে মজা করার লোভ সামলাতে পারেনি।’

‘তাহলে সেই কেড়টা এখন কোথায়?’

বাড়ির বাইরেও খোঁজুঁজি করল ওরা। কাউকে দেখাটো পেল না। ধাতব শব্দ
কে করেছে জানতে যাওয়ার আর ইচ্ছে হলো না। ক্যাম্পে ফিরে এল।

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে ওরা। শয়ে আছে চিতা। হঠাতে লাফিয়ে উঠে বসল। দৌড়ে গেল একটা ঘন ঝোপের কাছে। ডেতরে ঢোকার চেষ্টা করল।

‘আবার কি দেখল?’ মুসার প্রশ্ন। ‘পাগল হয়ে গেল নাকি কুণ্ডাটা! কি রকম করছে? এই ব্যাটা, আয়, আয় বলছি!’

হার্ডবোর্ডের কলারের জন্যে চুক্তে পারল না চিতা। পিছিয়ে এল। ঠেলাঠেলিতে বেংকাতেড়া হয়ে গেছে কলারটা।

কেউ! কেউ! করে দুইঘার চিকন ইঁক দিয়ে বোপ থেকে বেরিয়ে এল আরেকটা ছোট জাতের কুকুর। এত বেশি মোটা, প্রায় গোল হয়ে গেছে। একটা চোখ কানা। ভাল চোখটা অস্থাভাবিক বড়, চকচকে। শরীরের অর্ধেক সাদা, অর্ধেক কালো, অনেক লম্বা লেজ, কিন্তু তাতে লোমের পরিমাণ খুব কম। গদগদ ডঙ্গিতে ঘন ঘন নাড়ছে সেটা।

‘খাইছে! এটা এল কোথেকে? চিতার সঙ্গে ভাবই বা হলো কখন? দেখো রবিন, যা-ই বলো, এ ভৃতের কারবার ছাড়া আর কিছু না।’

রবিন চুপ করে দেখছে কুকুরটোকে। তখন যে হাড়টা এনেছিল চিতা, সেটা গর্ত করে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল। অন্তু এই কাণ্ডটা প্রায় সব কুকুরই করে, জানে সে। হাড় পেলে গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে রাখে। কেন করে এই কাজ, বড় বড় কুকুর-গবেষকও এর জবাব দিতে পারেননি। হাড়টা এখন বের করে অন্য কুকুরটাকে সাধতে লাগল চিতা। মেহমানকে খাতির করছে।

কিন্তু মেহমান ওই গন্ধওলা হাড়ের প্রতি কোন আগ্রহই দেখাল না।

‘নাহ, মাথাটাই খারাপ করে দেবে এই ফকিরা কুণ্ডাটা! কপালে হাত দিয়ে বলল মুসা। ‘কি যে করছে! এরপর দেখা যাবে একটা বেড়াল সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির...’

বলতে না বলতেই ঝোপ থেকে বেড়াল ডেকে উঠল মিআউ করে।

কান খাড়া করে ফেলল দুটো কুকুরই। ঝোপের কাছে ছুটে গেল। বিকট ঘেউ ঘেউ করে ডেতরে ঢোকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল চিতা, কলারটার জন্যে এবারেও পারল না।

ঝোপটার কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। চিতাকে বলল, ‘সর, সর দেখি। মুসা, এগুলোকে আটকাও। আমি বেড়ালটাকে বের করি। এল কোথেকে এসে জানোয়ার!’

চিতাকে এক থালড় দিয়ে সরিয়ে দিল মুসা। অন্য কুকুরটার কলার টেনে ধরে রাখল। উত্তেজিত হয়ে একমাত্র চোখের দৃষ্টি মেলে ঝোপের দিকে তাকিয়ে আছে। ওটা, জোরে জোরে নাড়ছে লেজ।

বসে পড়ে হামাঙ্গি দিয়ে ঝোপের মধ্যে মাথা চুকিয়ে দিল রবিন। বাইরের রোদের আলোর তুলনায় ডেতরটা বেশি অন্ধকার। প্রথমে কিছু দেখল না। চোখে আলো সয়ে আসতেই একটা ধাক্কা খেলো যেন।

গোলগাল একটা হাসিখুশি মুখ তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। জুলজুলে চোখ। লম্বা চুলে কপাল ঢাকা। হাসিটা বাড়ল, বেরিয়ে পড়ল সুন্দর সাদা দাঁত।

‘মিআউ! আবার বেড়ালের ডাক ডাকল সে।
‘দেখেছ?’ বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।
‘হ্যাঁ। বেড়াল নয়।’

রবিনের উত্তেজিত কষ্ট শনে ঘুরে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল মুসা। ‘তবে কি ভু...’

‘মুনূর। এই ছেলে, বেরিয়ে এসো। তোমার চাঁদবদনখানা দেখি।’

খড়মড় শব্দ করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল ছেলেটা। বয়েস বারো-তেরো হবে। ‘রংগে গেছ, না?’

ছুটে শিয়ে তার গাল চেঁটে দিল চিতা।

আবাক হয়ে গেছে মুসা। এত খাতির! ছেলেটার কুকুরই না তো? বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পড়েছিল পাজি ছেলেগুলোর পান্নায়? খবর পেয়ে নিতে এসেছে এখন লে? জিজ্ঞেস করল, ‘আমার কুত্তাটার সঙ্গে খাতির হলো কি করে তোমার?’

‘আমার ক্যাম্পে বসেছিলাম,’ জানাল ছেলেটা, ‘এমন সময় কুকুরটা শিয়ে হাজির। একটা হাড় সাধলাম, নিয়ে নিল। কেন গেছে, বুঝলাম।’ কানা কুকুরটাকে দেখিয়ে বলল, ‘আমার কার্বের সঙ্গে ভাব করার জন্যে।’

হাঁপ ছাড়ল মুসা। চিতার মালিক ছেলেটা নয়। বলল, ‘কার্ব! এটা কেমন নাম হলো?’

‘কার্ব হলো কার্বোহাইড্রেটের সংক্ষেপ। আগে নাম ছিল পাম। খেয়ে খেয়ে শরীরে কার্বোহাইড্রেট জমে মোটা হয়ে যাওয়ায় পরের নামটা রেখেছি।’

হেসে ফেলল মুসা, ‘পামটাও খারাপ ছিল না। পামকিনের সংক্ষেপ। কুমড়োই তো বেশি মানানসই।’

ছেলেটা ও হাসল। ‘তা মন্দ বলোনি। কিন্তু তোমার কুত্তাটার গলায় হার্ডবোর্ড পরিয়েছ কেন?’

‘কানে জবম। যাতে চুলকাতে না, পারে। তুমিই ওর লেজে ফিতা বেঁধেছিলে?’

‘হ্যাঁ। একটু মজা করলাম তোমাদের সঙ্গে।’

‘হাঁসের ডাক আর মুরীর ডাকও তুমিই দেকেছিলে,’ রবিন বলল।

‘হ্যাঁ। তো, এখানে কেন এসেছ? ঘুরতে, নাকি গাছপালা নিয়ে গবেষণা? ইঙ্গুলের টাক্ষ?’

‘ঘুরতে এসেছি। কয়েক দিন ছুটি কাটাতে। তুমি?’

‘মাটি খুঁড়তে।’

হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুসা। পাগল নাকি ছেলেটা!

রবিনও আবাক হয়েছে। ‘মাটি খুঁড়তে?’

‘বুঝালে না?’ আবার হাসল ছেলেটা। ‘আমার আব্বা প্রত্নতাত্ত্বিক। মাটি খুঁড়ে প্রাচীন জিনিস বের করাটা তার নেশা। কাজটা আমারও ভাল লাগে। অনেক আগে এখানে ইন্ডিয়ানরা বাস করত। ধারণা করা হয়, ওদের অনেক প্রাচীন একটা শহর ছিল এখানে। ছুটি পেয়ে আমি খুঁড়তে এসেছি। ওদের ব্যবহার করা জিনিস খুঁজছি। ইংড়ি-কুঁড়ি, বাসন-পেয়ালা, অঙ্গু, এসব।’ পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে

দেখাল সে, 'এই দেখো, কি পেয়েছি।'

মুদ্রাটা হাতে নিয়ে দেখল রবিন। ভুক্ত কুঠকে গেছে। 'ইনডিয়ানদের! অত আগে মুদ্রা ব্যবহার করত বলে তো শুনিনি!'

'না, স্প্যানিশদের। কয়েক শো বছর আগে এখানে ক্যাম্প করে থেকেছে ওরা। কলোনি করার ইচ্ছে ছিল হয়তো, পরে কোন কারণে করেনি।'

মুদ্রাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল রবিন, 'শুনতে ভালই লাগছে।'

'তার মানে ইতিহাসে ইস্টারেস্ট আছে তোমার।'

'আছে। একদিন দেখতে যাব তোমার মাটি খোঁড়া...'

'না না,' জোরে মাথা নাড়ল ছেলেটা, 'যেয়ো না, শীঝি! জরুরী কাজ করছি। কাজের সময় লোকজন ভাল লাগে না। আর আমি তোমাদের বিরক্ত করতে আসব না, কথা দিচ্ছি। তোমরাও আমাকে কোরো না।'

'বেশ। করব না।'

'কিছু মনে করলে না তো আবার?'

'না। বুঝতে পারছি তোমার অসুবিধে। মন দিয়ে আমি যখন কোন কাজ করি, কিংবা বই পড়ি, তখন কেউ কাছে গেলে আমারও বিরক্ত লাগে।'

হসল ছেলেটা। 'আমিও তোমাদের বিরক্ত করতে আসতাম না। কুকুরটা গেল তো, ভাবলাম কার কুকুর, দেখে যাই। বলে যাই, আমার ক্যাম্পের কাছে যেন না যায়।'

'নিজের কাছে যেতে তো খুব বাধা দিচ্ছ,' ফস করে বলে বসল মুসা, 'কিন্তু আমাদের যে তয় দেখালেন?'

'সরি। আমি সত্যিই দুঃখিত। বললাম তো, আর আসব না। তোমরা তোমাদের মত থাকো, আমি আমার মত থাকব।'

শিশ দিয়ে কার্বকে কাছে ডাকল ছেলেটা। কুকুরটাকে নিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে গেল।

মুসার দিকে ঘুরল রবিন, 'আজব ছেলে, তাই না?'

'মাথায় ছিট আছে।'

'তবে ভাল ছেলে। আমার কিন্তু খারাপ লাগেনি।'

'আমার লেগেছে, ওর কথাবাতা। বড় বড় বোলচাল।'

চার

নাত্তার সময় হয়েছে, ঘড়ি তো জানান দিচ্ছেই, পেটও বলছে। এমন কি চিতার পেটও। গরম অসহ্য লাগছে তার। একটু পর পরই শিয়ে ঝর্না থেকে পানি খেয়ে আসছে। পিপাসা অন্য দুজনেরও লাগছে। ভাবছে, একটা জগ হলে ভাল হত। ছেট মগে হচ্ছে না। বার বার যেতে হচ্ছে ঝর্নায়।

বিস্কুট, স্যাওউইচ আর চকলেট দিয়ে নাত্তা সারল ওরা।

কুকুরটার কান পরীক্ষা করে রায় দিল মুসা, অনেক ভাল হয়ে গেছে।

‘কিন্তু কলারটা খোলা বোধহয় উচিত হবে না,’ রবিন বলল। ‘আঁচড়ে আবার যা বাঢ়াবে !’

‘অত সহজে আমি খুলছিও না। আচ্ছা, কি করা যায় এখন, বলো তো ? বসে থেকে কি করব, চলো একটু হেঁটে আসি।’

‘চলো...শোনো, ধাতব শব্দ। মাটি ঝুঁড়ছে ছেলেটা। কি করে দেখতে ইচ্ছে করছে ?’

‘আমারও করছে। কিন্তু যাব না, কথা দিয়েছি আমরা। কথা রাখা উচিত।’

‘তা ঠিক।’ যদিক থেকে শব্দ আসছে তার উল্লে দিক দেখিয়ে রবিন বলল, ‘চলো, ওদিকে যাই। পথ হারাব না তো ?’

‘পথ হারাব কেন? আর কুকুরটা তো আছেই। সে-ই পথ দেখাবে। চিতা, চাঁদের আলোয় বাড়ি ফিরতে পারবি তো?’

‘ঘাউ’ করে জবাব দিল কুকুরটা।

‘পারবে, বলল।’

‘কি করে বুবালে? ও তো ওর নাম শুনলেই ঘাউ করে। যাকগে, বেশি দূরে না গেলেই হবে, পথ হারানোর ভয় থাকবে না। ইন্দু, কিশোর থাকলে এখন আরও মজা হত। আচ্ছা, ও এখন কি করছে, বলো তো?’

‘কি আর। মুটেগিরি। মাল সরাচ্ছে ইয়ার্ডে। আসবে কখন?’

‘বলল তো সুযোগ পেলেই চলে আসবে।’

‘পালায় না কেন?’

‘বেশি চাপ পড়লে ঠিকই পালাবে।’

সুন্দর বিকেল। হাঁটতে ভাল লাগছে। খরগোশেরা জটলা করছে। সেগুলোকে তাড়া করতে চাইছে চিতা, আটকে রেখেছে মুনা। ফলে খুব মন খারাপ কুকুরটার। তাবছে যেন, চুপচাপ বসে খরগোশের কাও দেখার কি মানে হয়? ওগুলোকে বানানোই হয়েছে তাড়া-করার জন্যে। কলার ছেটানোর জন্যে টানাটানি করে দেখেছে সে, গুড়িয়ে গুড়িয়ে প্রতিবাদও করেছে। কোন ফল হয়নি। রেঁগে গিয়ে শেষে একটা ভাল ভেঙে নিয়েছে মুনা, বেশি বেয়াড়াপনা করলে পেটানোর জন্যে।

এক জায়গায় বসে কিছুক্ষণ খরগোশের খেলা দেখল ওরা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আর বেশি দূরে না গিয়ে ক্যাম্পে ফিরে চলল। তাঁবুর কাছাকাছি আসতেই নরম শিস কানে এল। আবার কে?

বড় একটা ঝোপ ঘুরে অন্য পাশে আসতে দেখা হয়ে গেল ছেলেটার সঙ্গে। অঞ্জের জন্যে ধাক্কা লাগেনি। চুপচাপ ওদের কাছ থেকে সরে যেতে চাইল সে।

‘আবাক হয়ে মুনা জিজ্ঞেস করল, ‘আবার এসেছ? বললে না আর আসবে না?’

ওদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ছেলেটা। কপালে এসে পড়া লম্বা চুল সরাল। বলল, ‘না, এমন কথা বলিনি।’

‘নিচয় বলেছ! রবিন বলল, ‘তুমি তোমার কথা রাখোনি, আমরাও রাখব না। তোমার ক্যাম্পের কাছে যাব এবার।’

‘আমি কোন কথা দিইনি,’ ছেলেটাও যেন অবাক হয়েছে ওদের কথা শনে।

‘বাহ, চমৎকার,’ মুখ বাঁকিয়ে বলল মুসা। ‘হাঁস, মুরগী আর ঘোড়ার ডাক ডেকেছ যে সেটা ও নিচয় মনে নেই?’

‘এবং বেড়ালের ডাক?’ যোগ করল রবিন।

‘উম্মাদ!’ বিড়বিদ্ধু করে ছেলেটা বলল, ‘বন্ধ উম্মাদ!’

‘তারমানে তুমি আসতেই থাকবে এখানে,’ মুসা বলল, ‘সে জন্মেই এসব ভগিতা।’

‘আসব তো বটেই। এই বার্নাটার পানি খুব ভাল। আমি যেটার কাছে ক্যাম্প করেছি সেটার অত ভাল না।’

‘একথা আগে বললেই হত। ঠিক আছে, তুমি যখন আসা বন্ধ করবে না, আমরাও যাব তোমার ওদিকে।’

‘এলে আসবে, কে মানা করেছে? তবে শুধু তোমরা, দয়া করে কুওটাকে এনো না। দেখে ভাল মনে হচ্ছে না। আমারটাকে খেয়ে ফেলবে।’

‘কি পাগলের মত কথা বলছ?’ রবিন বলল, ‘থাবে না যে ভাল করেই জানো। খুব খাতির হয়ে গেছে, দেখোনি?’

‘না, দেখিনি।’ আর কিছু না বলে, আরেকবার কপালের ওপর এসে পড়া চুল সরিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ছেলেটা।

সেদিকে তাকিয়ে মুসা বলল, ‘কি মনে হয়? তখনকার সঙ্গে এখনকার কোন মিলই নেই। রবিন, এত তাড়াতাড়ি সব কথা ভুলে গেল সে?’

‘কি জানি, কিছু বুঝতে পারছি না,’ রবিনের বিশ্বাস কাটেনি। ‘তখন দেখলাম এত হাসিখুশি, এত দম্পত্তি, হাসি ছাড়া কথা বলে না, আর এখন হয়ে গেল পুরোপুরি তার উল্লেটো। গোমড়ামুখো। এক বিন্দু হাসি নেই।’

‘আমার বিশ্বাস, মাথায় দোষ আছে ওর,’ আবার পা বাড়াল মুসা।

তাঁবুর কাছে এসে বসল ওরা। হাই তুলে মুসা বলল, ‘রবিন, তোমার ঘূম পায় নাঃ? আমার পাচ্ছে।’

‘পাবেই। কাল সারারাত ঘূমাওনি তো।’

‘আমি তাহলে শুয়ে পড়লাম।’

‘পড়ো। আমার সহজে আসবে না। না আসুক। তাঁবুর বাইরে শোবো। শয়ে শয়ে তারা দেখব। ইচ্ছে হলে চিঠাকে তোমার কাছে রাখতে পারো।’

‘আমিও বাইরেই থাকব,’ মুসা বলল। ‘বৃষ্টিটিটি যখন নেই, অফথা বন্ধ শুমোটে ঘাসতে যাব কেন? এসো, ডালপাতাগুলো বের করে বাইরেই বিছানা করে ফেলি।’

বাইরে বিছানা কলা হলো। রবিনরা শোয়ার আগেই তাতে উঠে শুয়ে পড়ল চিতা। ধূমক লাগাল মুসা, ‘এই ব্যাটা, তোকে কে শুতে বলল? কফলটা নষ্ট করবি তো। তুই নিচে থাক। কুকুররা ঘাসে শুয়েও আরাম পায়।’

বিছানা পেতে, ঝর্নায় শিয়ে হাত-মুখ ধূয়ে পানি খেয়ে এল ওরা।

হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে মুসা বলল, ‘আহ, কি আরাম!'

রবিন জিজ্ঞেস করল, ‘রাতে ঠাণ্ডা লাগে?’

‘শেষ রাতের দিকে লাগে।’

‘অসুবিধে নেই। আমিও একটা কঙ্কল এনেছি। গায়ে দিতে পারব।’

‘আজ নাগবে বলে মনে হয় না। কাল একটু মেঘ-মেঘ ছিল...রবিন, দেখো, একটা তারা।’

দেখতে দেখতে ছয়-সাতটা শুণে ফেলল দুজনে। তার পর এত দ্রুত তারা ফুটতে শুরু করল, রেই হারিয়ে ফেলল। শত-সহস্র তারায় ভরে গেল আকাশ। দেখা দিল ছায়াপথ।

‘তারাগুলো কি বড় বড় দেখো! কি উজ্জ্বল! রবিন বলল। ‘শহরে এমনটা লাগে না। এসব জায়গায় এলে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হয়। কি বিশাল মহাকাশ! কত কোটি কোটি মাইল দূরে...মুসা, ঘূরিয়েছ? ’

জবাব নেই। ঘূরিয়ে পড়েছে।

কুকুরটা শয়ে আছে তার পাশে, ঘাসের ওপর।

রাত বাড়ছে। চান্দ মেই, কিন্তু তারার জন্যে জমাট বাঁধতে পারছে না অন্ধকার। লোকালয় থেকে বহুদূরে রয়েছে ওরা। কোন শব্দ নেই। এমন কি পেঁচাও ডাকছে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জড়িয়ে এল চোখ...

হঠাৎই ঘূম ভেঙে গেল তার। কেন ভাঙল বলতে পারবে না। প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। তারাজুল আকাশের দিকে চোখ। মনে হলো এখনও ঘূরিয়ে আছে, স্বপ্ন দেখছে।

পিপাসা পেয়েছে খৰ। উঠে তাঁবুতে চুকল মগটার জন্যে। খুঁজে পেল না অন্ধকারে। বেশি খোঁজাখুঁজি করল না, বেরিয়ে এল। মগ ছাড়াও খেতে পারবে।

চিতাও জেগে গেছে। রবিনের সঙ্গে যাবে কি যাবে না দিখা করে শেষে মুসার কাছেই রয়ে গেল।

অন্ধকারেও ঝর্ণাটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না তার। পানি বয়ে যাওয়ার কুলকুল শব্দই জানিয়ে দিল কোথায় রয়েছে ওটা। একটা পাথরের ওপরে এসে বসল। পানি তুলে নিল আঁজলা ভরে। এত গরমেও এত ঠাণ্ডা থাকে কি করে পানি ভেবে অবাক হলো। মাটির গভীরে যেখান থেকে বেরিয়ে আসে সেখানটা নিচয় বরফের মত ঠাণ্ডা।

পানি খেয়ে নেমে এল পাথর থেকে। তারার দিকে তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করল। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। ঠিক পথেই যাচ্ছি তো?—ভাবল।

আবার এগোল কিছুটা। আবার দাঁড়াল। না, তাঁবুর দিকে নয়। পথ ভুল করে আরেক দিকে চলেছে।

সামনে চোখ পড়তেই শুক হয়ে গেল সে। আলো! আলোর বিলিক। ওই তো, আবার দেখা গেল। কিসের আলো?

কোন দিকে এসেছে বুঝতে পারছে। তারার আলোতেও ভাঙা কটেজটার আবছা অবয়ব দেখে চিনতে অসুবিধে হলো না। আলো দেখা গেছে ওটার ভেতর থেকেই।

আর এগোতে সাহস করল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে। ফিসফিস কথা শুনল বলে মনে হলো। ভেতরে হাঁটাচলার শব্দও হচ্ছে।

নাকি সব তার কল্পনা? হঠাতে ঘুম ভেঙে উঠে...না, ওই যে, আবার আলো জলল! ভুল নয়।

নিঃখ্বাস দ্রুত হয়ে গেল তার। ওই পোড়ো বাড়িতে এত রাতে কে চুকল? মুসার মত ভৃতের ভয় না পেলেও এগিয়ে গিয়ে দেখার সাহস হলো না। নিঃশব্দে যত তাড়াতাড়ি পারল ফিরে এল তাবুতে।

ঘুমিয়ে আছে মুসা। আগের মতই।

কেবল চিতা তাকে দেখে মৃদু স্বরে গৌ-গৌ করে জানান দিল সে জেগেই আছে।

বিছানায় উঠে মুসার গায়ে আলতো ঠেলা দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, ‘মুসা, এই মুসা, জলন্দি ওঠো! মুসা...’

পাঁচ

উঠল না মুসা। ঘুমের মধ্যেই গোঙ্গল, আরেক পাশে কাত হয়ে শুতে গিয়ে বিছানা থেকেই গড়িয়ে পড়ে গেল অর্ধেকটা শরীর। তা-ও জাগল না।

‘মুসা, মুসা, ওঠো না!’ ধাক্কা দিল রবিন, আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল, কিন্তু লাড হলো না। জোরে ডাকতেও ভয় পাচ্ছে। কটেজ থেকে শুনে ফেলতে পারে।

অনেক গুঁতোগুঁতির পর অবশেষে ভাঙল মুসার কুণ্ডর্কর্ণের ঘুম, জড়িত গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘কি হয়েছে?’

নীরব রাতে অনেক জোরাল শোনাল তার কষ্টস্বর।

‘চুপ! আস্তে!’

‘কেন?’ অবাক হলো মুসা। ‘কে কি করবে? যত খুশি...’

‘মুসা, প্রীজ, আস্তে! কটেজে কেউ আছে?’

পুরো সজাগ হয়ে গেল মুসা। ‘ভূত!

যা দেখে এসেছে জানাল রবিন।

‘দেখতে যেতে বলছ?’ কুকুরটার দিকে তাকাল মুসা, ‘চিতা, ভূত দেখতে যাচ্ছি আমরা। খবরদার, একদম চুপ থাকবি। টু শব্দ করবি না।’

শুরুতে ভয় পেলেও এখন ভয় কেটে গেছে মুসার। ও এই রকমই। কাজের সময় দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। চিতা চলেছে তার পায়ে পায়ে। রবিন পেছনে।

ঝুঁ সাবধানে কটেজটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। তারার আলোয় আবহা চোখে পড়ছে বাড়িটার অবয়ব। এখন আর আলো কিছু নেই। কোন শব্দও না।

পুরো পাঁচটা মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। তারপর অস্থির হয়ে উঠল কুকুরটা। বিরক্ত লাগছে তার! তাকে আটকে রেখেছে কেন মুসা? ছেড়ে দিলেই তো হয়, ঘরে চুকে দেখে আসতে পাবে।

‘কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না,’ ফিসফিস করে বলল মুসা। ‘তুমি যখন দেখেছ তখন হয়তো ছিল, এখন চলে গেছে। চোখের ভুল যদি না হয়ে থাকে।’

‘না, ভুল নয়। চুকে দেখব নাকি? আগে চিতাকে পাঠিয়ে দিই, কাউকে দেখলে

ঘেউ ঘেউ শুরু করবে।'

কুকুরটার মাথায় আস্তে চাপড় দিয়ে মুসা বলল, 'যা, দেখ, কেউ আছে নাকি?'
একচুটে অন্ধকারে হারিয়ে গেল চিতা।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল দুই গোয়েন্দা। নিজেদের বুকের খুকপুক
খুকপুকও মেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। কোথাও কোন শব্দ নেই, কেবল মাঝে মাঝে
কানে আসছে পাথরের মেঝেতে চিতার নখ ঘষা লাগার আওয়াজ।

'নাহ, কেউ নেই,' আবার বলল মুসা, 'তাহলে গন্ধ পেয়ে যেত কুকুরটা। তুমি
ভুলই দেখেছ মনে হয়। যুম ভেঙে হঠাতে করে গেছ তো...'

'না, আমি ভুল দেখিনি,' জোর দিয়ে বলল রবিন। 'লোক ছিলই ওখানে। কম
পক্ষে দুজন। ফিসফিস করে কথা বলতে শুনেছি।'

'তাহলে এখন নেই কেন?' গলা ঢাঁড়িয়ে ডাকল মুসা, 'চিতা, চলে আয়।
কাউকে পাবি না।'

বেরিয়ে এল চিতা।

ফিরে চলল ওরা।

চুপ করে আছে রবিন। ফেরার পথে একটা কথা ও বলল না। ক্যাম্পে এসে
বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে যুম ডাঙলে আগের রাতের কথা মনে পড়ল তার। রাতে মুসা
অবিশ্বাস করেছে, এখন তার নিজেই সন্দেহ হতে লাগল, সত্যিই দেখেছিল তো?
দেখে থাকলে এত তাড়াতাড়ি কোথায় গেল লোকগুলো? ওরা যাওয়ার পর কটেজে
কেউ আর ছিল না, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে চিতার নাক এড়াতে পারত
না। সূতরাং আবার যখন সেকথা তুলল মুসা, তর্ক করল না আর রবিন।

নাতা খেতে বসল ওরা। গরমে নষ্ট হয়ে এসেছে স্যাগুউইচ, একটু একটু গন্ধ
লাগছে। প্রায় জোর করেই দুটো খেল রবিন। কিন্তু মুসা আর চিতা কেয়ারও করল
না। গপ গপ করে শিলল।

খেয়েদেয়ে মুসা বলল, 'নাহ, আর ভাল লাগছে না এখানে। চিতার কলারটা
খুলতে পারলে আর এক মিনিটও থাকতাম না।'

'কিন্তু থাকতে হচ্ছে। কি করে সময় কাটানো যায়, বলো তো?'

'চলো, ছেলেটার ওখান থেকে ঘুরে আসি।'

চিতাকে নিয়ে সেন্দিকে রওনা হলো ওরা। কাছাকাছি হতেই মাটি কোপানোর
শব্দ কানে এল। ঝোপ থেকে ছুটে বেরোল একটা রোমশ শরীর। ঘেউ ঘেউ করে
স্বাগত জানাল।

'হাই কার্ব,' হেসে বলল রবিন, 'হাড়টাড় আর নেই তোর কাছে? চিতাকে
দিবিনে?'

মাটি ঝোড়ার শব্দ থেমে গেল।

ঝোপ ঘুরে অন্যপাশে এসেই দাঁড়িয়ে গেল গোয়েন্দারা। ঝুঁড়ে ঝুঁড়ে কি করে
রেখেছে! ছোট-বড় অসংখ্য গর্ত। কোন কোনটা খুব গভীর। আলগা মাটি স্ফুর করে
ক্ষফলে রাখা হয়েছে গর্তের কিনারে।

ছেলেটাকে দেখা গেল না ।

‘এই, কোথায় তুমি?’ ডেকে জিজ্ঞেস করল মুসা ।

বলেই চোখে পড়ল তাকে । একটা ট্রেক্সের মত গর্তে নেমে কি যেন দেখছে । ডাক শুনে ওপর দিকে তাকাল । ঝুঁচকে ফেলল ভুক । চেঁচিয়ে বলল, ‘তোমাদের না আসতে মানা করেছিলাম! লোক তো মোটেও সুবিধের না তোমরা! কথা রাখতে জানো না!’

‘বা-বা,’ ব্যঙ্গ করল মুসা । ‘দেখো, তোমার মুখে ওকথা মানায় না ।’ কথা তো তুমিই রাখনি । প্রতিজ্ঞা ভুলে আবার গেছ আমাদের ক্যাম্পের কাছে । এটাও ভুলে গেছ?’

‘আমি যাইনি । প্রতিজ্ঞা কখনও ভুলি না আমি, কথা দিলে কথা রাখি । যাও এখন, তাগো । তোমরা আসলেই ভাল মানুষ না ।’

‘তুমি ভাল?’ রেগে গেল মুসা । ‘ঠিক আছে, যাচ্ছি । এই পচা জায়গায় ধাকার আমাদেরও কোন ইচ্ছে নেই । বানাও তোমার কবর, যত খুশি । নিজের কবরে নিজেই পড়ে মরো ।’

‘মরলেও তোমাদের ডাকতে যাব না । দয়া করে যাও এখন । আর এসো না এখানে, প্রীজ! বলেই আবার মাটিতে কোপ মারল ।

ঘূরে আবার হাঁটতে লাগল দুই গোয়েন্দা ।

‘ছেলেটা সত্যিই পাগল,’ রবিন বলল । ‘নিজেই কথা দিল, নিজেই ভাঙল, এখন আবার অশ্঵ীকার করে । আবার বড় গলায় বলে, কথা দিলে আমি কখনও ভাঙ্গি না । বাহ!’

খরগোশ চলাচলের পথ ধরে একটা ওকের জটলায় এসে চুকল ওরা । একটা ছেলে বসে আছে সেখানে । বই পড়ছে । ওদের সাড়া পেয়ে মুখ তুলল ।

‘খাইছে’ থমকে দাঁড়াল মুসা, ‘দেখো, কে!’

রবিনও হাঁ হয়ে গেছে । আবার সেই ছেলেটা! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এল কি করে এখানে? এইমাত্র দেখে এসেছে ট্রেক্সের নিচে । বইটার মলাটে লেখা নাম পড়ল রবিন । প্রহৃতত্ত্বের ওপর লেখা ।

তার সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল মুসা । ‘আরেকটা খেলা, নাকি? চালাকি হচ্ছে আমাদের সঙ্গে? দৌড়াতেও তো পারো সাংঘাতিক । এত তাড়াতাড়ি চলে এসেছ...’

‘বলে কি! মাধ্যাম্বুও তো কিছুই বুঝি না!’ শুভিয়ে উঠল ছেলেটা । ‘আমাকে একটু একা থাকতে দিতে পারো না? কাল সন্ধ্যায় একবার উল্টো-পাল্টো কি সব বললে, এখন এসেছ আবার...’

রবিন জিজ্ঞেস করল, ‘আগে বলো এত তাড়াতাড়ি এখানে এলে কি করে?’

‘তাড়াতাড়ি আসতে যাব কেন? খুব ধীরে-সুস্থে হেঁটে এসেছি, বই পড়তে পড়তে । হাঁটার সময়ও বই পড়ি আমি । তাতে সহজে পথ ফুরায় ।’

‘শুল মারার আর জাফাগা পাও না,’ বৌঝিয়ে উঠল মুসা । ‘দৌড়ে এসেছ তুমি, আমি জানি । শুধু শুধু ভণিতা করছ কেন? কয়েক মিনিট আগেই তোমার সঙ্গে দেখা

হয়েছে।'

'উফ, আর পারি না!' কপাল চাপড়াল ছেলেটা। 'তোমাদেরকে মোটেও ভাল মানুষ মনে হচ্ছে না। ভাল মানুষের অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় না। এখন দয়া করে যাবে? আমাকে পড়তে দেবে? আরেকটা কথা, আর আমাকে জুলাতে এসো না, প্লিজ! আমাকে আমার মত ধাকতে দিয়ো।'

ছেলেটার কথা বলার ভঙ্গি ভাল লাগল না চিতার। গরুর করে উঠল সে।

ভুক কুঁচকে তার দিকে তাকাল ছেলেটা। 'খবরদার, আমার সঙ্গে ওরকম করবি না! থাপ্পড় মেরে দাঁত ফেলে দেব।'

শার্টের হাতা গুটাতে শুরু করল মুসা, 'দেখি, দাও তো দেখি থাপ্পড়! ক্ষতবড় সাহস...'

তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে ওখান থেকে টেনে সরিয়ে আনল রবিন। 'থাক, থাক, ওর সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই। বক্ষ উচ্চাদ। পাগলের সঙ্গে কথা বলে কে।'

ঘুরে আবার আরেক দিকে ইঁটিতে শুরু করল ওরা। কয়েক পা গিয়ে ফিরে তাকাল রবিন। ওদের দিকে নজরই নেই ছেলেটার। বইয়ে ঢুবে গেছে।

'এরকম পাগল আর দেখিনি!' নিচুস্থরে বলল সে। 'অবাকই লাগছে। মুসা, ও-ই গিয়ে কটেজে ঢেকেনি তো কাল রাতে?'

'কি জানি!' কানের নিচে চুলকাল মুসা। 'তবে বলা যায় না, ছেলেটা ভূতের চেয়েও বড় পাগল। চুক্তেও পারে।'

আরও কিছুদুর এগিয়ে একটা ডোবামত দেখা গেল। দূর থেকে দেখেই বলে উঠল মুসা, 'গোসলের জায়গা বোধহয় পেয়ে গেলাম।'

ডোবাটার পাড়ে এসে দাঁড়াল ওরা। পানি বেশ পরিষ্কার।

'ই, ভালই,' রবিন বলল, 'গোসল করা যায়।'

দুদিন গোসল হয় না। জায়গা পাওয়ার পর আর দেরি করল না। কাপড় খুলে নেমে গেল।

ছেট হলেও ডোবাটা বেশ গভীর। দাপাদাপি করতে, সাঁতার কাটতে অসুবিধে হচ্ছে না। অনেকক্ষণ ধরে ডোবাটুবি করে পানি থেকে উঠল ওরা। পাড়েই হাত-পা ছড়িয়ে বসল গায়ের পানি শুকানোর জন্যে।

মুসা বলল, 'রবিন, খাবার আনা দরকার।'

'কোথেকে? বাড়ি চলে যাব নাকি?'

'সেটাই ভাল হবে। বেশি কুরে আনতে পারবে। এমন কিছু আনবে যাতে গরমে নষ্ট না হয়।'

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে।'

ক্যাম্প ফিরে এল ওরা।

বিস্কুট-চিকুট যা হিল খেয়ে নিয়ে রাকি বীচে রওনা হয়ে গেল রবিন।

ছয়

সন্ধ্যার সময় ফিরে এল সে।

‘এসেছ,’ মুসা বলল, ‘বাঁচালে। নাড়িভুঁড়িগুলোও হজম হয়ে গেছে আমার। দাও, দাও, জলন্দি দাও, দেখি কি এনেছ?’

প্যাকেট বাড়িয়ে দিল রবিন। তার খাওয়া লাগবে না, আসার নময় পেট ভরে খেয়ে এসেছে।

রেখে রেখে খাওয়ার জন্যে অনেক কিছু বানিয়ে দিয়েছেন রবিনের আশ্মা। দিয়েছেন ভাজা মাংস, সেদ্ব করা প্রচুর শাক-সজি, সালাদ, আর ঘরে বানানো পাঁউরুটি।

গপ গপ করে গিলতে লাগল মুসা। চিতাকেও দিল। পেট কিছুটা শান্ত হয়ে এলে জিজেস করল, ‘আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে?’

‘হ্যাঁ।’

‘মা কি বলল?’

‘জলন্দি জলন্দি ফিরে যেতে। নইলে এসে কান ধরে নিয়ে যাবেন।’

‘চিতাকে নিতে দেবে? কিছু বলল?’

‘আটি কিছু বলেননি। তবে আংকেল ভরসা দিয়েছেন। চুপি চুপি বললেন, অনেকটা নরম করে ফেলেছেন আটিকে।’

চওড়া হাসি ফুটল মুসার মুখে। ‘দারুণ একটা খবর দিলে।’ যেন সেই খশিতেই বড় একটুকরো মাংস মুখে পূরল। চিবিয়ে গিলে নিয়ে জিজেস করল, ‘কিশোরের কি খবর?’

‘ভাল না। দুনিয়াসুন্দি মাল কিনে নিয়ে এসেছেন রাশেদচাচা। কাজ করতে করতে হিমশির খেয়ে যাচ্ছে সবাই। বোরিস আর রোভারকে রোজই ওভারটাইম করতে হচ্ছে।’

‘কিশোর এখানকার কথা শোনেনি?’

‘ওনেছ। আসার জন্যে অস্থির। কাজ একটু কমলেই চলে আসবে।’

‘কটেজের রহস্যময় আলোর কথা শুনেছে?’

‘হ্যাঁ। পাগলা ছেলেটাকে দেখারও খুব ইচ্ছে। চলে আসবে। আমার বিশ্বাস কাল-পরওই। বলে বলে লোভ জাগিয়ে দিয়েছি তার। আজ রাতে ঘুম হবে না।’

হাসল মুসা।

খেয়ে খেয়ে পেট ভারি করে ফেলল সে। ঝর্না থেকে দুই মগ পানি খেয়ে এসে ধপ করে বসে পড়ল। পেটে হাত বোলাতে বোলাতে ঝলল, ‘আহ, খেলাম।’

অন্ধকার হতে কিছুটা দেরি আছে। রবিন বলল, ‘বসেই থাকব? এত তাড়াতাড়ি শোয়াও যাবে না। চলো, একটু ঘুরে আসি।’ কটেজের দিকেই যাওয়ার ইচ্ছে তার। মনে ক্ষীণ আশা, আবার যদি আলো দেখা যায়?

আগে আগে চলল চিতা। কটেজের আলো নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, সে চায় একটা খরগোশ ধরতে। আর কিছু না হোক, তাকে তাড়া করতে দিলেই খুশি। ইস, কত যে খরগোশ আছে এখানে! আজ যেন আরও বেশি বেরিয়েছে। জটলা করছে, ছেটাছুটি করছে, এ-গর্ত থেকে উঁকি দিচ্ছে, ও-গর্তে চুকে পড়ছে।

কিন্তু কিছুতেই তাকে কাছে যেতে দিল না মুসা। মনে বড় দুঃখ নিয়ে ক্যাম্পে
ফিরে আসতে হলো চিতাকে।

ফেরার পথে অঙ্কুর হয়ে গেছে। কটেজটার দিকে বার বার ফিরে
তাকিয়েছে রবিন। কিন্তু আলো দেখেনি।

হেটে গা গরম হয়ে গেছে। ঝর্না থেকে পানি খেয়ে এল তিনজনেই।

হাই তুলতে লাগল রবিন। ‘আজ আমার ঘূম পাচ্ছে।’

‘পাবেই। সারাদিন ছুটাচূটি করেছ। আজ কিন্তু আমার পাচ্ছে না। প্রায়
সারাটা দিনই শয়ে থেকেছি বোপের মধ্যে।’

‘টর্চ রেডি রাখো তাহলে। কটেজে কোন শব্দ শনলেই দেখতে যাব।’

‘ঘুমাবে না?’

‘ঘুমাব। তামি শনলে আমাকে ডেকো।’

খুব নিচু দিয়ে একটা বাদুড় উড়ে গেল। ঘাউ ঘাউ করে উঠল চিতা। যেন
বলতে চাইল, ‘বাহাদুরি দেখাচ্ছ, দেখাও! গলার কলারটায় বিপদে ফেলে দিয়েছে,
নইলে দেখাতাম মজা।’

পাতার বিছানায় আগের রাতের মতই কফল বিছানো হলো। শয়ে পড়ল রবিন
আর মুসা। মুসার পাশে ঘাসের ওপর শলো চিতা।

চিত হয়ে শয়ে আকাশের তারা শুণতে লাগল মুসা। বলল, ‘কিশোর এলে খুব
ভাল হত, তাই না, রবিন? জমত। ওকে ছাড়া আসলে জমে না।’

জবাব নেই।

‘যাই, রবিন...’ কাত হয়ে ফিরে তাকাল মুসা।

ঘুমিয়ে পড়েছে রবিন।

তারা দেখতে দেখতে মুসা কখন ঘুমিয়ে পড়ল, সে-ও বলতে পারবে না।
একটা মাকড়সা এসে উঠল তাঁর হাতে। বাহু বেয়ে নেমে গেল তালুতে, সেখান
থেকে আঙুলে, নিখির আঙুলগুলোতে জাল পাতবে কি পাতবে না হিঁধা করতে
লাগল। বোপের তেতর শঙ্গারূর আনাগোনা। একটা কান খাড়া করে ঘুমের
মধ্যেই সব শনতে পাচ্ছে চিতা। কিন্তু সবই স্বাভাবিক শব্দ বলে কোন উচ্চবাচ্য
করছে না।

সুন্দর, নীরব শান্ত একটা রাত।

সারারাত টানা ঘূম দিয়ে পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল দুই গোয়েন্দার। ঘরবরে
হয়ে গেছে শৰীর, মন। খিদেও প্রেয়েছে।

হাত-মুখ ধরে নাস্তা সেরে নিল। গায়ের চাপে চ্যাষ্টা হয়ে গেছে বিছানাটা।
আরও কিছু পাতা কুড়িয়ে এনে গদি উঠু করতে লাগল। সময় লাগল না বেশি।
দেখতে দেখতে কাজ শেষ।

‘এবার গোসল,’ ঘোষণা করল মুসা।

কোন আপত্তি নেই রবিনের। অফুরন্ট সময় আছে হাতে। যা খুশি করতে
পারে। ডোবার পাড়ে রওনা হলো ওরা।

পথে দেখা হয়ে গেল সেই ছেলেটার সঙ্গে। তবে ওদের কাছ থেকে বেশ
কিছুটা দূরে রয়েছে। সঙ্গে কার্ব।

রাখিকে দেখেই ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল কুকুরটা, খেলা জমানোর জন্যে।
চিতাও এগিয়ে গেল।

দূর থেকেই মুখ ফিরিয়ে তাকাল ছেলেটা। চিন্তার করে বলল, 'ডয় নেই,
আমি তোমাদের কাছে আসছি না। তোমাদের ক্যাম্পও অনেক দূরে। কথার
খেলাপ করেছি বলতে পারবে না। কাৰ্ব, আয়।'

চিতার সঙ্গে খেলতে না শেরে মনমরা হয়ে চলে গেল কাৰ্ব।

ডোবার কাছে এসে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল দুই গোয়েন্দাৰ। ওদের আগেই
এসে নেমে পড়েছে আৱেকজন, সাঁতার কাটছে।

'জায়গাটাকে যতটা নিৰ্জন ভেবেছিলাম, ততটা নয়,' তিক্ত কষ্টে বলল মুসা।
'আসলে মানুষ ছাড়া জায়গা কোথাও পাওয়া যায় না...'

'মুসা!' উত্তোলিত ভঙ্গিতে তার বাহুতে হাত রাখল রবিন, 'সাঁতার কাটছে কে
দেখেছ? লম্বা লম্বা চুল...'

'আৱি, এইমাত্র না ওকে দেখে এলাম ওদিকে!'

পানিৰ কিনারে চলে এল দুজনে, ভাল করে দেখাৰ জন্যে।

কোন ভুল নেই। সেই ছেলেটাই।

ওদেরও দেখতে পেল সে। হাপুস করে মুখ থেকে পানি বেৰ করে দিয়ে বলল,
'ডয় নেই। আমি উঠে যাচ্ছি এখুনি। তোমাদেৱ বিৰক্ত কৰব না।'

'কিন্তু তুমি এলে কি কৰে এখানে?' রবিন জিজ্ঞেস কৰল, 'তোমাকে তো
ঘৰতেও দেখলাম না, এদিকে আসতেও দেখলাম না।'

'আমাৰ কাছাকাছি ছিলে না, সে জন্যে দেখোনি। আমি এসেছি অনেকক্ষণ
হয়েছে।'

'আল্লারে, এ-কি পাগলেৱ পাল্লায় পড়লাম!' মুসা বলল, 'এই, তোমাৰ
মাথাটাত ঠিক আছে তো?'

'না থাকাৰ তো কোন কাৰণ দেখি না। আমাৰ তো ধাৰণা, তোমৰাই
পাগল।'

পানি থেকে উঠল ছেলেটা। গা থেকে পানি ঝৰছে। মুছল না, শুকানোৰ চেষ্টা
কৰল না। আৱ কোন কথাও বলল না। রওনা হয়ে গেল যেদিকে তার ক্যাম্প,
অৰ্থাৎ যেদিকে মাটি খুড়তে দেখা গৈছে তাকে সেদিকে।

আশেপাশে কোথাও কাৰ্বকে দেখা গেল না। মুসা বলল, 'মাথাটাই খারাপ
কৰে দিল! এমন আচৰণ কৰে কেন ছেলেটা?'

হাত ওল্টোল রবিন। 'আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। একবাৰ হাসে,
আৱেকবাৰ গণ্ঠিৰ, একবাৰ ভাল কৰে কথা বলে, আৱেকবাৰ খারাপ।'

যা-ই হোক, ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা না ঘায়িয়ে পানিতে নামল দজনে।
চিতাও নামতে ঢাইল। কলাৰ ভিজে নষ্ট হয়ে যাওয়াৰ ভয়ে তাৰে নামতে দিল না
মসা। তাৰে দাঁড়িয়ে কৰণ চোখে তাদেৱ দিকে তাকিয়ে রাইল কুকুরটা, আৱ
নীৱাৰে লেজ নাড়তে লাগল। তাৰ দেখে মনে হয়, আহা, কত দুঃখী!

অনেকক্ষণ দাপাদাপি কৰে পানি থেকে উঠল দুই গোয়েন্দা। গা শুকাল।
তাৰপৰি ফিরে চলল ক্যাম্প। বিদে শেয়েছে।

শুয়ে বসে কাটতে লাগল দিনটা। ছেলেটাকে আর দেখল না। মাঝে মাঝে কানে এল পাথরের গায়ে গাইতির কোপের আওয়াজ।

মুসা বলল, ‘এত কষ্ট করে কয়েকটা মাটির হাঁড়িকুড়ি নাহয় পাবে, তাতে কি লাভ বলো তো? আসলেই পাগল।’

‘আমার কি মনে হয়, জানো? সব মানুষের মধ্যেই পাগলামি থাকে। তোমার মধ্যে আছে, আমার মধ্যে আছে। নিজেরটা নিজে বুঝতে পারিনা।’

কেটে গেল দিনটা। নতুন কিছু ঘটল না।

সন্ধ্যার পর বিছানায় শুয়ে পড়ল। আজ দুজনের কারোই ঘুম নেই। আকাশে তারাও নেই। কেমন ভারি হয়ে আছে আকাশের মুখ। মেঝে জমছে। শুমোট গরম।

‘বৃষ্টি হবে মনে হয়,’ রবিন বলল।

‘বড় না উঠলেই বাঁচি।’

‘বেশি বৃষ্টি হলে ঠেকাতে পারবে না আমাদের তাঁবুটা। তিজে যাব।’

‘তা বটে।’

তবে সেটা নিয়ে বেশি চিন্তা করল না ওরা। কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

কুকুরটা ঘুমাল না। তার কানে এল বাজের চাপা শুড়ুগুড়ু। এই শব্দকে ডয় পায় না সে, তবে পছন্দও করে না।

আকাশের এমাখা-ওমাখা চিরে দিয়ে গেল বিদ্যুতের নীলচে-সাদা তীব্র আলো। ক্ষণিকের জন্যে আলোয় আলোকিত হয়ে গেল চারদিক। আবার অঙ্ককার।

আন্তে দুই থাবার মাঝে খুতনি নামিয়ে চোখ মুদল চিতা।

আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাল। বড় এক ফৌটা বৃষ্টি পড়ল তার নাকে। আরেকটা পড়ল কার্ডবোর্ডের কলারে। ভাল লাগল না ব্যাপারটা। উঠে বসে গরংগর শুরু করল সে, যেন তয় দেখাতে চাইল বৃষ্টিকে।

এগিয়ে আসছে বাজের শব্দ।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল।

বাজ পড়ল বিকট শব্দে।

চমকে জেগে গেল দুই গোয়েন্দা।

‘খাইছে! এসেই গেল,’ মুসা বলল।

‘তাঁবুতে ঢোকো।’

রবিনের কথা শেষ হতে না হতেই আকাশ চিরে দিল বিদ্যুতের বিলিক। দানবীয় কোন সাপের জিভের মত লিঙ্কলিঙ্ক করে গেল যেন, মাথাটা তেমনি চেরা।

‘তাঁবুতে ঢুকে লাভ নেই,’ মুসা বলল। ‘এই তাঁবুতে বৃষ্টি মানবে না।’

‘কটেজটাতেই গিয়ে ঢুকতে হবে আমাদের। আর কোন উপায় নেই। চলো, জলদি।’

টর্চটা পাশেই রাখা ছিল, খাবলা দিয়ে তুলে নিল মুসা। একটানে তুলে ফেলল একটা কস্তুর। আরেকটা কস্তুর তুলে নিল রবিন। ভাল বৃষ্টিই শুরু হয়ে গেছে তৈক্ষণে।

টচের আলোয় পথ দেখে মাথা নিচু করে দৌড় দিল দূজনে। ঘেউ ঘেউ করে আগে আগে ছুটছে কুকুরটা।

ভাঙা, খোলা দরজা দিয়ে ছুটে ভেতরে চুকে পড়ল ওরা। যাক, বাঁচা গেল। বৃষ্টিতে আর ভিজবে না। এককোণে এসে গা ঘেষাঘেঁষি করে বসল দূজনে।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমক, সেই সঙ্গে প্রচুর বজ্জ্বাপত করে আর্বৃষ্টি ঝরিয়ে একসময় সরে গেল বড়। একটা দুটো করে তারা উকি দিতে শুরু করল মেঘের ফাঁকে। বড়ো বাতাস সমস্ত মেঘ তাড়িয়ে নিয়ে গেল। আবার তারায় ঝলমল করে উঠল আকাশটা।

‘বাহিরে আর শতে পারব না,’ মুসা বলল। ‘সব ভিজে গেছে। ব্যাগগুলো নিয়ে আসিগে। বালিশ বানিয়ে এখানেই শয়ে পড়ব।’

‘চলো।’

বৃষ্টি মোটামুটি ভালই ঠেকিয়েছে তাঁবুটা। মুসা যতটা আশঙ্কা করেছিল ততটা পানি ঢেকেনি। ব্যাগটায়াগুলো শুকনোই আছে।

ঘরের কোণে কফল পেতে ব্যাগ মাথার নিচে দিয়ে শয়ে পড়ল দূজনে। মুসার প্রায় গা ঘেঁষে রইল চিতা।

আবারু শুমিয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা। কিন্তু জেগে রইল চিতা। অস্বস্তি বোধ করছে। খুবই অস্বস্তি।

হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ঘাউ ঘাউ করে।

চমকে জেগে গেল ছেলেরা।

‘চিতা,’ আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করল মুসা, ‘কি দেখেছিস, চিতা, কী! ভৃত?’

‘যাসনে চিতা,’ রবিনও ভয় পেয়েছে, ‘আমাদের ফেলে যাসনে ভাই!’

সাত

চিকার থামিয়েছে চিতা। মুসার হাত থেকে ছুটে যেতে চাইছে।

পরিবেশটা ভীতিকর। ঝাড়বৃষ্টি, রহস্যময় পোড়ো বাড়ি, তার পর কুকুরটার এই হঠাৎ উত্তেজনা ভয় পাইয়ে দিল দুই শোয়েন্দাকে।

‘ব্যাপারটা কি?’ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

‘বুঝতে পারছি না। কোন কিছু উত্তেজিত করে দিয়েছে ওকে।’

চূপ করে ঘরের কোণে গা ঘেষাঘেঁষি করে পড়ে রইল দূজনে। আরও বার দুই গরগর করল চিতা, কিন্তু ঘেউ ঘেউ আর করল না।

আবার শোনা গেল বাজের শব্দ। আরেকটা বড় আসছে।

উত্তেজনা চলে গেল মুসার। ‘এটাই তাহলে কারণ। রবিন, ঝাড়ই উত্তেজিত করেছে ওকে।’ চিতাকে বলল, ‘দূর বোকা, ঘরে থাকলে এসবকে কেউ ভয় পায় নাকি।’

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল।

ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরটা।

‘মহা মুসিবত! বাজের চেয়ে তো তুই-ই চেঁচিস বেশি,’ ধমক দিল মুসা।
আবার বেরোতে চাইল কুকুরটা। কলার ধরে রাখল সে।
‘এই বৃষ্টিতে বেরোবি কি? এখানেই বেশি আরাম। চুপ থাক।’

‘ছেড়ো না ওকে,’ রবিন বলল। ‘থাক এখানেই। অবাক কাও! হঠাৎই কেমন
ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো।’

‘বাড়িটা না ধসে পড়ে!’
‘তা পড়বে না। তিন-চারশো বছর ধরে এসব অত্যাচার সয়েছে। আরও
কিছুদিন পারবে।’

উঠে দাঢ়াল রবিন।

‘যাচ্ছ কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল মুসা।

‘জানালার কাছে। বিদ্যুতের আলোয় জায়গাটা কেমন লাগে দেখব।’

জানালার কাছে এসে দাঢ়াল রবিন। পান্তা-শার্সি তো কিছু নেই, আছে শুধু
ফোকরটা। ঝিলিক দিয়ে উঠল তীব্র আলো। ক্ষণিকের জন্যে বহুদ্র পর্যন্ত স্পষ্ট
চোখে পড়ল, তারপরই গায়েব, টেকে গেল অঙ্ককারে, যেন জাদু-মন্ত্রের মত।

আচমকা চিন্কার করে উঠল রবিন, ‘মুসা, মুসা...’

চমকে গেল মুসা। ‘কি হয়েছে?’

‘মানুষ!’

‘মানুষ?’ উঠে এল মুসা। চিতাকে ছাড়ল না। সঙ্গে নিয়ে এল।

‘দু-তিনজন মনে হলো। দাঁড়িয়ে আছে।’

‘কই, কোথায়?’

‘ওই যে, ওদিকে।’

আবার বিদ্যুৎ চমকাল।

‘আরি, এখন তো নেই! গেল কোথায় এত তাড়াতাড়ি।’

‘ভুল দেবেছ তুমি। চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল বলছ তো? গাছ। গাছকেই মানুষ
মনে হয়েছে। কে আসবে এখানে এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে মরতে? তা-ও আবার বাইরে
দাঁড়িয়ে থাকে।’

‘কিন্তু উপেক্ষিত হয়ে চিন্কার করছিল কুকুরটা।’

‘সে তো করছিল বাজের আওয়াজে ভয় পেয়েছিল বলে।’

‘কি জানি...’

শুম-শুম করে আবার পড়ল বাজ। চোখ ধাঁধানো তীব্র আলোয় আলোকিত
হয়ে গেল পুরো অঞ্চল। চিন্কার করে উঠল মুসা, রবিন দূরেনেই। ঘেউ ঘেউ শুরু
করল কুকুরটা। বেরিয়ে যেতে চাইল আবার। ছাড়ল না মুসা।

‘ওই...ওই যে, দেখেছ এবার।’

‘খাইছে! ঠিকই তো! আমাদের দিকেই চেয়ে আছে। এত রাতে এখানে কি
করছে?’

বাড়িটার কাছে চলে এসেছে লোকটা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল
গোয়েন্দাদের দিকে।

ରବିନ ବଲଲ, 'ଯେ ଦୁ-ତିନଙ୍ଗନକେ ଦେଖେଛିଲାମ, ଓ ନିଚଯ ତାଦେରଇ ଏକଜନ । ବିଦ୍ୟୁତର ଆଲୋର କଟେଟା ଚାଖେ ପଡ଼େଛେ । ଆଶ୍ରୟ ନିତେ ଏସେହେ ଏଥାନେ ।'

'ତା ହତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏକମ ସମୟେ ଏହି ଖୋଲା ଅଞ୍ଚଳେ ବାତେର ବେଳେ ଘୁରତେ ବେରୋଲ କାରା ? ରବିନ, ଏହି ଭୂତୁଡ଼େ ଏଲାକାଯ ଆର ନା । କାଲଇ ଆମି ବାଡ଼ି ଫିରେ ଯାଇଛି । ମରେ ଭୂତ ହତେ ଚାଇ ନା ।'

ଜାନାଲାର କାହିଁ ଥିକେ ନଡ଼ିଲ ନା ଓରା ।

ରବିନ ବଲଲ, 'ବାଡ଼ କିନ୍ତୁ ଧେମେ ଯାଇଁ ଆବାର ।'

ଚୁପ ହେଁ ଗେଛେ ଚିତା । ଉତ୍ୱେଜନା ଓ ଚଲେ ଗେଛେ ତାର ।

ମୁସା ବଲଲ, 'ରାତଟା କାଟିଇ କି କରେ ? ଘୁମେର ତୋ ବାରୋଟା ବେଜେଛେ । ଆର ଆସବେ ନା ।'

'ଶ୍ଵେତ ଶ୍ଵେତ କଥା ବଲି, ଆର କି କରବ ।'

ଜାନାଲା-ଦରଜାର ଫୋକରଗୁଲୋତେ ଫେକାସେ ଆଲୋ ଦେଖା ଗେଲ ଏକସମୟ । ହାପ ହେଡ଼େ ବାଁଚଲ ଦୁଇ କିଶୋର । ତୋର ହେଚେ । ଖାନିକ ପରେଇ ସ୍ଵୀ ଉଠିବେ । ଅନ୍ଧକାରେ ଯେ ଭୟଟା ଛିଲ, ଆଲୋତେ ସେଟା କେଟେ ଗେଲ ଅନେକଥାନି । ଉଠେ ଜାନାଲାର କାହେ ଏସେ ଦାଢ଼ାଳ ମୁସା । ବାଇରେ ବୈଶ ଆଲୋ । ଦେଖା ଯାଇଁ ଭେଜା ମାଠ, ଝୋପଝାଡ଼, ଓକଗାହ ।

ପାଶେ ଏସେ ଦାଢ଼ାଳ ରବିନ ।

ବାଇରେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଥିକେଇ ମୁସା ବଲଲ, 'ଏଥନ ଆର ତଯ ଲାଗଛେ ନା । ଅନ୍ଧକାର ଆସଲେ ମାନୁଶେର ମନଟାକେ କାବୁ କରେ ଦେୟ ।'

ହାସଲ ରବିନ । 'ତାର ମାନେ ଆଜ ବାଡ଼ି ଫିରଇ ନା ?'

'ପାଗଳ । ଚିତାର ହାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ ନା ଫେଲେ ଆର ନା । ମା ଆବାର ଧେପବେ । ରକି ବୀଚେର ପୋଲାପାନଗୁଲୋର ଟିଟକାରିଓ ଅସହ୍ୟ ।'

'ଆମରାଓ ଅବଶ୍ୟ ଯେତେ ଇଚ୍ଛେ କରାଇଁ ନା ଏତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି, 'ହାଇ ତୁଲଲ ରବିନ । 'ଏତକଣେ ଘୁମ ପାଇଁ ଆମାର ।'

'ଆମାରାଓ । ତମ ଆର ଉତ୍ୱେଜନା ଚଲେ ଗେଛେ ତୋ, ତାଇ ।'

କୁକୁରଟାଓ ଶାନ୍ତ ହେଁ ଶ୍ଵେତ ଆହେ ।

କହୁଲେର ବିଛାନାଯ ଏସେ ଶୋଯାର ମଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗେ ଘୁମିଯେ ପଡ଼ିଲ ଦୁଜନେ ।

ଅନେକ ବେଳେ କରେ ଘୁମ ଭାଙ୍ଗି ଓଦେର । ଭାଙ୍ଗିଯେ ଦେୟା ହଲୋ । ନଇଲେ ଆରାଓ ଘୁମାତ ।

ଖୁଟାଟ ଶବ୍ଦ ହଲୋ । ଶୁନେଇ ଚେଟିଯେ ଉଠିଲ ଚିତା ।

ଜେଗେ ଗେଲ ଦୁଇ ଗୋଫେନ୍ଦ୍ରା ।

ଘୁମ ଜଡ଼ିତ ଗଲାଯ ଜିଜେସ କରଲ ମୁସା, 'ଆୟାଇ, କି ହେଁବେ...'

'ଆରି, କାର୍ବ !' ରବିନ ବଲଲ, 'କି ରେ, ଆମରା କେମନ ଆଛି ଦେଖିବେ ଏସେହିସ ?'

ଛୁଟେ ଶିଯେ ଛୋଟ କୁକୁରଟାର ଓପର ଝାପିଯେ ପଡ଼ିଲ ଚିତା । ଶୁରୁ ହେଁ ଗେଲ ଖେଲା । ମାଟିତେ ପଡ଼େ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି, ଜାପଟା-ଜାପଟି...

ଦରଜାଯ ଦାଢ଼ିଯେ ଥାକା ଛେଲେଟାର ଓପର ଚୋଖ ପଡ଼ିଲ ରବିନେର ।

ମୁଖେ ଚାପ୍ତ ହାସି ନିଯେ ବଲଲ ଛେଲେଟା, 'ଘୁମ ତାହଲେ ଭାଙ୍ଗି ଘୁମକାତୁରେଦେର । ବାଡ଼େର ପର କେମନ ଆଛ ଦେଖିବେ ଏଲାମ । ଆସବ ନା କଥା ଦିଯେଇ ବଟେ, କିନ୍ତୁ

ଆଲୋର ସଙ୍କେତ

তোমাদের জন্যে দশ্চিন্তা হচ্ছিল, তাই আর থাকতে পারলাম না।'

'থ্যাংকিউ।' উঠে বসল রবিন। কাপড়ে লেগে থাকা ধূলো-ময়লা হাত দিয়ে
ঝাড়তে লাগল।

মুসাও বসেছে। বলল, 'রাতটা ভালই কেটেছে, তবে অদ্ভুত কিছু...'

রবিনের কনুইয়ের শুভোয় থেমে গেল সে। রহস্যময় ঘটনাগুলোর কথা
ছেলেটাকে জানাতে চায় না রবিন। 'সাংঘাতিক এক রাত গেল, তাই না? তোমার
কেমন কাটল?'

'ভাল। একটা ট্রেঞ্চে ঢুকে বসেছিলাম। বৃষ্টি আমার নাগাল পায়নি। ঠিক
আছে, যাই। কার্ব, আয়।'

চলে গেল ছেলেটা।

'পাগল হোক আর যা-ই হোক, ভালই কিন্তু ছেলেটা,' রবিন বলল। 'এখন,
তো পাগলামিরও কোন লক্ষণ দেখলাম না। একেবারে স্বাভাবিক।'

ঘর থেকে বেরোল ওরা। নিজেদের তাঁবু আর জিনিসপত্রগুলোর কি অবস্থা
দেখতে চলল।

তাঁবু ভজা। তবে টিনে ভরা খাবারের কোন ক্ষতি হয়নি। পানি ছুঁতে পারেনি
ওগুলোকে। রুটি, মাখন ও সার্ভিন মাছ ভাজা বের করে খেতে বসে গেল ওরা।
আগে পেট ঠাণ্ডা, তারপর অন্য কথা।

সবে রুটিতে কামড় দিয়েছে মুসা, এই সময় বলে উঠল রবিন, 'ছেলেটা
আসছে আবার।'

কাছে এসে ছেলেটা বলল, 'গুড মর্নিং। কেমন আছ দেখতে এলাম। উফ,
সাংঘাতিক একটা ঝড় গেল।' মুখে হাসি নেই তার।

হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে দুই গোয়েন্দা।

কয়েক মুহূর্ত ভাষা ঝুঁজে পেল না ওরা। অবশেষে মুসা বলল, 'দেখো, ভাল
ছিল ভাল থাকো। পাগলামি শুরু কোরো না আবার। ভাল যে আছি আমরা বলা
হয়েছে তোমাকে।'

'না বলোনি।...যাই, উন্মাদের সঙ্গে কথা বলা চলে না।'

চলে গেল সে।

'দেখলে!' রবিন বলল, 'ও আসলেই পাগল। ভাল তাকে বলেও সারতে
পারলাম না, অমনি এল খাবাপ হওয়ার জন্যে। নাকি আমাদের নিয়ে মজা করছে?'

'কি জানি! হতে পারে!'

কড়া রোদ উঠল। বৃষ্টির পর এই রোদ গায়ে ছাঁকা দেয়। ভেজা জিনিসপত্র
তাতে শুকাতে দিল ওরা। ঝোপের ছায়ায় বসে কথা বলতে লাগল।

'যা-ই বলো,' রবিন বলল, 'মন থেকে সরাতে পারছি না কথাগুলো।'

'কি কথা?'

'এই ধরো, ছেলেটার উল্টোপাল্টা আচরণ...'

'করে করুকগে। আমাদের কি?'

'কিছু না। কিন্তু খচখচ করে মনে। এরকম সাধারণত হয় না।'

‘পাগলে কি না বলে...’

‘তারপরেও, ঠিক মেনে নিতে পারছি না। তার ওপর আরও দুটো ঘটনা। প্রথম দিন রাতে কটেজে দেখলাম রহস্যময় আলো। কাল রাতে ঝড়ের মধ্যে দেখলাম মানুষ। সব কিছুই যেন এই আছে এই নেইয়ের ভেলকিবাজি।’

‘এর জবাব পেতে হলে ভৃত বিশ্বাস করতেই হবে তোমাকে।’

‘এখন কিশোর থাকলে খুব ভাল হত। মুসা, তাকে গিয়ে নিয়ে আসব নাকি? রহস্যের কথা বললে যত কাজই থাক, সব ফেলে...’

বাধা পড়ল রবিনের কথায়। ঘেউ ঘেউ করে উঠল চিতা।

‘আহ, অনেক দিন বাঁচবে! চিৎকার করে বলল মুসা। ‘নাম নিতে না নিতেই এসে হাজির।’

রবিনও দেখল। পায়েচলা পথটা ধরে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে স্বয়ং কিশোর পাশ।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল দুজনে।

গোয়েন্দাপ্রধানকে এগিয়ে আনতে ছুটল।

আট

‘এই তাহলে তোমার চিতা। এরই জন্যে ঘর ছেড়েছ,’ নিচু হয়ে কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল কিশোর। ‘কি রে, কেমন আছিস?’

একবার ‘ঘাউ’ করেই অনেক কথা বুঝিয়ে দিল কুকুরটা। আন্তরিকতা দেখানোর জন্যে হাত চেঁটে দিল কিশোরের। ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগল। জিভটা লম্বা হয়ে বুলে পড়েছে মুখ থেকে। আদুরে ভঙ্গি।

‘আরি, এ তো একেবারে জিনার রাফিয়ান,’ হেসে বলল কিশোর। ‘স্বভাব-চরিত্র এক। কেবল চেহারাটা আলাদা।’

‘ভাল বলেই তো রাখতে চেয়েছি।’

‘কিন্তু তোমার আশ্মা?’

‘না দিলেও রাখব। জোর করে রাখব।’

‘বিশ্রোহ করবে নাকি?’

‘করবে আর কি?’ রবিন বলল, ‘করে তো বসেই আছে।’

‘তা বটে।’

তাঁবুর কাছে চলে এল ওরা। ছায়ায় বসল।

রবিন বলল, ‘একেবারে ঠিক সময়ে এসেছ, কিশোর। তোমাকে আনতে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম।’

‘পালিয়ে এসেছি। আজকে আরও কয়েক ট্রাক মাল আনতে যাওয়ার কথা। ভয়েই পালিয়েছি। চিঠি লিখে রেখে এসেছি চাচীকে, কিন্তু জিনের জন্যে আরও অস্তত দুজন লোক রাখতে।...হ্যাঁ, এবার বলো, আনতে যাচ্ছিল কেন?’

‘রহস্য।’

সজাগ কোরি আর। উঠল চোখের তারা। 'রহস্য?'
 'খাবে কু? জিজেঁ' নরল মুসা। 'খিদে পেয়েছে? খেতে খেতেই
 অনো...'

‘তা অবশ্য বলোনি। ঢাটীকে ফাঁকি দিয়ে পালানোটা খুব কঠিন। খাওয়ার সুযোগ হচ্ছে নিজের ব্যাগের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। ‘অনেক খাবার কিনে এনেছি; ফাটা, খুলি।’

ଖୁବ ଖୁଣି ଜାଗର
ଗେହେ । ଦୁଇଟା, ଏ
ଭାଲ ଲାଗଛେ ସବ କି
ମୂଳ ଓ ବିନିନେ । କିଶୋର ଆସାତେ ଯେନ ସବ କିଛୁ ବଦଲେ
ଯାଏ ସବ ଉଥାଓ । ଜ୍ୟାନ୍ତ ହଯେ ଉଠେଛେ ଯେନ ପରିବେଶ । ଆବାର
.

ভেজা প্রকৃতি আর ভেজা নয়, শুকিয়ে দিয়েছে কড়া রোদ। বৃষ্টিতে ধূমে মুছে
গেছে ধূলো, বালমল কবছে গাছের পাতা। কোথা থেকে বেরিয়ে এসেছে হাজার
হাজার ফড়িং। ওকের ডালে উড়ে এসে বসল একটা দোয়েল। মিষ্টি শিস দিতে
লাগল।

নাস্তা খেয়েছে যে বেশিকণ হয়নি, তা-ও আবার খিদে পেয়ে গেছে মুসার।
রবিনেরও কিশোরের খাবার খোলার অপেক্ষায় উন্ধর হয়ে আছে।

একে একে বের করল কিশোর চিকেন স্যাগউইচ, স্যামন স্যাগউইচ, বীফ রোল, ফ্লট কেক, সালাদ, চকলেট: পনির, জেলি, ফলের টিন।

ଚୋଥ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୟେ ଗେଲ ମୁସାର । ‘ତୋମାର ବ୍ୟାଗ-ଭର୍ତ୍ତି ଶଧୁ ଖାବାରଇ ଛିଲ ନାକି?’

‘না,’ হাসল কিশোর, ‘কঁপড়-চোপড়ও আছে। তুঁথপেস্ট, বাশ, সাবান, সব। অন্যের বাশ দিয়ে কি আর দাঁত মাজা যায়।’

মুসা হাসল। রবিনও হাসল।

‘ଆହଁ, କି ଜିନିସ ଏନେହଁ;’ ଖାବାରଗୁଲୋର ଦିକେ ତାକିଯେ ବଲଳ ମୁସା, ‘ଗନ୍ଧେଇ ପେଟ ଖାଲି’

‘ঠিক আছে, ভরতে শুরু করো,’ কিশোর বলল। ‘এখানকার খবর জানিয়েও আমার মগজিটা ও ড্রাইও।’

‘বলতে শুরু করল রবিন। প্রথম রাতে কটেজে আলো দেখেছে, ফিসফিস করে কথা বলতে শুনেছে, পায়ের আওয়াজ শুনেছে, এসব বলার পর বলল, ‘মুসা আর আমি গিয়ে দেখি কিছুই নেই। ভাবলাম, হঠাৎ ঘূম থেকে উঠে গিয়ে ভুল দেখেছি, ভুল শুনেছি। কিন্তু এখন আর তা মনে করিনা।’

‘কেন?’ স্যান্ডউইচ চিবাতে চিবাতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ବାଦ୍ରୁଷ୍ଟି ଥେକେ ବୀଚାର ଜନ୍ୟ କିଭାବେ ଗିଯେ କଟେଜେ ମୁକେହେ ମୂସା ଓ ରବିନ,
ଖୋଲା ମାଠେ ମାନସ ଦଂଡିଆସି ଥାକତେ ଦେଖେଛେ, ସବ ଜାନାନୋ ହଲୋ ତାକେ ।

‘ই’ মাথা দোলাল কিশোর, ‘হস্য একটা আছে। জাগাটা দেখে কিন্তু মনে হয় না এখানে কাবৰ ও আগাহ জাগানোৰ মত কিছি ধৰতে পাৰে।’

‘তা আছে, প্রতিটুকুর খোরাক। মাটি চুড়ে প্রাচীন ইনডিয়ানদের থালা-বাসন
দের কুকুর দেখো কুকুর এক প্রচেষ্টা বল চেলে।’

‘ছল্লো পাখল’ মসা বলব। কেউন কি বলে না বলে দিক্ষিণান নেই। এই

ভাল তো এই খারাপ। একবার মনে হয়, বাহু, কি ঘটিছে, আবার মনে হয় দিই
করে এক লাখি।'

সে খামতেই রবিন বলল, 'একবার এক জায়গায় দেখ ফরেও হিন্ট পরেই
আরেক জায়গায়, এমন কোথাও, পায়ে হেঁটে তাড়াত হিন্টে যাওয়া
সহবই নয়। ডানা থাকলে হত।'

'তাহলে যাচ্ছে কি করে?'

'সেইটাই তো কথা।'

'তার সঙ্গে আবার একটা কুকুরও থাকে,' মুসা বলল, 'এক জীব কানা।'

'ইন্টারেসটিং,' কিশোর বলল। 'পুরোপুরিই ছুড়ে কান ধোঁটাতে যুসার
দিকে তাকাল সে।' তোমরা দুজন এখনও আছ কি করে এখন
কিন্তু ভূত দেখা যায়, জানো তো। পোড়ে, এলাকায় ঘুনে কে
ছেলের সঙ্গে একটা কান কুকুর... যখন-তখন যেখানে-সেখা

কিশোরকে এভাবে কথা বলতে তনে অবাক হলো মৃ
বিশাস করে না। চোখে চোখ পড়তেই ঘুনে ঘেলল, র
ফেলল দুজনেই।'

রবিন বলল, 'কাল রাতে অবশ্য টিক করে ফেলেছিলো। জ সঞ্চালেই
বাড়ি চলে যাব। কিন্তু তোর হতেই মুসা কিংবা হেঁটে গেল। কোনো অভিযোগ থাকবো।
তুমি এসেছ, আর তো যাওয়ার প্রশ্নই ওই

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'হস্ত কর না করে
যাচ্ছ না। বাড়ি ফিরে গেলেই তো আবার
মধ্যে গিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না।'
আবর কটেজ নিয়ে।'

কুকুরটা তাকিয়ে আছে তার
সাওওইচটুকু তার দিকে ছুড়ে দিল লে
বলল, 'উহ, গায়ে এত গন্ধ কেন রে?'
না?'

'সুযোগ পেলাম কই? তুলে আনলাম তা
আরপরই তো গলায় হার্ডবোর্ড লাগালৈ টো
না!'

ভাল করে ধূমে-চুমে বাড়ি নিয়ে। এই গন্ধ থাকে পেলে কুকুর দূর করে, আবার
তাড়াবে, জাঙ্গা দেয়া দূরে থাক। তলে পানি খেয়ে

মণ নিয়ে গিয়ে ঝর্না থেকে পান্তি এল ওরা।

'জিনিসপত্রগুলো কোথাও ত্যাগিয়ে থাক দরকার,' কিশোর বলল। 'এই তাঁকুত
যাখা মোটেও নিরাপদ না। বিশেষ করে খাবার। মানুষে শি হলেও শেঝাল-টেম্পে
এস খেয়ে যেতে পারে।'

'হ্যা,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'কুকুর অ্যালেক্সার বার ভাজলে জিনিসপত্র নষ্ট
হবে।'

আলোর স্বত্ত



‘রাখব কোথায়?’ মুসার প্রশ্ন।

‘কেন, এত সুন্দর কটেজটা থাকতে ভাবনা কি,’ কিশোর বলল।

‘ওটা সুন্দর হলো! একটা ধর্সে পড়া পোড়ো বাড়ি, ভাঙাচোরা জানালা-দরজা, রোজ-ব্যাস্ত্রারের ঝাড়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করছে...’

‘এমন জায়গায় থাকতেই তো মজা। নাও, ওঠো, আর দেরি করে লাভ নেই।’

জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে কটেজে সাজিয়ে রাখতে ব্যয় করল ওরা পরের আধ-ঘণ্টা। এক কোণে একটা তাক পাওয়া গেল, তাতে তুলে রাখল ব্যগঙ্গলো। খাবার রাখল পুরানো ফায়ারপ্লেসটার পেছনে একটা অন্ধকার তাকে।

কাজ শেষ।

‘এইবার,’ কিশোর বলল, ‘চলো, তোমাদের পাগলা ছেলেটাকে দেখতে যাওয়া যাক।’

নয়

রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। পায়ে পায়ে চলল চিতা। এত মানুষ দেখে খুব খুশি সে। একবার এর পায়ে গা ঘষছে, একবার ওর পা ঘেঁষে চলছে, দোড়ে সামনে যাচ্ছে, পিছিয়ে আসছে, আনন্দে পাগল হয়ে গেছে যেন। গলার কলারটা নড়ছে হাস্যকর ভঙ্গিতে।

‘খেপে গেল নাকি ব্যাটা,’ হেসে বলল কিশোর।

‘না, বেশি খুশি,’ মুসা ও হাসল।

‘এটাকে রাখতে পারলে মন্দ হয় না।’

‘তা তো হয়ই না। কিন্তু মা তো সেটা বুঝতে চায় না।’

‘বাড়ি শিয়ে দেখো এবার, দেন কিনা। না দিলে ইয়ার্ডে নিয়ে শিয়ে রেখে দেব। তিন গোয়েন্দার একটা কুকুর দরকার।’

হেসে বলল রবিন, ‘চার গোয়েন্দা হয়ে যাবে।’

‘হোক না, ক্ষতি কি? গোয়েন্দা কুকুর অনেক কাজে লাগে। আমরা এটাকে ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে পুলিশের কুকুরগুলোর মত বানিয়ে ফেলব।’

‘ভালই হবে।’

‘কিন্তু মেরিচাটী যদি রাখতে না দেন?’ মুসার প্রশ্ন।

‘তা দেবে,’ কিশোর বলল। ‘রাজি করিয়ে ফেলব, কষ্ট হবে আরকি। কুকুর আমাদের আগেও ছিল, ভুলে গেছ? চাচার ছিল, আমার ছিল। চাচী অবশ্য সব সময়ই বিরক্ত থাকত...’

‘কিন্তু রাজিটা করাবে কি করে, শনি?’ নিচিন্ত হতে চাইছে মুসা।

তার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। ‘তুমি ভাবছ হাতে-পায়ে ধরে অনুরোধ করব? মোটেও না। ইয়ার্ডে মালপত্র ছড়ানো থাকে, চুরি হওয়াটা স্বাভাবিক। বেশ কিছ দামী মাল চুরি হয়ে যাবে রাতের বেলা। পুলিশের কাছে চাচীকে ঘেরে দেব না কিছুতেই। তদন্তের দায়িত্ব পড়বে আমাদের ওপর। জিনিসগুলো খুঁজে বের

করবে কুকুরটা। তারপর আর কি? এমন একটা কাজের কুকুর রাখতে তখন কোন আপত্তি থাকবে না চাচীর। বরং সর-মাধ্যন খাওয়াবে।'

'কিন্তু সময়মত চুরি যে হবেই তার ঠিক কি?'

'হওয়ানোর ব্যবস্থা করব।'

ভুক্ত কুচকে কিশোরের মধ্যের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল, 'বুঝেছি। মেরিচাচী খুব ভাল। আমার মা-কে কিন্তু এভাবে ফাঁকি দেয়া সম্ভব না।'

রবিন বলল, 'আরেকটা বড় প্রশ্ন কিন্তু রয়েই গেল। যাকে নিয়ে এত ঝামেলা করছি আমরা, তার মালিক কে কিছুই জানি না। যদি খোজ পেয়ে এসে নিয়ে যেতে চায়?'

'গিয়েই আগে বিজ্ঞাপন দেব। মালিক থাকলে আসবে। কিনে রাখার চেষ্টা করব তার কাছ থেকে।'

'যদি বিক্রি না করে?'

'সে তখন দেখা যাবে।' কুকুরটাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি রে চিতা, গোয়েন্দা হবি?'

'ইউ' করে মাথা ঝাঁকাল চিতা।

'বাহ, রাজি,' হাসল কিশোর।

রবিন হেসে বলল, 'কিছু জিজ্ঞেস করলেই ওরকম হউ হউ করে আর মাথা ঝাঁকায়...'

মুসা বলে উঠল, 'ওই যে বসে আছে!'

'কে?'

'ওই ছেলেটা।'

বোপের পাশে বসে তাকে বই পড়তে দেখল কিশোর। 'কই, তেমন বিশেষ কিছু তো মনে হচ্ছে না। অতি সাধারণ।'

'এসো, কথা বলি।'

এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'হালো। কাৰ্ব কোথায়?'

মুখ তুলে তাকাল ছেলেটা, 'কি করে বলব?

'আজ সকালেও তো তোমার সঙ্গে ছিল।'

'না, ছিল না। কখনও আমার সঙ্গে থাকে না। দয়া করে বিরক্ত কোরো না আমাকে, আমি পড়ছি।'

কিশোরের দিকে ফিরল মুসা, 'এই হলোগে অবস্থা। সকাল বেলা কুতুটাকে নিয়ে দেখা করতে এসেছিল, এখন পুরোপুরি অশ্বীকার করছে। পাগল ছাড়া আর কি বলবে?'

'পাগল তো তোমারা!' ঝাঁঝিয়ে উঠল ছেলেটা। 'যাও এখান থেকে!'

খনিকটা সরে এসে কিশোর বলল, 'ও এখন এখানে। জায়গাটা দেখার এই-ই সুযোগ। জলদি চলো।'

খোড়ার কাজ যেখানে চলছে সেই ক্যাম্পের কাছাকাছি হতেই শিস শোনা

গেল, আর মাটি কোপানোর শব্দ। ট্রাঙ্কের কাছে পৌছে নিচে উকি দিয়ে এতটা চমকে গেল মুসা, আরেকটু হলেই পড়ে গিয়েছিল।

আপনমনে শিস দিতে দিতে মাটি খুড়ে চলেছে ছেলেটা। কপালে এসে পড়া লম্বা চুল সরাতে গিয়ে চোখ পড়ল তিন গোয়েন্দার ওপর। ভুঁক কুঁচকে জিজেস করল, ‘আবার এসেছ?’

সে কথার জবাব না দিয়ে মুসা বলল, ‘তানা আছে নাকি তোমার? উড়ে এসেছ?’

‘উড়ে আসব কেন? হেঁটে এসেছি।’

‘এই না দেখলাম বই পড়ছ?’

‘বই পড়ব কেন? এখানেই তো আছি। মাটি খুড়ছি, এক ঘণ্টা হয়ে গেল।’

‘পাগল!’

রেপে গেল ছেলেটা, ‘এ তো সত্যি সত্যি পাগল বানিয়ে দেবে দেখছি! তোমাদের না কতবার বললাম, দয়া করে এসো না এখানে, আমার ডিস্টার্ব হয়...’

‘দেখো, তোমাকে ডিস্টার্ব করতে আসিনি আমরা,’ শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। ‘শুধু দেখতে এসেছি। জায়গাটা কি তোমার?’

‘আমার হতে যাবে কেন? এত বড় জায়গা কি কাঁচাও একলার সম্পত্তি হয়। বছরখানেক আগে এখানে মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার করেছিল আমার আব্দা। গবেষণা চালানোর জন্যে সরকারের কাছ থেকে চেয়ে নিল জায়গাটা। এসব ব্যাপারে আমারও আগ্রহ আছে। সে জন্যেই দেখতে এসেছি কিছু পাওয়া যায় কিনা। আব্দাকে বলে এসেছি এখানে ছুটি কাটাব। কি পেয়েছি দেখবে?’

হাত তুলে একটা পুরানো তাক দেখাল ছেলেটা। তাতে সাজানো রয়েছে একটা ভাঙা ইঁড়ি, একটা আদিম বৌচ, টাই-পিনের মত কোন একটা অলঙ্কার, আর পাথরে তৈরি একটা মানুষের মাথার অর্ধেকটা।

কৌতুহল হলো কিশোরের। লাফ দিয়ে নামল ট্রাঙ্কে। ‘দাক্ষণ সব জিনিস পেয়েছ মনে হয়। মোহর-টোহর পেয়েছে?’

‘পেয়েছি,’ পকেট থেকে তিনটে মুদ্রা বের করল ছেলেটা, দুটো তামার, একটা ঝুপার। ‘এই দেখো। কয়েকশো বছরে পুরানো। স্প্যানিশদের।’

‘হঁ,’ নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল এবার গোয়েন্দাপ্রধান।

তার দেখাদেখি রবিনও নে— এসেছে। প্রত্নতত্ত্বে তারও আগ্রহ আছে।

মুসার এসব ভাল লাগে না। সে রক্ষ গেল ওপরে। বিশাল একটা পাথরের বসল। চোখ পড়ল একটা খরগোশের ওপর। সাদা আরেকটা পাথরের ধারের একটা গর্ত থেকে উকি দিচ্ছে।

একবার তাকিয়ে তাকিয়ে পেয়ে নিচুঁ খুঁকে গেল ওটা, আবার বেরোল। তয়ে তাকাল মুসার দিকে, আবার চুকল, আবার বেরোল। কিন্তু পালিয়ে যাচ্ছে এ চুনিচয় ছানা আছে, ডেকে পাশ সরল নসা। চুকে গেল খরগোশটা। হাতে তর দায়ে উৰ হয়ে গর্তের ডেতের উকি দিল সে। ঝঁক্কার।

কোমরে বোলানো একটি খুল আলো ফেলল ডেতরে। কিন্তু খরগোশটাকে

দেখা গেল না। তার বদলে দেখল একটা সুড়ঙ্গ। দেয়ালের একপাশে ছোট ছোট কয়েকটা ফোকর, খরগোশের বাসা। মূল সুড়ঙ্গটা তেরছা হয়ে কয়েক ফুট গিয়েই শেষ, তারপর শুধুই শূন্যতা। আচর্য! কুয়া-টুয়া নাকি?

সঙ্গীদেরকে খবরটা জানানোর জন্যে উঠে এসে ট্রেফের পাড়ে দাঁড়াল সে। কিশোরকে তার আবিষ্ট জিনিস গর্বের সঙ্গে দেখাচ্ছে ছেলেটা।

‘অ্যাই,’ ডেকে বলল মুসা, ‘কি পেয়েছি জানো? সুড়ঙ্গ। তার আবার শেষ নেই।’

‘ও, ওটা,’ বিশেষ শুরুত্ব দিল না ছেলেটা। ‘জানি। শেষ আছে ওটার। আব্বা বলেছে, অনেক বড় একটা শুহা আছে ওখানে। স্টোরর হিসেবেও ওটাকে ব্যবহার করত স্প্যানিশরা। গরমকালে মাংস জমিয়ে রাখত। লুটের মাল আর অন্যান্য জিনিসও রাখত। খুব সাধারণ শুহা।’

নিরাশ হলো মুসা। আবার গিয়ে বসল পাথরের ওপর।

আরেকটা তাকের কিছু জিনিস দেখিয়ে রবিন জিজেস করল ছেলেটাকে, ‘এগুলো তোমার?’

‘না।’

‘কার?’ বলতে বলতে গোল সুন্দর একটা পাত্র নামাতে গেল রবিন।

হাঁ হাঁ করে উঠল ছেলেটা, ‘ধরো না, ধরো না।’

তার চিন্কারে চমকে গেল রবিন। আরেকটু হলেই দিয়েছিল হাত থেকে ফেলে।

‘রাখো ওটা! যেখানে আছে রেখে দাও! আবার চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা।

‘আহা, শান্ত হও,’ মোলায়েম গলায় বলল কিশোর, ‘অত রেগে যাওয়ার কি হলো। ভাঙ্গেতোনি।’

‘কিন্তু ভাঙ্গতে পারত। ভাবলাম এত নিরালা জায়গা, কাজ করে একটু শান্তি পাব। কোথায়! মানুষের হাত থেকে নিষ্ঠার নেই! খেদাতে খেদাতে মরলাম।’

সজাগ হয়ে উঠল কিশোরের গোয়েন্দা মন। মনে পড়ে গেল রবিনের গল্প : বড়ের মধ্যে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়েছিল দু-তিনজন লোক! জিজেস করল, ‘মানুষ? কেমন মানুষ?’

‘কেমন আর। অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো যাদের স্বভাব। ট্রেফে নেমে এসে ঝঁজতে চায়।’

‘কী?’

‘তা কি করে বলব? হয়তো ভাবছে মোহর খুঁজছি আমি। স্প্যানিশদের শুণ্ঠনে বোঝাই এ-জায়গা।’

‘তেমন কোন সন্তান আছে নাকি? মানে শুণ্ঠন...’

‘আরে না! এই এলাকার ওপর লেখা কম বই তো আর পড়িনি। কোথাও শুণ্ঠনের ইঙ্গিত নেই। থাকলে, আব্বাও বলত আমাকে। খামোকা সন্দেহ করে এসে বিরক্ত করে। বোকা, হৃদ বোকার দল সব...’ শেষ করল না কথাটা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। ‘তোমরা কিছু মনে কোরো না, তোমাদের বলিনি।’

‘কান রাতে কেউ এসেছিল?’ জানতে চাইল কিশোর।

‘দেখিনি। তবে কার্ব খুব চেঁচামেচি করছিল ভাবলাম, ঝড়-তুফান দেখে ওরকম করছে। অবাকই লাগছিল। ঝড়বষ্টিকে ভয় করে না সে।’

‘দেখো কাণ, এতক্ষণ ধরে কথা বলছি, অথচ তোমার নামই জিজেস করা হয়নি।’

‘রোনাল্ড কুইলার। রনি।’

‘স্যার মরিস কুইলারের ছেলে না তো তুমি, বিখ্যাত প্রম্ভবিদ?’

হাসল রনি, ‘হ্যা। প্রম্ভত্বের অনেক খবরই তো রাখে তোমরা।’ একটা বেলচা তুলে নিল, ‘ঠিক আছে, সময় করে আলাপ করা যাবে...’

ট্রেঁশ থেকে উঠে এল দুই গোয়েন্দা। মুসা বলল, ‘গরমী লাগছে। চলো, সাঁতার কাটি।’

‘চলো,’ কিশোর বলল।

ডোবার কাছে এসেই বলে উঠল মুসা। ‘খাইছে! আবারও আমাদের আগেই এসে বসে আছে!

পানিতে ডুব দিচ্ছে আর মাথা তুলে হাপুস-হপুস করছে ছেলেটা, মুখ দিয়ে পানি ছাড়ছে। তিন গোয়েন্দাকে দেখে কপালের চুল সরাল। তারপর সোজা রওনা দিল উল্টোদিকের পাড়ের দিকে।

চিৎকার করে ডাকল মুসা, ‘হেই রনি, থাকো, থাকো, আমাদের সঙ্গে সাঁতার কাটো।’

কিন্তু থামল না ছেলেটা। পাড় বেয়ে উঠে পড়ল ওপরে। ফিরে তাকিয়ে বলল, ‘আমার নাম রনি নয়।’

আর একটা মুহূর্তও দাঁড়াল না সে। হারিয়ে গেল ঝোপের ভেতর।

কিশোরের দিকে ফিরে মুসা বলল, ‘কাণ্টা কি করল দেখলে? পাগল।’

জবাব দিল না কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে ঝোপটার দিকে। ঘন দুবার চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে।

পানিতে নেমে খিদে না পাওয়া পর্যন্ত দাপাদাপি করল তিনজনে। হতাশ ভঙ্গিতে তীরে বসে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল চিতা। করুণ দৃষ্টি। দাপাদাপিতে যোগ দেয়ার তারও খুব ইচ্ছে। কিন্তু মুসা নামতে দিচ্ছে না। হার্ডবোর্ড ভিজে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে।

পানি থেকে উঠে পাড়ে বসে গা শুকিয়ে নিল ওরা। তারপর ফিরে চলল কটেজে।

চিনে ভৱা আনারস দিয়ে পাউরুটি খেতে লাগল। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রচুর ফ্রুট কেক আর শর্টবেড বিস্কুট। সবই খেলো চেটেপুটে। আনারসের রসটুকুও ফেলল না। টিন থেকে মগে ঢেলে নিয়ে তাতে পানি মিশিয়ে খেয়ে ফেলল।

চেকুর তুলতে তুলতে বাংলায় বলল ‘মুসা, ‘আহ, খাইলাম! আঘায় খাওয়াইল।’

অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রবিন। বাংলা বোঝে সে-ও। ‘এটা আবার

শিখলে কোথেকে?’

‘বাংলাদেশের একটা লোককে বলতে শনেছি। কে জানি অর্ধেকটা বাসি রঞ্জি
ফেলে গিয়েছিল ডাস্টবিনের কাছে। সেটা খেয়ে হাত তুলে দোয়া করছিল।’

হেসে ফেলল রবিন। ‘পাঠ রঞ্জি খেয়েই এত ভক্তি! দেখলে কোথায়?’

‘রঞ্জি বাচের ফুটপাথে। ডিঙ্কে করছিল।’

শনে গভীর হয়ে গেল কিশোর। বিড়বিড় করল, ‘হঁ! এই তো করবে, জানেই
তো কেবল ডিঙ্কে করা।’

‘কি বললে?’

‘অ্যাঁ!...না,’ নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় টেনে টেনে বলল কিশোর, ‘আর
কোনো কাম ন হাইলে বিক্ষা করিও, বালা হইসা কামাইতা হাইরবা।’

বুঝতে পারল না মুসা। ‘মানে?’

বুঝিয়ে দিল কিশোর, ‘আর কোন কাজ না পেলে ডিঙ্কে কোরো, অনেক
পয়সা কামাতে পারবে।’

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল রবিন। মুসাও হাসছে। চিতা ভাবল, তারও হাসা
দরকার, নইলে মজলিসে মানায না। খেক খেক করে কুকুরে-হাসি হাসল সে।

কিশোর হাসল না। ‘ব্যাপারটা হাসির নয়। ইদানীং ভবঘূরের সংখ্যা বাড়ছে
এদেশেও। প্রচুর এশিয়ান আছে তাদের মধ্যে। কি করে কি করে বেআইনী ভাবে
চুকে পড়ে আমেরিকায়। তারপর আর কাজ পায় না। পুলিশের ডয়ে পালিয়ে
বেড়ায়। দেশে থাকলে যে হালে থাকত, তার চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থা হয়ে যায়
এখানে। ওয়া ভাবে আমেরিকায় এনেই সব সমস্যার সমাধান, টাকার
ছড়াছড়ি...হায়রে বোকা মানুষ।’

এক মৃহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, ‘মানুষ নিয়ে গবেষণা অনেক হয়েছে। চলো,
ওঠো, এবার কটেজটাতে খুঁজেব।’

‘আমরা খুঁজেছি,’ রবিন বলল। ‘পাইনি কিছু।’

‘তবু আরেকবার খুঁজি।’

তন্ম তন্ম করে খোঁজা হলো বাড়িটাতে। সিঁড়ি, ওপরতলার দুটো ঘর—ঘর আর
বলা যায় না ওঙ্গলোকে; ছাত, দেয়াল বেশির ভাগই ধসে পড়েছে, নিচ তলার ঘর,
কোন জায়গা বাদ দিল না।

‘বললাম না, পাবে না,’ রবিন বলল।

‘ছাউনিটাতে চলো,’ মুসা বলল। ‘আস্তাবল ছিল যেটা।’

তেতুরটা অস্তুকার। জানালাগুলো এত ছোট, আলো আসে অতি সামান্য।
চোখে সইয়ে নিতে সময় লাগল।

উবু হয়ে একটা নাল তুলে নিয়ে দেখে, আবার মেঝেতে ফেলল কিশোর। টন
করে উঠল পাথরে লেগে। সেদিকে তাকিয়ে থমকে গেল সে। ‘এই, দেখে যাও,
ব্যাপারটা অস্তুতি।’

‘কী?’ এগিয়ে এল মুসা আর রবিন।

‘দেখো তো এই পাথরটা। আগের বার এরকমই দেখেছিলে কিনা?’

‘এরকমই তো...’ মুসা বলল।

রবিন ভাল করে দেখে বলল, ‘না, তোলা হয়েছে মনে হয়! তুমি ঠিকই ধরেছ
কিশোর, আগের বার এরকম ছিল না। একটা পাশ উঠু হয়ে আছে। কিনারে লেগে
থাকা শেওলাও নেই।’

‘হ্যাঁ,’ মাথা দোলাল কিশোর, ‘তার মানে তোলা হয়েছিল। নিচে কিছু লুকানো
থাকতে পারে।’

‘তাহলে কি এর জন্যেই এসেছিল লোকগুলো কাল রাতে?’

‘কি আছে নিচে?’ মুসার প্রশ্ন।

‘এখনই জানা যাবে, বসে পড়ল কিশোর। দেখি, হাত লাগাও, তুলতে
হবে।’

দশ

পাথরটা আলগা রয়েছে বলেই তুলতে পারল ওরা। তবু অনেক কসরত করতে
হলো। বেজায় ভারি।

ধূম করে একপাশে কাত হয়ে পড়ল ওটা। লাফিয়ে সরে গেল তিন
গোয়েন্দা। ঘেউ ঘেউ শুরু করল চিতা।

কিন্তু কিছুই নেই নিচে। একটা গর্তও না। লোহার মত শক্ত কালো মাটি,
বস, আর কিছু না।

শুকনো কঠিন মাটির দিকে বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে তিনজনে। নিরাশ
হয়েছে। কিছু একটা পাবেই আশা করেছিল।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, ‘ব্যাপারটা অদ্ভুত, তাই না? যার তলায় কিছুই
নেই, সেটাকে এত কষ্ট করে তুলতে যাবে কেন কেউ?’

‘হয়তো ভেবেছিল আছে।’

রবিন বলল, ‘এমন কিছু খুঁজছে, যা এখানে নেই।’

‘সেটা কি?’ মুসার প্রশ্ন।

‘সেটাই তো বুঝতে পারছি না,’ কিশোর বলল। ‘ও হয়তো শুধু এটুক জানে,
এখানকার কোন পাথরের নিচে আছে জিনিসটা। কিন্তু কোন পাথরটার নিচে, তা
জানে না।’

‘তাহলে বাকিগুলো তুলে দেখছি না কেন আমরা?’

‘কারণ, কোনটার নিচে আছে জানা নেই। কি আছে তা-ও জানি না। এত
ভারি পাথর তোলা সহজ কাজ নয়। না জেনে অথবা পরিষ্ম করার কোন মানে হয়
না। তুলতে তুলতে ঘাম ঝরিয়ে ফেলব, তারপর হয়তো দেখব কিছু নেই।’

ওটানো পাথরটার ওপর বসে পড়ল কিশোর। অন্য দুজন বসল তার দিকে মুখ
করে। কুকুরটাও বসল কাছেই। ভাবভঙ্গ দেখে মনে হচ্ছে জরুরি এই মীটিঙে সে-
ও অংশ নিতে চায়।

নিচের ঠোঁটে কয়েকবার টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। বলল, ‘রবিন, প্রথম

ରାତେ କଟେଜେ ଆଲୋ ଦେଖେ ତୁମି । କଥା ଶୁଣେ । ତାରପର କାଳ ରାତେ ଝଡ଼ର ସମୟ ହୋଲା ମାଠେ ମାନୁଷ ଦେଖେ ।'

ମାଥା ବାକାଳ ରବିନ । 'ହଁ । କାଳ ରାତେ ମୁସା ଦେଖେ ।'

'ତାରମାନେ ସତି ଆଛେ ଓରା । ଏଇ ଏକଟାଇ ଅର୍ଥ, ଏଥାନେ କୋନ କାଜ ଆଛେ ଓଦେର । କିଛୁ ଖୁଜିତେ ଏସେହେ ।'

ମୁସା ବଲଲ, 'ଆଥରେ ନିଚେ ଗୁଣ୍ଡନ ଲୁକାନୋ ନେଇ ତୋ ?'

'ମନେ ହୁଯ ନା, 'ମାଥା ନାଡ଼ି କିଶୋର । 'ବାଡ଼ିଟା ଦେଖେଇ ବୋବା ଯାଯ ଏଥାନେ ଯାରା ବାସ କରତ ତାର ଧନୀ ଛିଲ ନା । ବଡ଼ଜୋର ଦୁ-ଚାରଟା ସୋନାର ମୋହର ଫେଲେ ଗେଲେଓ ଯେତେ ପାରେ । ଏବଂ ସେଙ୍ଗଲୋଓ ଏଥିନ ନେଇ । ଅନେକ ଆଗେଇ ପେଯେ ନିଯେ ଗେଛେ ଲୋକେ ।'

'ଇଦାନୀଂ କେଉ କିଛୁ ଏନେ ଲୁକିଯେ ଥାକତେ ପାରେ । ଚୋରାଇ ମାଲ ।'

'ତା ପାରେ । ଏକ ପକ୍ଷ ଏନେ ଲୁକିଯେଛେ, ଆରେକ ପକ୍ଷ ସେଙ୍ଗଲୋ ଖୁଜିତେ ଏସେହେ । ସେ ଜନେଇ ଜାନେ ନା କୋଥାଯ ଲୁକାନୋ ଆଛେ, ରାତର ଅନ୍ଧକାରେ ଲୁକିଯେ ଆସେ ଖୋଜାର ଜନେ । ଝଡ଼ର ସମୟଓ ଏସେଛିଲ । ନିଚ୍ୟ ତୋମାଦେର ତାବୁଟା ଦେଖେଇ, କିଂବା କଟେଜେ ଢୁକତେ ଦେଖେଇ । ତାଇ ଜାନାଲା ଦିଯେ ଉକି ଦିଯେ ଦେଖିତେ ଏସେଛିଲ ତୋମରା ଘୁମିଯେଇ କିନା ।'

'ତାହଲେ ତୋ ଆବାର ଖୁଜିତେ ଆସିବେ, ଯଦି ନା ପେଯେ ଗିଯେ ଥାକେ ।'

'ତା ତୋ ଆସିବେଇ ।'

'ଆମରା କି ଚଲେ ଯାବ ?'

'କେନ ? କମେକଟା ଛିଟକେ ଚୋରେର ଭୟେ ?'

'ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛୁ ହୁଁ ...'

ହେସେ ଫେଲିଲ କିଶୋର । 'ଭୂତରେ କଥା ବଲଛ ତୋ ? ଓସବ ନେଇ । ଓଠୋ, ଗିଯେ ଦେଖି କୋନ ସ୍ମୃତି ପାଓଯା ଯାଯ କିନା । ମାନୁଷ ହଲେ ଅବଶ୍ୟା କିଛୁ ନା କିଛୁ ଫେଲେ ଯାବେ ।'

'ଯଦି ନା ଫେଲେ ଯାଯ ?'

'ତାହଲେଓ ଭୂତ ହବେ ନା । ଅନ୍ୟ କୋନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଥାକିବେ ।'

ଆଶାବଳ ଥିକେ ବୈରିଯେ ଏଲ 'ଓରା । ହାତ ତୁଲେ ଦେଖିଲ ରବିନ, ଝଡ଼ର ସମୟ କୋନଖାନଟାଯ ଲୋକଙ୍ଗଲୋକେ ଦେଖେଇ ।

'ଦେଖି,' କିଶୋର ବଲଲ, 'ପାଯେର ଛାପ ପାଇ କିନା । ଭେଜା ମାଟି । ଛାପ ବନବେ ଭାଲଭାବେଇ ।'

କିନ୍ତୁ ଓଖାନେ ଏସେ ଦେଖା ଗେଲ, ଜାଯଗାଟାତେ ପୁରୋ ହୟେ ପାତା ବିଛିଯେ ଆଛେ । ଝରେ ପଡ଼େଇ ପ୍ରବଲ ବାତାସେ । ପାଯେର ଛାପ ପଡ଼େନି । ଆର ପଡ଼ିଲେଓ ପାତାର ତଳାଯ ରଯେଇ, ବୋବାର ଉପାୟ ନେଇ ।

କିଛୁକଣ ଖୋଜାଇଁ କରାର ପର କିଶୋର ବଲଲ, 'ଜାନାଲାଟାର ନିଚେ ଦେଖିବ ।'

ଆଗେ ଆଗେ ଚଲିଲ ମୁସା । ତାର ଚୋଖେଇ ଆଗେ ପଡ଼ିଲ ଛାପ ଦୁଟୀ । ବେଶ ଗଭୀର ହେୟେଇ ପଡ଼େଇ । ବାଂ ପାଶେରଟାର ଏକଟା ଧାର ସାମାନ୍ୟ ଅମ୍ପଟି, ଡାନ ପାଶେରଟା ବେଶ ଗଭୀର । ତାର ମାନେ ଓହି ପାଯେର ଭରଇ ବେଶ ପଡ଼େଇ ମାଟିତେ ।

ମୁସାର ଦିକେ ତାକିଯେ ହାସିଲ କିଶୋର, 'ବୁଝିଲେ ତୋ, ସେକେଣ୍ଡ, ଭୂତ ନୟ ।'

চূপ করে রইল সহকারী গোহেন্দা, কিছু বলল না।

ছাপটার দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করল কিশোর, 'রাবার সোল, মাঝারি
হিল, আট মন্ত্র সাইজ। মুসা, তোমার পায়ের মাপ...'

'আমার জুতোর নয় ওটা...'

হাত নাড়ি কিশোর, 'বলছিও না সেকথা। বলছিলাম, লোকটার পা তোমার
পায়ের সমান।' রবিনের দিকে তাকাল সে। জিজেস করল, 'কাগজ আছে?'

'আছে। কি করবে?'

'দরকার আছে। দাও।'

পকেটে নোটবুক আর পেসিল সব সময় রাখে রবিন। নোটবুকের ভেতর
'থেকে বের করল ভাঁজ করে রাখা এক তা সাদা কাগজ। দিল কিশোরকে।

কাগজটা ছাপের ওপর রেখে হালকা করে তার ওপর সীস বোলাল কিশোর,
জোরে চাপ-দিলে কঁকটে যেতে পারে কাগজ, কিংবা ফুটো হয়ে যেতে পারে।
তারপর সেটা তুলে নোটবুকের ওপর রেখে, চেপে আরেকবার পেসিল চালাল
রেখাণ্ডলোর ওপর। আঁকা হয়ে গেল ছাপটা। 'ব্যস, হয়ে গেল।' রবিনের নোটবুক
ও পেসিল ফিরিয়ে দিয়ে, কাগজটা ভাঁজ করে স্যন্ত্রে পকেটে রাখল সে। পকেটের
ওপর চাপড় দিয়ে বলল, 'থাক, কাজে লাগতে পারে।'

'তা তো হলো,' বলল মুসা। 'কিন্তু কটা বাজে দেখেছ? আমার খিদে
পেয়েছে।'

'আমারও। আশ্চর্য এলাকা! এখানে এত খিদে লাগে কেন?'

'লাগলেই তো ভাল। লাগবে আর খাব, খাব আর লাগবে, চলুক না এমন
করেই।'

'হ্যা, আর কাজ নেই তো, কুমড়ো হয়ে বাড়ি ফিরি।'

'এক সময় তো কুমড়োই ছিলে,' হেসে বলল মুসা।

'সে জনেই তো এত ভয়। না বাবা, আমি বরং শসা থাকতে চাই, তা-ও
রোগাটে শসা, কুমড়ো আর নয়।'

কটেজের এক কোণে এসে বসল ওরা। কম খাবে বললেও ততটা কম কিন্তু
খেলো না কিশোর, যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধেই খাবারগুলো উঠে এল তার আঙুলে,
ঠেলে দিতে লাগল মুখের ভেতর। সামন স্যাওউইচ, ফুটকেক, চকলেট, আনারস,
এবং আনারসের রস গিলতে গিলতে ঢাউস করে ফেলল পেট।

খাওয়ার পর মুসা বলল, 'অঙ্ককার হয়ে আসছে। আজও কি কটেজে ঘূমাব?'

'ঘূমাব। তাহলে রাতে কেউ ঢোকার চেষ্টা করলে জানতে পারব।'

রবিনের প্রশ্ন। 'পাহারা দেব?'

'দরকার নেই,' বলল মুসা। 'চিতাই দিতে পারবে। তার কান আমাদের চেয়ে
সজাগ। কেউ এনেই সাবধান করে দেবে।'

'যদি তারা অশরীরী না হয়,' হাসল রবিন।

ঝট করে ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল মুসা। কোণগুলোতে ছায়া। নিচু
গলায় বলল, 'অলঙ্কুণে কথা বোলো না তো! এমনিতেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জানো

না, যাগরিবের আজানের পর পরই ওরা বেরোয়...’ অস্থিতে গাল চুলকাল সে। ‘শঙ্খরীয়া এলেও টেরে পায় কুকুরেরে। ওরা সব বোঝে।’

‘তাহলে আর ভাবনা কি?’ হেসে বলল কিশোর, ‘আজ তাহলে ভূতই শিক্কার করব। ধরতে পারলে, গলায় রশি বেঁধে নিয়ে যাব রকি বীচে, টিকিট দিয়ে দেখাব। বড় লোক হয়ে যাব দু-দিনেই।’

‘হাসছ তো? হাসো! ঘাড়ে এসে যখন পড়বে তখন বুঝবে মজা! ’

‘ভূতের আলোচনা অনেক হয়েছে, এবার ওঠো, বিছানাটা ঠিক করে ফেলি। ’

আরও অনেক পাতা-লতা এনে বিছিয়ে পুরু গদি তৈরি করা হলো। তিনজনের শোয়ার জন্যে অনেক জায়গা দরকার। তার ওপর কম্বল বিছিয়ে দিতেই তৈরি হয়ে গেল চমৎকার বিছানা।

ততক্ষণে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। মোম জ্বেলে কাঞ্জ করছে ওরা। বিশাল ঘরটার অন্ধকার এই অল্প আলোয় কাটছে না, বরং কোণগুলোতে আরও জমাট বেঁধেছে। ইটের দাঁত বের করা দেয়ালে ছায়া নাচছে, ভৃতুড়ে করে তুলেছে পরিবেশ।

শুয়ে পড়ল কিশোর। হাই তুলে বলল, ‘আমার ঘুম পেয়েছে।’

চিতা এসে শুয়ে পড়ল মুসার গা ধুঁষে। ঠেলে সেটাকে সরিয়ে দিতে দিতে বলল সে, ‘হাই কুতা, সর। নিচে নাম। এমনিতেই জায়গা নেই, খালি বিছানায় ওঠে দেখো।’

শুয়ে পড়লেও ঘুম এল না কিশোরের চোখে। ভাবতে লার্গল পাথরের ফলকটার কথা। কেউ একজন আশা করেছিল ওটার নিচে কিছু আছে। কি আশা করেছিল? কি করে বুঝাল ওটাই সেই পাথরটা? তার কাছে কোন নকশা কিংবা ম্যাপট্যাপ আছে? নকশাই যদি থাকে তাহলে ভুল করল কেন? নাকি নকশাটাও ভুল?

ভাবতে ভাবতেই চোখ লেগে এল একসময়।

চিতা ও ঘুমিয়েছে। তবে একটা কান খাড়া। শুনতে পেল, গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ইঁদুর। দেয়ালে যে একটা বড় গোবরের পোকা হাঁটছে, তা-ও তার কানে চুকল। বাইরে ঘোরাফেরা করছে একটা শজারু।

আস্তে আস্তে ঝুলে পড়ল কানটা। তারমানে আর কোন শব্দই শনত্বে না।

হঠাতেই খাড়া হয়ে গেল আবার কান। মুহূর্ত পরে দ্বিতীয় কানটাও। অন্তু একটা শব্দ ভেসে আসছে। বাড়ছে শব্দটা...বাড়ছে...আরও বাড়ছে...

জেগে গেল সে। কান খাড়া করে শুনতে শুনতে পা দিয়ে খোঁচা দিল মুসার গায়ে। জাগানোর জন্যে। ঘুমের মধ্যে বিরক্ত হয়ে থাবা দিয়ে পা-টা সরিয়ে দিল মুসা। কিন্তু দুই সেকেণ্ড পরই জেগে যেতে হলো।

ভয়াবহ শব্দ! বাতের নীরবতাকে ঢিরে, কেটে ফালাফালা করে দিয়ে যেন ছুটে আসছে কানের পর্দায় আঘাত হানার জন্যে। তৌঙ্গ, তৌর সেই শব্দ একবার বাড়ছে, একবার কমছে। ভীষণ যন্ত্রণায় যেন ছটফট করছে কোন অজানা জন্তু, আর্তনাদ করছে, গোঙাছে।

‘কিশোর! রবিন! জলন্দি ওঠো!’ হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন মুসার বুকের

ভেতর, পাগল হয়ে উঠেছে হংপিণ্টা ।

জেগে গেছে অন্য দুজনও । উঠে বসল । ওনতে লাগল সেই আওয়াজ । কিসের চিন্কার বুরাতে পারছে না ।

থামল চিন্কার । কয়েক সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে আবার শুর হলো ।

চিতার গায়ে হাত পড়ল মুসার । ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে কুকুরটাৰ ।

লাফিয়ে উঠে জানালার দিকে দৌড় দিল কিশোৱ ।

‘দেখে যাও, দেখে যাও !’ চিন্কার করে বলল সে ।

মুসা আৱ রবিনও ছুটে এল জানালার কাছে । গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ কুকুরটা ।

এক বিচ্ছি দৃশ্য চোখে পড়ল গোয়েন্দাদেৱ ।

এখানে ওখানে জলছে নীল ও সবুজ আলো । একবাৱ মলিন হচ্ছে, একবাৱ উজ্জল । সাদা গোল আৱেকটা আলো ভাসছে ওঙ্গলোৱ মাঝখানে, ধীৱে ধীৱে শৰ্ণ্যে উঠেছে ।

রবিনেৱ বাহ খামচে ধৰেছে মুসা । বিড়বিড় করে দোয়া-দুৰদ পড়ছে আৱ আ঳াহকে ডাকছে ।

মনে হচ্ছে এদিকেই আসছে আলোটা । ককিয়ে উঠল মুসা, ‘আলো, দোহাই তোৱ, এদিকে আসিস না, ভাই ! ও কিশোৱ, কিসেৱ আলো ? চিন্কার করে কেন ?’

‘দেখে আসি, কিসেৱ,’ জানালার কাছ থেকে সবে গেল কিশোৱ । ‘চিতা, আয় তো আমাৱ সঙ্গে ।’

পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল মুসা, ‘কিশোৱ, দোহাই তোমাৱ, যেয়ো না ! মেঠো ভৃতগুলো খুব শয়তান হয়, শুনেছি ...’

কিন্তু শোনাৱ জন্যে বসে নেই কিশোৱ, বেরিয়ে গেছে ।

থেমে গেল চিন্কার । মিলিয়ে গেল শব্দেৱ রেশ ।

কয়েক মিনিট পৰ কিশোৱেৱ জুতোৱ শব্দ কানে এল । ফিরে এসেছে ।

ঘৰে ঢুকল সে ।

‘কি দেখেন ?’ একসঙ্গে জানতে চাইল মুসা আৱ রবিন ।

‘কিছুই না,’ জবাৱ দিল কিশোৱ । ‘অন্ধকাৱে দেখা যায় না । সকালে জানা যাবে ।’

এগাৱো

অন্ধকাৱে বসে বসে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা কৰতে লাগল তিনজনে ।

মুসা বলল, ‘আৱ আমি এখানে নেই । কালই বাড়ি চলে যাব ।’

‘এৱকম একটা রহস্যৰ কিনাৱা না কৰেই ?’ কিশোৱ জানাল, ‘ওখানে গিয়ে অস্থিৱ হয়ে উঠল কুকুরটা, চেঁচামেচি, ছোটাছুটি...অন্ধকাৱে যতটা সত্ত্ব আমিও দেখাৰ চেষ্টা কৰেছি । কিছুই চোখে পড়ল না ।’

‘আলোওগুলোৱ কাছে গিয়েছিলো ?’ জিজেস কৰল রবিন ।

‘গিয়েছি। কিন্তু অনেক ওপরে ছিল। ধরাছোয়ার বাইরে। কিসের আলো বুঝতে পারিনি।’

‘মানুষেই যদি করবে, কেন বুঝলে না?’ মুসার প্রশ্ন। ‘আর তুমি নাহয় বোঝোনি, চিতার তো বোঝার কথা ছিল। মানুষ হলে কুকুরের চোখ এড়তে পারত না।’

নিজের নাম উনেই বোধহয় মন্দু ‘ইউ’ করে উঠল কুকুরটা।

‘পারুক আর না পারুক,’ জোর গলায় বলল কিশোর, ‘আন্দের রহস্য আমি কাল ভেদ করবই। করেছে মানুষেই। এবং কেন করেছে সেটা ও বুঝতে পারছি।’

‘কেন করেছে?’

‘আমাদের এখান থেকে তাড়ানোর জন্যে। যাতে এসে এখানে ভাল করে খুজতে পারে। আমরা থাকাতে ওদের অসুবিধে হচ্ছে।’

‘হ্যাঁ, এইটা হতে পারে,’ একমত হলো রবিন। ‘তবে অবাকটা লাগছে, চিতা ওদের দেখল না কেন?’

‘সে কালই বোঝা যাবে।’

‘যদি না যায়?’ মুসা বলল, ‘যদি কিছু পাওয়া না যায়?... তোমরা যাও আর না যাও, আমি বাবা আর এর মধ্যে নেই। সোজা বাড়িতে। ভূতের সঙ্গে আরেকটা বাত কাটাতে আমি রাজি না। স্মরণ হলে এখনই পালাতাম।’

‘ঠিক আছে, কাল পর্যন্ত দেখি। যদি কিছু বুঝতে না পারি, তখন ভাবব কি করা যায়। বাত এখনও অনেক। বসে থেকে লাভ নেই। শুয়ে পড়া যাক।’

শুয়ে পড়ল বটে, কিন্তু উত্তেজিত মন নিয়ে ঘুম আর আসতে চাইল না। কান খাড়া করে রেখেছে টিনজনেই। কিন্তু আর শোনা গেল না অন্তুত চিৎকার।

ঘুমাতে ঘুমাতে অনেক দেরি হলো, তাই ভাঙতেও দেরি হলো।

সবার আগে জাগল কিশোর। সিলিঙ্গের দিকে তাকিয়ে প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। তারপর মনে পড়ল, ভাঙা পুরানো কটেজে।

কনুইয়ের ওঁতো দিয়ে মুসাকে জাগাল সে।

হাই তুল মুসা। হাত-পা টান্টান করে আড়মোড়া ভাঙল। বলল, ‘ইস, কি ডয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিল রাতে। অতটো ভয় পেয়েছিলাম ভাবতেই অবাক লাগছে এখন। কেমন স্বাস্থ্ব লাগছে, না?’

‘না। আমি এখনও একই কথা বলব, ভয় দেখিয়ে কেউ আমাদের তাড়ানোর চেষ্টা করছে। ওদের কাজে বাধা হয়ে আছি আমরা।’

রবিনও জেগেছে। বলল, ‘তাহলে চলো তদন্ত শুরু করি।’

কিঞ্চির বলল, ‘অত তাড়াহংড়ো নেই আমাদের। ধীরেসুস্থে করব। শরীরটা একেবারে জমে আছে। আগে গোসল করব, নাস্তা, কবব, তারপর অন্য কাজ। চলো, ওঠো।’

বাইরে উঞ্জল রোদ। ডোবার দিকে চলল তিন গোয়েন্দা। খুশিমনে লেজ নাড়তে নাড়তে ওদের সঙ্গে চলল চিতা।

দূর থেকে দেখল ওরা, পানিতে মুখ ডুবিয়ে আরাম করে ভেসে রয়েছে সেই

আজব ছেলেটা ।

‘রনি,’ হাত তুলে দেখাল রবিন ।

‘এখন জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলে দেবে আরেক নাম,’ মুসা বলল । ‘ওর তো মতিগতির কোন ঠিক নেই ।’

পাড়ে এসে দাঁড়াল ওরা । দেখে হাত নাড়ল ছেলেটা ।

ডেকে জিজ্ঞেস করল মুসা, ‘তোমার নাম রনি তো?’

অবাক হলো রনি । ‘নিশ্চয় । নাম কি রোজ রোজ পাল্টায নাকি মানুষ? গোসল করতে এলে?’

‘হ্যাঁ ।’

পানিতে নামল তিন গোয়েন্দা । অনেকক্ষণ সাঁতার কেটে, কয়েক ডজন করে ঢুব দিয়ে, চোখ লাল করে তারপর উঠল পানি থেকে । শরীরের জড়তা একেবারে কেটে গেছে ।

পাড়ে উঠে বসল গা শুকানোর জন্যে ।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, ‘রনি, কাল রাতে অন্ধুত কিছু দেখেছ?’

মাথা নাড়ল রনি, ‘না । তবে একটা চিংকার শুনেছি । অনেকক্ষণ ধরে হয়েছে । কিসের বুঝাতে পারিনি । পাহাড়ী এলাকায় নানা রকম বিচিত্র শব্দ অবশ্য হয়, সেটা বাতাসের জন্যে ।’

ঝোপের আড়াল থেকে ছুটে বেরোল চিতা আর বার্ক । নিশ্চয় খরগোশ তাড়া করে চুকে পড়েছিল ।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কিশোর বলল, ‘আমরা শব্দও শুনেছি, আজব আলোও দেখেছি ।’

কি কি দেখেছে রনিকে জানাল গোয়েন্দারা ।

মাথা ঝাঁকিয়ে রনি বলল, ‘তাই তো, বাতাসে করেছে বলে তো মনে হয় না ।’

ব্যাপারটা নিয়ে আরও কয়েক মিনিট আলোচনা করল ওরা ।

অবশ্যে মুসা বলল, ‘আমি আর থাকতে পারছি না । খিদে । কিশোর, চলো ।’
‘চলো ।’

রনিকে শুভবাই জানিয়ে কটেজে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা ।

ফেরার পথে রবিন বলল, ‘আজ আবার ভাল লাগল ছেলেটাকে । হাসিখুশি, সুন্দর ব্যবহার । অথচ মাঝে মাঝে যেন কেমন হয়ে যায়! ’

‘একটা রোগের কথা ভাবছি আমি,’ কিশোর বলল । ‘এক ধরনের হিস্টিরিয়ায় তোগে এই রোগী । বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে চলে যায় । সেটা কয়েক মিনিটের জন্যেও হতে পারে, কয়েক ঘণ্টাও হতে পারে । এই সময়টাতে উল্টোপাল্টা আচরণ করে রোগী । অতি পরিচিত জনকেও অনেক সময় চিনতে পারে না । কেউ প্রলাপ বকে, কেউ ঝিম মেরে পড়ে থাকে, কেউ আবার স্বাভাবিক থাকে—অন্তত দেখলে মনে হয় স্বাভাবিক, কিন্তু আসলে স্বাভাবিক নয় । পরে সুস্থ হওয়ার পর আর মনে থাকে না সে-কথা । শৃঙ্খি থেকে চিরতরে মুছে যায় ওই সময়টা । ছেলেটার অন্ধুত আচরণের সঙ্গে ওই রোগের লক্ষণ অনেকখানিই মিলে যায় ।’

কথা বলতে বলতে কটেজে পৌছল ওরা। কাপড় বদলে নাস্তা থেয়ে নিয়ে আবার বেরোল। আলো দেখা গেছে যেখানে সেখানে চলে এল।

‘এখান থেকেই হয়েছে শব্দটা,’ কয়েকটা ওক গাছের একটা জটলার কাছে দাঁড়িয়ে বলল কিশোর। ‘আলোও এখানেই দেখা গেছে। অনেকটাই ওপরে,’ হাত তুলে দেখাল সে।

‘অবাক কাও, তাই না?’ মুসা বলল।

‘কিশোর,’ রবিন বলল, ‘এই গাছের ওপরে উঠে আলো দেখাতে পারে। শব্দও করা যেতে পারে। পারে না?’

গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। হাসল হঠাত। ‘ঠিক বলেছ, এটাই জবাব! ওখানেই উঠেছিল, অন্তত দুজন। সাইরেন জাতীয় কোন যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ করেছে। আলো দেখানোটাও সহজ। বাজি পুড়িয়ে ওরকম রঙিন আলো সৃষ্টি করা যায়। নীল আর সবুজ আলো তৈরি করেছে বাজি পুড়িয়ে। সাদা আলোটা স্বেফ ব্যাগ।’

‘মানে?’ বুঝতে পারল না মুসা।

‘সাদা ব্যাগের মধ্যে হালকা গ্যাস ভরে দিলেই সেটা উড়তে থাকবে। খোলা মুখটা থাকবে নিচের দিকে। মোম জুলে সেখানে আটকে দিলেই ব্যাগের ডেতরটা আলোকিত করে দেবে। দূর থেকে মনে হবে অচুত একটা সাদা আলো উড়ে যাচ্ছে।’

‘এবং অন্ধকার রাতে কেউ দেখলে তামে প্যাট খারাপ করে ফেলবে,’ হেসে বলল মুসা।

‘তুমি করেছিলে নাকি?’ হাসল রবিন।

মুসার হাসিটা চওড়া হলো। ‘করিনি। তবে আরেকটু হলেই করতাম।’

‘ভূতের আলোর জবাব তো পেলে?’ ভুক্ত নাচিয়ে বলল কিশোর।

‘পেলাম,’ নিচের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। ‘এটা কি?’ নিচু হয়ে একটুকরো রঙিন প্লাস্টিক কবিড়িয়ে নিল সে।

‘দেখি?’ জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখল কিশোর। শুকল। ‘ইঁ, আরও শিওর হয়ে গেলাম। দেখো, বাকুদের গন্ধ। বাজির খোসা এটা।’

রবিন আর মুসাও শুকে দেখল এক এক করে। চিতাও শুকতে চাইল। টুকরোটা মাটিতে ছুড়ে দিয়ে মুসা বলল, ‘শৌক, ভাল করে শৌক। এই গন্ধ লেগে থাকা লোক থুঁজবি এখন থেকে। যাকে পাবি তাকেই ধরবি।’

‘যা-ই বলো, বুঁজিটা ভালই করেছিল,’ রবিন বলল। ‘কিন্তু কাজে লাগল না।’

‘লাগবে,’ পলকে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে কিশোর। নিচের ঠাঁটে চিমটি কাটছে।

‘লাগবে মানে? ভয় তো পাইনি আমরা। এই কিশোর?’ ধাক্কা দিল মুসা।

‘উ?...কে বলল ভয় পাইনি?’

‘শুধু আমি পেয়েছি। রবিন কিছুটা পেয়েছে। তুমি একেবারেই পাওনি।’

‘পেয়েছি।’

‘কি যা তা বলছ?’

‘যা তা নয়। পেয়েছি। এবং পালাবও আমরা।’

‘দোহাই তোমার, কিশোর, সহজ করে বলো।’

‘সহজেই তো বলনাম। ভয়ে পালাব আমরা। বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে চলে যাব
কটেজ থেকে।’

হাঁ করে আছে মুসা।

রবিন বুঝে ফেলন। তুড়ি বাজিয়ে বলল, ‘বুঝেছি! ওদেরকে বোঝাব, আমরা
চলে গেছি। কিন্তু আসলে যাব না। লুকিয়ে ফিরে আসব। চোখ রাখব কটেজের
ওপর। এই তো?’

‘হ্যাঁ, আজ রাতেই করব সেটা।’

বারো

বিকেল বেলা মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে কটেজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

‘আমাদের ওপর চোখ রাখা হচ্ছে,’ মুসা বলল। ‘চলে যাচ্ছি দেখলে খুশি
হবে।’

‘কি করে রাখছে?’ চারপাশে তাকাল রবিন। ‘কেউ লুকিয়ে থাকলে কুকুরটা
টের পেয়ে যেত।’

‘অনেক দূরে রয়েছে ও। চিতার নাকের আওতার বাইরে।’

‘তাহলে দেখছে কি করে?’

‘দূরবীণ যন্ত্রটার নাম নিচয় শুনেছ তুমি। একটা পাহাড়ের ওপর বসে আছে
সে...’

তাকাতে গেল রবিন। তাড়াতাড়ি বাধা দিল কিশোর, ‘না না, তাকাবে না।
ওকে বুঝতে দেয়া চলবে না আমরা টের পেয়ে গেছি। মুসা, কি করে বুঝলে সে
আছে?’

‘কাচে আলো পড়ে ঝিক করে উঠছে। দূরবীণের চোখে।’

ক্যাম্পে এসে তাঁবু গুটিয়ে নিল ওরা। ঘোপের মধ্যে সাইকেলটা লুকিয়ে
রেখেছিল মুসা, বের করে ভারি মালপত্র তুলে নিতে লাগল ক্যারিয়ারে। খোলা
জায়গায় দাঁড়িয়ে করছে এসব, যাতে পাহাড়ে বসা লোকটা দেখতে পারে।

রবিন বলে উঠল হঠাৎ, ‘দেখো, একজন মহিলা আসছে।’

ফিরে তাকাল অন্য দুজন।

দ্রুতপায়ে হেঁটে আসছে মহিলা। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় গায়ের
অধিবাসী। শাল দিয়ে মাথা ঢাকা, হাতে একটা বুড়ি। চোখে শস্তা চশমা। মেকাপ-
টেকাপ নেই। চুলগুলো পেছন দিকে টেনে বাঁধা।

ছেলেদের দেখে এগিয়ে এল।

‘গুড আফটারনুন,’ দ্রুতকর্ষে বলল কিশোর। ‘আবহাওয়াটা খুব ভাল, তাই
না?’

‘খুব সুন্দর,’ মহিলা বলল। ‘ক্যাম্পিঙে বেরিয়েছ বুঝি? ভাল সময়ে বেরিয়েছ।’

‘বেরিয়েছিলাম। এখন চলে যাচ্ছি। ওদিকে একটা পোড়ো বাড়ি আছে না, পুরানো কটেজ, তাতে ঘুময়েছিলাম রাতে। বাপরে বাপ, থাকার জো নেই।’

‘কেন, ভূত দেখেছ বুঝি?’

‘কি যে দেখলাম কিছুই বুঝাতে পারলাম না।’

‘শুনেছি আমিও। ওই বাড়িতে নাকি রাতে অস্তুত সব কাও ঘটে। কখনও অবশ্য নিজের চোখে দেখিনি।’

‘আমরা দেখেছি। ভূতুড়ে ব্যাপার। নানা রকম আলো, চিৎকার, রাত দুপুরে তুফানের সময় জানালায় উকি দেয় মানুষের মৃথ...’ শিউরে উঠল কিশোর।

‘তাই নাকি? সাংগতিক ব্যাপার। তা যাচ্ছ কোথায়?’

‘বাড়িতে। রকি বীচ। চেনেন?’

‘চিনি। খুব সুন্দর জায়গা। আবহাওয়া কিন্তু ভালই ছিল। থেকে গেলে পারতে।’

‘মাথা খারাপ! আর একটা রাতও না। এমন ভূত জনমে দেখিনি।’

‘ভয় পেলে তো আর থাকা চলে না। এসব এলাকায় থাকতে সাহস দরকার। আচ্ছা, যাই, কাজ পড়ে আছে। গুড-বাই।’

তাড়াহড়া করে চলে গেল মহিলা।

‘মালপত্র গোছাও,’ নিচু গলায় বলল কিশোর। ‘পাহাড়ের দিকে তাকিয়ো না। এখনও আছে সে।’

‘কিশোর,’ মুসা জিজেস করল, ‘মহিলার সঙ্গে এভাবে কথা বললে কেন?’

‘কারণ সে ওদেরই চৰ। তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখোনি?’

‘মাথা নাড়ল মুসা, ‘না।’

‘গ্রামবাসীর অভিন্ন করেছে বটে, কিন্তু মোটেও গাঁয়ের লোক নয়।’

‘সন্দেহটা কেন হলো তোমার? সবই তো ঠিক আছে! মুখে মেকাপ নেই, মাথায় পুরানো শাল, কটেজটার ব্যাপারে সব জানে...’

‘মুসা, গাঁয়ের মহিলারা কখনও সোনার দাঁত লাগায় না। হাসার সময় খেয়াল করোনি তার সোনার দাঁত ছিল?’

‘করেছি,’ জবাব দিল রবিন।

‘পরচুলা পরে এসেছে, সেটা খেয়াল করেছ? তাড়াহড়ায় ঠিকমত পরতে পারেনি। কালো চুলের নিচে লালচে চুলের গোড়া দেখেছি আমি। ভালমত চেকে আসোনি।’

‘আরেকটা ব্যাপার!’ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে রবিন, ‘গাঁয়ের মহিলাদের মত করে কথা বলতে চেষ্টা করেছে। পারেনি। কখনও শুন্দি, কখনও অশুন্দি হয়ে গেছে। টানও অন্য রকম।’

‘আমি একটা গাধা!’ কপাল চাপড়াল মুসা। ‘এত কিছু খেয়াল করেছ তোমরা, অথচ আমি কিছু দেখিনি! ’

‘কাল রাতে যারা ভয় দেখাতে চেয়েছে আমাদের, মহিলা তাদের দলের লোক। আমাদের জিনিসপত্র গোছাতে দেখে জানতে এসেছে সত্যিই আমরা চলে

যাচ্ছি কিনা।'

'জানিয়ে তো দিয়েছ ভাল করেই,' হাসল মুসা। 'ওরা কি আর জানে, কার
পান্নায় পড়েছে।'

যাতে পড়ে না যায়, সে জন্যে দড়ি দিয়ে শক্ত করে ক্যারিয়ারে মালপত্র বাঁধা
হয়েছে। দড়ির শেষ টিটো দিয়ে বলল কিশোর। 'যাব কোথায় বলতে পারো?
কোথায় নুকাব?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল মুসা। চুটকি বাজাল, 'জানি। ঝর্নার বেশ খানিকটা
ভাটিতে বিশাল এক ঘোপ আছে। চুক্তিই ওর মধ্যে। রাইরেটা খুব ঘন, ভেতরে
খোলা, অনেকটা গুহার মত। ঘোপের গুহা বলতে পারো।'

'তাহলে ওখানেই যাব। চলো।'

পাহাড়ের দিকে তাকাল মুসা। তুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল দুই সেকেণ্ড।
বলল, 'চলে গেছে লোকটা। আমরা তো এখনও যাইনি!'

হাসল কিশোর। 'আর দরকার কি থাকার? মহিলা গিয়ে সব বলেছে। জেনেই
তো গেল, আমরা চলে যাচ্ছি। খুব একচোট হেসেছে ওরা।'

'এবার আমরা হাসব,' বলল রঞ্জিন।

কিছু মাল হাতে, কিছু পিঠে বাঁধা ব্যাকপ্যাকে, কিছু সাইকেলের ক্যারিয়ারে
নিয়ে রওনা হলো ওরা। ঝর্নার ভাটিতে সেই জায়গাটায় পৌছতে দেরি হলো না।
প্রয়োজন নেই, তবু আরেকবার পাহাড়ের দিকে তাকাল কিশোর, সাবধানের মার
নেই। এখান থেকে গাছপালার জন্যে দেখা যায় না চূড়াটা। নজর রাখার জন্যে
লোকটা যদি আবার ফিরেও আসে তাহলেও আর দেখতে পাবে না ওদের।

ঘোপটা খুব পছন্দ হলো কিশোরের। ভেতরটা সত্যিই সুন্দর। দুপুরে বাইরে
যখন কড়া রোদ, তখনও নিচয় এর ভেতরে ছায়া থাকে। খুব আরাম। নিচে বিছিয়ে
আছে ঝরা-পাতা। তার ওপর আর কিছু পাতা ছড়িয়ে নিলেই বিছানা হয়ে যায়।

এত ঘন, ঢোকাই কঠিন। এক দিকের ডালপাতা কিছু সরিয়ে সরু একটা
সূড়ঙ্গমত করে নেয়া হলো। প্রবেশ পথ। তিন গোয়েন্দা তুক্তে পারল, সমস্যা
হলো কুকুরটাকে নিয়ে। গলায় এত বড় কলার নিয়ে কিছুতেই তুক্তে পারল না।
কিন্তু ওকে বাইরে রাখাও উচিত না।

'কান্টা দেখো,' কিশোর বলল, 'ঘায়ের কি অবস্থা? তাহলে খুলে ফেলো
হার্ডবোর্ড।'

টিপেটুপে দেখল মুসা। রা-শব্দ করল না কুকুরটা। তারমানে তেমনি বাথা
পাচ্ছে না। 'মনে হয় ভালই।'

'খুলে ফেলো।'

জোড়ার সেলাইগুলো কেটে দিয়ে কলারটা খুলে ফেলল মুসা। খুলেই হা-হা
করে হাসতে লাগল। কুকুরটাকে বলল, 'কেমন লাগছে তোকে, জানিস? বড় করে
গোঁফ রেখে কামিয়ে ফেলার পর যেমন লাগে, বেড়ালের পাছার মত, তেমনি। হা-
হা-হা!'

কিশোর আর রবিনও হাসতে লাগল।

কিছুই না বুঝে ‘খট! খট!’ করে ডাক ছেড়ে দুবার কুকুরে-হাসি হাসল চিতা। এত জোরে লেজ নাড়ছে, ঝড় উঠেছে যেন শরীরের পেছনটায়, ভীষণভাবে আন্দোলিত হচ্ছে।

তেরো

বাইরে, আঁধার নামছে। ঘোপের তেতর তো এখনই ঘৃটমুটে অঙ্ককার। মোম জ্বালানো নিরাপদ না এখানে, আগুন লেগে যেতে পারে। টর্চ আছে তিনজনেরই, কিন্তু ব্যাটারি বাঁচানোর জন্যে কেবল একটা টর্চ জ্বালানো হয়েছে।

খেতে বসেছে ওরা। সঙ্গে করে আনা খাবার প্রায় শেষ। টেনেটুনে আর একদিন চলতে পারে।

তবে খাবার নিয়ে ভাবনা নেই ওদের। শেষ হলে আবার গিয়ে নিয়ে আসতে পারবে।

ঝাওয়া শেষ হলো।

মুসা জিজেস করল, ‘এখনই যাব?’

‘আরও কিছুক্ষণ পর,’ জবাব দিল কিশোর। ‘এত তাড়াতাড়ি বোধহয় আসবে না ওরা। রাত হলেই আসবে। সাধারণী লোক।’

‘তাহলে আগেই গিয়ে বসে থাকা দরকার।’

রবিন বলল, ‘কুকুরটাকে নিয়ে সমস্যা হবে। যদি চুপ না থাকে, লোকগুলোকে দেখলেই ঢেঁচানো শুরু করে, এত কষ্ট তাহলে সব মাটি।’

‘ভাল কথা মনে করেছ,’ কিশোর বলল, ‘ওকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চলবে না।’

‘কিন্তু একাও তো থাকতে চাইবে না,’ মুসা বলল। ‘আমরা বেরোলেই পিছু নেবে। বেধে রেখে যাওয়াও অমানবিক হয়ে যাবে।’

‘এবং তখনও ঢেঁচাবে। মুসা, এক কাজ করো, তুমিও থেকে যাও। যাব তো দেখতে, চোর ধরতে নয়, বেশি লোক দরকার নেই। বেশি গেলে বরং ধরা পড়ে যাওয়ার সন্তানানা।’

‘আমি থাকব।’ থাকার ইচ্ছে নেই মুসার।

‘আর কোন উপায় তো দেখছি না।’

অনিষ্ট সত্রেও রাজি হতে হলো মুসাকে।

বাসিকতা করল রবিন, ‘কেন, ভালই তো হলো। ভুতুড়ে বাড়িতেও যেতে হলো না, ভূতের ভয়ও করতে হলো না। এখানেই শান্তি।’

‘ভয় এখানেও আছে,’ কিশোর বলল।

চমকে গেল মুসা, ‘মানে?’

‘না না, ভূতের কথা বলছি না। বাস্তব জিনিস। কালো কালো ঝঁয়াপোকা, লোম লাগলে চুলকাতে চুলকাতে মরবে। পায়ে এসে বসতে পারে শজারু, কাঁটা ফুটিয়ে দিতে পারে। তবে বেশি ভয় হলো সাপের। যদি কোন র্যাট্ল উত্তাপ খুজতে এসে তোমার গা ঘেঁষে উয়ে পড়ে...’

‘হয়েছে, হয়েছে,’ হাত নাড়ল মুসা, ‘এসবের পরোয়া আমি করি না। যেতে হবে, যাও, আমি একলা থাকতে পারব।’

হামাঙ্গড়ি দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর ও রবিন। পেছন পেছন কুকুরটাও রওনা হলো, ডেকে তাকে ফেরাল মুসা।

বাইরে ভৌমণ অন্ধকার। তবু টর্চ জ্বাল না দুই গোয়েন্দা। কোনমতেই পড়তে চায় না কারও চোখে। চেনা পথ। হাটতে খুব একটা অসুবিধে হলো না।

কোথায় নুকাবে আগেই ঠিক করে রেখেছে। ওপরতলায়। যতটা মনে হয়, লোকগুলো খুঁজবে নিচতলায়, ওপরে উঠবে না। সুতরাং ওখানেই ওরা নিরাপদ।

পা টিপে টিপে কটেজে চুকল দৃঢ়নে। কোন সাড়াশব্দ নেই। লোকগুলো আসেনি এখনও। নিঃশব্দে উঠে এল দোতলায়। একটা ভাঙা দেয়ালের গা ঘেষে পড়ে আছে কতগুলো ইট, দেয়ালটা থেকেই খুলে পড়ে স্থপ হয়ে আছে। তার ওপর বসল ওরা। এবার অপেক্ষার পালা। কথা বলার জো নেই। কে কোনখান থেকে ওনে ফেলে। কাজেই একদম চুপ।

কাটছে সময়, খুব ধীরে। উফ কোমল ম্যু বাতাস এসে লাগছে গায়ে। সব কিছু নীরব, সব শ্বির, কেবল রোজ-ব্যাস্তলারের পাতাগুলো ছাড়া। বাতাসে সড়সড় করছে ওগুলো।

পৌনে এক ঘটা বসে থাকার পর রবিনের গায়ে কনুইয়ের উঁতো দিল কিশোর, ফিসফিস করে বলল, ‘আসছে!'

ভাঙা দেয়ালের ফোকর দিয়ে বাইরে তাকাল রবিন। দূরে টর্চের আলো চোখে পড়ল। অন্ধকারের কালো চাদরে যেনে একটা সাদা ফুল। এগিয়ে আসতে লাগল ফুলটা। নাচছে হাঁটার তালে তালে।

আরও কাছে এল টর্চের আলো। এখন আর একটা নয়, তিনটে।

কটেজে এসে চুকল লোকগুলো। তিনজন ছড়িয়ে পড়ল তিনদিকে।

‘ওপরে না এলেই হয়,’ রবিন বলল।

‘বুলা যায় না। আসতেও পারে। চলো, চিমনিটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ি।’

নিঃশব্দে উঠে সরে যেতে লাগল দৃঢ়নে। খুব সাবধান। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে রোজ-ব্যাস্তলার। চিমনির কাছেও আছে। ওগুলোতে লাগলে শব্দ তো হবেই, কাঁটা ফোটারও তয়। ওঠার সময়ই একবার হাতের আঙুলে ফুটেছে রবিনের, রক্ত বন্ধ করার জন্যে আঙুল চুম্বতে হয়েছে তাকে।

চিমনি মানে চিমনির অবশিষ্ট। ভাঙা একটা ফানেল। তবে বাকি যা আছে এখনও, অনেক বড়। তারাজুলা আকাশের পটভূমিতে কালো একটা ছায়া। ওটার গা ঘেষে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। এখন থেকে সিডিটা বেশ দূরে।

‘বললাম না আসবে! ভয় পেয়ে গেছে রবিন। বুক কাঁপছে। ‘ইস, একটা কাঁটা যদি ফুটত...’

‘চুপ!'

‘উহ! করে উঠল একটা কষ্ট। সত্যিই কাঁটা ফুটেছে লোকটার গায়ে। চেঁচিয়ে বলল, ‘এই যত্না যে কেন লাগিয়েছিল! যত্নসব!'

টର୍ ଜୁଲେ ଉଠିଲ ସିଡ଼ିତେ । କାଂଟା କୋଟାତେଇ ବୋଧହୟ, ମତର୍କତା ନଷ୍ଟ ହେଁ ଗେଲ ଲୋକଟାର । ଓପରତାର ସରଙ୍ଗଲୋତେ ଏକବାର ଆଲୋ ଫେଲେଇ ଫିରେ ଚଲନ । ଚିମନିର କାହେ ଏଳ ନା ।

ସିଡ଼ିର ନିଚେ ତାର କଥା ଶୋନା ଗେଲ, 'କେଉ ନେଇ । ଛେଲେଗୁଲୋ ସତ୍ୟିଇ ଚଲେ ଗୋଛେ ।'

ହାଁପ ଛାଡ଼ିଲ ଦୁଇ ଗୋଫେନ୍ଦା । ଯାକ, ବାଁଚା ଗେଲ ! ଆପାତତ ଏଖାନେ ଆର କାରା ଆସାର ସଭାବନା ନେଇ ।

ନିଚେ କଥା ବଲିଛେ ତିନଙ୍ଗନ ମାନୁଷ, ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନ ମହିଳା । କଷ୍ଟଟା ଚିନତେ ପାରିଲ ଦୁଇନେଇ, ବିକେଳେ ଓ-ଇ ଏମେହିଲ ଓଦେର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲିତେ ।

'ନିକ, କୋନଖାନ ଥେକେ ଶୁରୁ କରବ ?' ଜିଜ୍ଞେସ କରିଲ କାଂଟା ଫୁଟେଛେ ଯାର, ସେଇ ଲୋକଟା ।

'ଏଇ ନାଓ, ନକଣା,' ଜବାବ ଦିଲ ନିକ । ଗଲାର ସ୍ଵର ଅନ୍ଧୁତ ଘଡ଼ଘଡ଼େ, ଯେବେ କଷ୍ଟନାଲୀ ଚେପେ ଧରା ହେଁଥେ ।

ଚିମନିର କାହୁ ଥେକେ ସରେ ଏଲ କିଶୋର । ଆଣ୍ଟେ କରେ ଏସେ ଉକି ଦିଲ ସିଡ଼ିର ମାଥାରେ ଦାଁଡିଯି ।

ଦୁଟୋ ଲକ୍ଷନ ଜ୍ଞାଲାନୋ ହଲେ । ଏକଟା କାଗଜ ମାଟିତେ ବିଛିଯେ ସେଟାର ଓପର ଝୁକେ ପଡ଼େଛେ ତିନଙ୍ଗନେ । ଗଭିର ମନୋଯୋଗେ ଦେଖିଛେ ।

'ଏକଟା ଜିନିସ ବୁଝିତେ ପାରାଇଛି, ସାଦା ପାଥରେର ନିଚେ ଖୁଜିତେ ହେବେ ଆମାଦେର । ପାଥରଟାର ସାଇଜି ଜାନି । କିନ୍ତୁ କୋନ ଜାଇଗାଯ ଆହେ ଓଟା, ବଲା ହୁଣି । କମ ଜାଇଗାଯ ତୋ ଆର ଦେଖିଲାମ ନା । ମାଟି ଖୁଡ଼ିଛେ ଛେଲେଟା ଯେ ଜାଇଗାଯ, ଓରାନେଓ ବାଦ ନେଇ...ତାହଲେ ?'

ରବିନ୍‌ଓ ଏସେ ଦାଁଡିଯିଛେ କିଶୋରର ପାଶେ । ଆଣ୍ଟେ ଖୋଚା ଦିଲ କିଶୋରର ପାଶେ । ଇହିତେ ଯେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ଚାଇଲ, ସାଦା ପାଥରେର ନିଚେ କି ଜିନିସ ଖୁଜିଛେ ଓରା ?

ଆଁଚ କରିବାରେ ପାରିଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେଇ । ଘଡ଼ଘଡ଼େ-କଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାଏ ନିକ ବଲି, 'ଦରକାର ହଲେ ଏଇ ଏଲାକାର ସମସ୍ତ ସୌଦା ପାଥରେର ତଳାଯ ଖୁଜିବ । ଓଟା ନା ନିଯିବେ ଯାହିଁ ନା ଆମି । ତାର ଜନ୍ୟେ ଏଇ ବାଡିଟା ଯଦି ଧିସିଯେ ଦିତେ ହୁଏ, ତା-ଓ ଦେବ । ନଇଲେ ଆମାଦେର ଛାଡ଼ିବେ ନା ବସ ।'

'ଯତ ନଷ୍ଟେର ମୂଳ ଓଇ ବୋଥାମଟା । ସେ କରିଲ ଚୁରି, ଆମାଦେର ଫେଲିଲ ବିପଦେ । ଆର ଫେଲିଲ ଯଥନ, ଭାଲ କରେ ଲିଖେ ଦେ...'

'କି କରେ ଦେବେ ? ମାଥାଇ ତୋ ଖାରାପ । ହାତଓ ଯେ ପରିମାଣ କାପେ, ଦେଖିଲେ ବୁଝାଇତେ ।'

'ବୁଝାଇବାର ଦୋଷ । ଜେଲ ଥେକେ ପାଲାତେ ଗେଲ କେନ ? ଗେଲ ବଲେଇ ମାଥାଯ ଶୁଣି । ପାଗଲଓ ହଲୋ । ଆର କଦିନ ପରେ ତୋ ଏମନିତିଇ ଛାଡ଼ା ପେଯେ ଯେତ ।'

'ବେଚାରାର ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟ । ମାଥାଯ ଭୂତ ଚାପେ ବଲେ ଏକଟା କଥା ଆହେ ନା । ତାର ହେଁହେଲି ସେଇ ଅବସ୍ଥା...ଯାକଗେ, ଆମାଦେର ଏଥନ ଓସବ ଡେବେ ଲାଭ ନେଇ । ଜିନିସଟା ବେବେ କରିବାରେ ହେବେ, ନଇଲେ ଆମାଦେର କପାଳେ ଓ ଦୁଃଖ ଆହେ ।'

'କିନ୍ତୁ କି କରବ, ବଲୋ ? ମାନେଇ ତୋ ବୁଝି ନା । ଏଇ ଶବ୍ଦଟାର ମାନେ କି ? ଏଇ ଯେ

ডল্লিউ-এ-ডি-ই-আর?’

‘ওয়াটার? দূর, এর কোন মানে নেই। তবে মাঝের ডি-টা বদলে টি করে নিলেই মানে হয়ে যায়। ওয়াটার! এখানে ওয়াটার, অর্থাৎ পানি কোথায় আছে? সাদা পাথরের নিচে? একমাত্র রান্নাঘরে, হ্যাণ্ডপাম্পটার নিচে। কুয়োটাতে।’

কিশোরের হাত ঝামচে ধরল রাবিন।

চোদ্দ

ঘোঁ-ঘোঁ, ফোঁস-ফোঁস, নানা রকম শব্দ হচ্ছে নিচতলায়। বিশাল পাথর তোলার পরিণামে হাঁপাছে লোকগুলো।

‘জাহানামে যাক! পাথর না পাহাড়! বলল ঘড়ঘড়ে কষ্ট। ‘জেরি, দেখি শাবলটা আমার হাতে দাও। তুমি তো কিছুই করছ না।’

আরও কয়েক মিনিটের অবিরাম চেষ্টার পর পাথরটা তোলা সম্ভব হলো। দড়াম করে কাত হয়ে পড়ল একপাশে। কেঁপে উঠল বাড়িটা, মনে হলো ধসে পড়বে।

উজেন্দায় কাঁপছে দুই গোয়েন্দা। চোরেরা কি পেয়েছে দেখার জন্যে অস্তির। কিন্তু তা তো আর পারবে না। ওদের কথা শুনেই বুঝতে হবে জিনিসটা কি?

মহিলা বলে উঠল, ‘এ-কি! এখনও অনেক পানি!’

টর্চের আলোয় তিনজনেই দেখল কিছুক্ষণ। তারপর হতাশ কষ্টে জেরি বলল, ‘নাহ, এটা সুড়ঙ্গপথ হতেই পারে না। এখান দিয়ে কেউ কোথাও যেতে পারবে না। অতি সাধারণ একটা কুয়া।’

‘কি যে বিপদে পড়লাম!’ মহাবিরক্ত হয়ে বলল মহিলা। ‘এটা নকশা, না ধাঁধা! ওর বাপের মাথা লিখেছে, চোরের বাচ্চা চোর! যেটা হজম করতে পারবি না, গেলি কেন চুরি করতে!'

‘এই মাপের সাদা পাথর এখানে যা আছে সবগুলো উল্টে দেখতে হবে,’ ঘড়ঘড়ে গলায় বলল নিক।

‘সেটা কি সম্ভব?’ জেরি বলল, ‘তেমন এক উজ্জন পাথর আছে এখানে।’

‘সম্ভব করতে হবে, মরতে না চাইলে। আমরা পাইনি, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না বস। ভাববে, পেয়েও লুকিয়ে রেখেছি, বেশি টাকার জন্যে। মুখ খোলানোর জন্যে মারতেই মেরে ফেলবে তখন।’

‘ইস,’ মহিলা বলল, ‘ভালই ছিলাম, কেন যে এত টাকার লোভ করতে গেলাম।’

‘ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না,’ বলল জেরি।

খেঁকিয়ে উঠল নিক, ‘রাখো তোমার ওসব নীতিকথা। ভালাগে না। এসো, হাত লাগাও। এই পাথরটাও এই মাপের।’

একের পর এক পাথর উল্টে চলল চোরেরা। ওদের মত দৈহিক কষ্ট না হলেও উজেন্দা কম হচ্ছে না গোয়েন্দাদের। স্নায় টান টান করে অপেক্ষা করছে ওরা, কখন শুনবে উল্লাস-তরা চিক্কার।

কিন্তু সেই চিকার আর শুনল না । বার বার কেবল হতাশার কথা ।

একটা ব্যাপারে ভুল করেছে জেরি । তেমন পাথর এক ডজন নয়, মাত্র চারটা ।
সবগুলোর নিচেই খুঁজে দেখা হলো । কিন্তু পেল না ওদের আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটা ।

শেষ পাথরটা তোলার পর এমন জোরে চিকার করল জেরি, গোয়েন্দারা মনে
করল পেয়ে গেছে । কি পেয়েছে দেখার জন্যে সরতে গিয়ে একটা লতায় পা বাধিয়ে
শব্দ করে ফেলল কিশোর ।

কানে গেল এক ঢোরের । চেঁচিয়ে উঠল, ‘কে? কে শব্দ করে?’

শব্দ হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা । পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর মহিলা বলল, ‘হবে ছুঁচোটুচো কিছু । কিংবা ভুল
ওনেছ । শোনারই কথা । যা পরিষম হয়েছে!’

স্বত্ত্বির নিঃশ্বাস ফেলল গোয়েন্দারা । বড় বাঁচা বেঁচেছে ।

‘এখানে নেই ওটা,’ নিক বলল । ‘ওই ক্যাম্পের কাছাটাতেই গিয়ে আরও^১
ভালমত খুঁজতে হবে । ওখানেই কোথাও আছে ।’

‘কিন্তু ওখানে আর কোথায় খুঁজব? কোন জাফগা তো বাকি রাখিনি ।’

‘আছে, বাকি আছে । ট্রক্সের কাছের গর্তটা, যেটাতে কিছু নেই তবে নামিনি
আমরা...’

‘কিন্তু ছেলেটা যে সরে না,’ জেরি বলল । ‘ওই গর্তে খুঁজতে হলে অনেক সময়
দরকার । আটঘাট বেঁধে যেতে হবে । তাতে সন্দেহ হতে পারে ওর । গিয়ে
লোকজনকে বলে দিতে পারে ।’

‘ওকে সরাতে হবে । সোজা আঙুলে না হলে, আঙুল বাঁকা করে ।’

অন্ধকারে ঝরুটি করল কিশোর । রনির বিপদ বুঝতে পারছে । পারছে
রবিনও । কিশোরের হাত চেপে ধরল ।

‘চলো,’ বিরক্ত কষ্টে বলল মহিলা, ‘এই ভূতের বাড়ি থেকে বেরোই । শধু শধু
কষ্ট করলাম । নিক, আজ আর কোথাও খুঁজতে পারব না, বুঝলে । কাল ।’

বেরিয়ে গেল লোকগুলো ।

ভাঙা দেয়ালের ফোকুর দিয়ে তাকিয়ে রইল দুই গোয়েন্দা ।

ধীরে ধীরে মাঠ ধরে গিয়ে ঘোপের ওপাশে হারিয়ে গেল টর্চের আলো । তার
পরেও আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ওরা ।

‘আর থেকে কি করব?’ রবিন বলল ।

‘হ্যাঁ, চলো আমরাও যাই । তোরবেলা গিয়ে ইঁশিয়ার করে দিতে হবে
কুনিকে ।’

সিডি বেয়ে নামতে গিয়ে আরেকবার লতায় পা জড়াল রবিন । পড়ে যাচ্ছিল,
কিশোরকে ধরে সামলাতে গিয়ে তাকেও ফেলে দিচ্ছিল আরেকটু হলে ।

‘কি হলো?’ উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল কিশোর ।

‘কি আর! হতচাড়া রোজ-রাস্তারের কাটা । এহ, গোড়ালিটাই বুঝি গেল! ’

টর্চ জুলে দেখা গেল, কাঁটার খোচায় কয়েক জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত
বেরোচ্ছে । সাংঘাতিক কিছু না ।

‘জ্বর্ণ্য কাটা!’ কিশোর বলল । ‘দেখেওনে পা ফেলতে পারো না ।’

কটেজের বাইরে বেরোল ওরা। হাঁটতে হাঁটতে রবিন বলল, ‘কি জিনিস এখনও কিন্তু জানলাম না আমরা। শুধু জানলাম, একটা বিশেষ মাপের পাথরের নিচে আছে ওটা এবং সেখানে পানি আছে। পাথরটার মাপ পেলে হত, দিনের বেলা আমরাও খুজতে পারতাম।’

‘মাপের আর অসুবিধে কি? অনেকগুলো পাথর উল্টেছে ওরা। যে কোন একটা মেপে নিলেই হয়।’

‘তাই তো! এই সহজ কথাটা মাথায় ঢুকল না! মাঝে মাঝে এমন বোকা হয়ে যায় না মানুষ...’

বোপের কাছাকাছি হতেই ভেতর থেকে চিতার ডাক শোনা গেল। খানিক পরেই সৃঙ্গস্মৃথে উকি দিল মুসার মাথা। ‘কে? কিশোর, তোমরা?’

‘হ্যাঁ।’

‘এলে তাহলে। আমার তো মনে হচ্ছিল, কত শত বছর কেটে গেছে।...তো, কি হলো? এসেছিল ওরা? কিছু পেয়েছে?’

‘ভেতরে চলো, বলছি।’

বোপের ভেতরে চুকে মুসাকে সব কথা জানাল কিশোর ও রবিন। রনি যে বিপদে পড়তে যাচ্ছে, একথা ও বলল।

মুসা বলল, ‘তাহলে তো ভাবি মশ্কিল। কি করা যায়?’

কিশোর বলল। ‘ভোরে উঠেই দৌড় দেব। সাবধান করে দেব ওকে। অনেক রাত হয়েছে। এসো, শুয়ে পড়ি। নইলে সকাল সকাল উঠতে পারব না।’

কয়েক ঘণ্টা পর হঠাৎ চাপা গরমার শুরু করল চিতা।

ঘূম ভেঙ্গে গেল মুসার। ঘূম-অভিভিত গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘অ্যাই, কি দেখলি আবার?’

গরগর করেই চলল কুকুরটা।

কিশোর আর রবিনও জেগে গেছে।

‘কি দেখেছে?’ কান পেতে শব্দ শোনার চেষ্টা করছে রবিন। ‘আমি তো কিছুই শুনছি না।’

‘তোমার কান কি আর ওর মত?’

‘কিন্তু দেখল কি? এই মুসা, দেখবে নাকি?’

‘এই অস্ফুকারে আর কি দেখব? হবে হয়তো ছঁচো, বেজি, কিংবা শজারু।’

কিন্তু ভুল করেছে মুসা, ঘন বোপের ভেতর গাঢ় অস্ফুকার বটে, বাইরে তোর হচ্ছে। ফর্সা হয়ে গেছে পুবের আকাশ।

অবশ্যে গরগর থামাল চিতা। ছড়ানো দুই থাবার মাঝে ঘুতনি গুঁজে দিল। যে জিনিসটা উন্নেজিত করেছিল তাকে, সেটা চলে গেছে।

আবার ঘূমিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

বোপের ভেতরের অস্ফুকার কাটল।

এবারও মুসাই আগে জাগল। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, ‘উফ, মাটিতে শয়ে গা একেবারে শক্ত হয়ে গেছে। আরও পুরু করে পাতা বিছানো দরকার।

ছিল।'

চোখ মেলল কিশোর। হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়েই লাফিয়ে উঠে বসল, 'সর্বনাশ! আটটা বাজে! রবিন, ওঠো, ওঠো!'

তাড়াহড়ো করে ঝোপ খেকে বেরিয়ে দৌড় দিল ওরা।

ক্যাস্পের কাছাকাছি আসতে ফেঁপানোর শব্দ শুনতে পেল।

অবাক হয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল ওরা। কাঁদে কে?

ট্রেক্সের মধ্যে মুখ গুঁজে পঢ়ে ধাকতে দেখা গেল রনিকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আশ্র্য! কি হয়েছে ওর? এমন করছে কেন? কি

ট্পাট্প ট্রেক্সে লাফিয়ে নামল তিন গোয়েন্দা।

রনির পিঠে হাত রেখে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'রনি, কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?'

'রনিকে ওরা নিয়ে গেছে!' বলল ছেলেটা। 'আর ফিরবে না সে, আমি জানি! ওকে ওরা মেরে ফেলবে!' হাউমাউ করে কেদে উঠল সে।

আরও অবাক হয়ে পরম্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

কিশোর বলল, 'নিয়ে গেছে মানে? রনি তো তুমিই!'

'না, আমি না! আমি ডনি!'

ভয় পেল কিশোর, পুরোপুরিই পাগল হয়ে গেছে ছেলেটা। মণি রোগীর মত ছটফট করছে। আলতো করে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে কোমল গলায় বলল, 'তোমার শরীর খুব খারাপ। ডেব না, আমরা তোমাকে ডাকারের কাছে নিয়ে যাব।'

স্প্রিঙ্গের মত লাফিয়ে উঠে বসল ছেলেটা। চেঁচিয়ে বলল, 'আমি রনি নই, আমি ডনি! ডনি! আমরা যমজ!'

পুরো রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল তিন গোয়েন্দার কাছে। দুইবার দুইরকম আচরণ করেছে কেন 'ছেলেটা' তার সব জবাব পেয়ে গেল। পুরো এক মিনিট লাগল ওদের ধাতব্দু হতে।

বিড়বিড় করে বলল কিশোর, 'আমি একটা বলদ! খালি রোগের কথাই ভাবলাম, সহজ কথাটা মনে এল না...' ডনির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা ডেবেছি তোমরা একজন!'

'না, দুজন,' চোখ মুছতে মুছতে বলল ডনি। 'এখানে এসে ঝগড়া করেছিলাম। আর যমজদের ঝগড়া যে কি জিনিস না দেখলে বুঝবে না। দু-চোখে দেখতে পারতাম না একজন আরেকজনকে। কেউ কারও ছায়া মাড়াতাম না। একসঙ্গে খাওয়া, বসা, ঘুম, কোনটাই হত না। ভীষণ শক্তি। এমনই অবস্থা হলো, ভাই যে আরেকজন আছে তা-ও মনে করতে চাইতাম না। কারও কাছে ন্লা তো দূরের কথা!'

'এইজনেই আমরা কিছু বুঝতে পারিনি,' মুসা বলল।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'রনির কি হয়েছে খুলে বলো তো?'

'যমজদের ঝগড়া যেমন বেশি হয়, ভাবও হয় বেশি। কাল রাতে আমার সঙ্গে মিটমাট করতে গিয়েছিল রনি। কিন্তু আমি পাওয়াই দিলাম না। এক ঘুসি মেরে

আলোর সঙ্গে

ফেলে দিয়ে আরেক দিক্কে চলে গোলাম। তারপর মন নরম হয়ে গেল। ডোরবেলা উঠেই চলে এলাম তার সঙ্গে দেখা করতে... তারপর...' আবার ফুপিয়ে উঠল সে। 'হ্যাঁ, তারপর কি হলো বলো?' তাগাদা দিল কিশোর।

'দেখি দুটো লোকের সঙ্গে ধন্তাধন্তি করছে। চিংকার করছে, লাখি মারছে, ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছে। তাড়াহড়ো করে লাফিয়ে নামতে শিয়ে আমার পা গেল মচকে। রনিকে নিয়ে উঠে গেল ওরা।' আবার কেবলে উঠল সে। 'আমার ভাইটাকে নিয়ে গেল, আমি কিছুই করতে পারলাম না! কেন যে ঝগড়া করলাম! একসঙ্গে থাকলে তো অনেক বল পেত ও...'

পনেরো

সবাই সান্ত্বনা দিতে লাগল উনিকে।

হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসল মুসা। 'দেখি, তোমার পা-টা?'

গোড়ালির কাছে খানিকটা ছড়ে গেছে। ফুলে আছে। সেখানে টিপেটুপে দেখল। উহ-আহ করল ডনি।

মুসা বলল, 'দেখো তো, হাঁটতে পারো নাকি?'

পারল ডনি। তটো খৌড়াতে হলো না।

'হ্যাঁ, তেমন কিছু হয়নি! জলপত্তি দিলেই সেরে যাবে।' পকেট থেকে রুমাল বের করে দিল মুসা। 'নাও, গাল মুছে ফেলো।'

গাল মুছতে মুছতে ডনি বলল, 'রনিকে খুঁজে বের করতে পারবে তোমরা? ইস্ক, কেন যে ঝগড়া করতে গোলাম...'

হাত নাড়ল মুসা, 'থাক থাক, কান্না থামাও। খুঁজে ওকে বের করবই আমরা।' কিশোর বলল, 'যা যা জানো, এখন বলো। দেখি কি করতে পারি।'

'আমার নাম ডোনাল্ড কুইলার। রনি আর আমার একই নেশা, মাটি খুঁড়ে পুরানো জিনিস বের করা। ছুটি পেলেই চলে আসি, খৈড়াখুঁড়ি করি, প্রত্নতত্ত্বের ওপর পড়াশোনা করি।' তাকে সাজানে জিনিসগুলো দেখাল সে, 'এগুলো আমরা খুঁজে বের করেছি।'

ওই তাকে রাখা একটা পাত্রই সেদিন আরেকটু হলে ভেঙে ফেলছিল রবিন। 'আচ্ছা! রনি তোমার কথা একটিবার উচ্চারণও করেনি। মানুষ বটে তোমরা! এমন ভাবে চুপ করে রইলে, আমরা বুঝতেই পারলাম না তোমরা একজন নও, দুজন।'

'ওই যে বললাম, ঝগড়া করেছি। যখন তাল থাকি, দুনিয়ার সব চেয়ে বেশি তালবাসি একজন আরেকজনকে, আবার যখন ঝগড়া করিঃ'

'লোকগুলোর কথা বলো,' কিশোর বলল। 'ওদেরকে চিনতে তোমরা?'

'ঠিক চিনতাম না। কয়েক দিন হলো এসেছে এই এলাকায়। রনিকে বলল সরে যেতে, কি নাকি খুঁজবে। রেগে গেল রনি। বলল, কিছুতেই সরবে না। ওরা বলল, জোর করে সরাবে। রনি বলল, কাছে এলে পাথর ছুঁড়ে ফিলু বের করে দেবে। ও এমনিতে খুব তাল, কিন্তু রেগে গেলে আর ইঁশ থাকে না।'

‘ওই লোকগুলোই তাকে ধরে নিয়ে গেছে? তুমি শিওর?’
‘হ্যাঁ।’

‘কোন দিকে গেছে বলতে পারবে না, না?’

‘না।’ বলেই আবার ফুপিয়ে উঠতে গেল ডনি।

তাড়াতড়ি আবার হাত নেড়ে বলল মুসা, ‘বললাম তো, কাঁদতে হবে না।
ওকে আমরা বের করব।’

‘আশপাশটা একবার খুঁজে দেখা দরকার,’ কিশোর বলল। ‘কোন সূত্র পাই
কিনা দেখি। চিহ্নিটি হয়তো ফেলে গেছে।’

‘গেছে তো অনেক আগে,’ রবিন বলল। ‘এখন কি আর পাওয়া যাবে? নিচয়
গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে বেচারাকে। এতক্ষণে বহুদূর চলে গেছে।’

‘কিন্তু করেছে!’ কিশোর উঠল ডনি।

‘করেছে,’ জবাব দিল কিশোর। ‘তবে গাড়িতে করে নিয়ে গেছে বলে মনে হয়
না। ওদের প্রয়োজন কিছু সময়ের জন্যে ওকে সরিয়ে রাখা। এখানেই কোথাও
লুকিয়ে রাখতে পারে। রাখার জায়গার তো আর অভাব নেই। দ্বোপ আছে, ওহা
আছে...’

‘চলো, এখানেই খুঁজে দেখি। না পাওয়া গেলে পরে দেখা যাবে,’ মুসা বলল।

আশেপাশে যে কয়টা ট্রেঞ্চ, গর্ত, গুহামুখ, আর ঘন ঝোপ দেখল সবগুলোতে
উকি দিয়ে দেখল ওরা। পেল না রনিকে। কোন দিকে নিয়ে গেছে, তারও কোন
চিহ্নও পাওয়া গেল না।

হাল ছেড়ে দিল কিশোর, ‘নাহ, হবে না এভাবে। বিশাল এলাকা। তার চেয়ে
রকি বীচে চলে যাই, পুলিশকে খবর দিই।’

‘আমিও একথাই ভাবছিলাম,’ রবিন বলল।

‘এসো, ডনি,’ ডাকল মুসা। ‘তোমারও যাওয়া দরকার। পুলিশকে বলতে
পারবে সব। যাবে তো?’

‘নিচয়। রনিকে ফিরে পেতে সব করব আমি। আর কক্ষনো ঝগড়া করব
না...’

ফুপিয়ে উঠতে যাচ্ছিল ডনি, তাকে থামিয়ে দিল মুসা। ‘থাক, থাক, কেঁদো
না।’ মনে মনে বলল, ‘বাপরে বাপ, কত কাঁদতে পাবে ছেলেটো! চোখের পানি
মুছেই কুমাল ভিজিয়ে ফেলল!'

মালিন হাসি ফুটল ডনির মুখে।

ক্যাম্প এলাকা থেকে সরে এল তিন গোয়েন্দা। ডনিকে নিয়ে চলল তাদের
ঝোপটার কাছে।

তেতরে চুকে খাবারের টিনগুলোর ওপর চোখ পড়তে টের পেল, কতটা খিদে
পেয়েছে।

‘হায় হায়! আঁতকে উঠল মুসা, ‘নাস্তা যে করিনি এমন একটা কথা ভুলে
থেকেছি এতক্ষণ! এসো, এসো, বসে যাও সব।’

রবিন বলল, ‘থেমে শেষ করে ফেলাই ভাল। টিনগুলোর বোঝা বইতে হবে না
আর তাহলে।’

ঝোপের তেতর না বসে সমন্ত জিনিসপত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।
কলমলে রোদ। মাথার ওপর একটা পাখি শিস দিছে। সুন্দর সকাল। কিন্তু দেখার
মন নেই কারোরই। ডনির মনে দুঃখ, তিন গোহেন্দা উঞ্চিম।

খেতে খেতে কিশোর বলল, 'সকালে চিঠা যখন গরগর করছিল, তখন
বেরোলেই হয়ে যেত। এপথ দিয়েই গেছে লোকগুলো। রনিকে বাঁচাতে পারতাম।
পিছু নিয়ে অন্তত জানতে পারতাম, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

'মুসাকে তো বলেছিলাম দেখতে,' রবিন বলল।

'আমি কি আর জানি, ওই বদমাশের দল যাচ্ছে!'

'যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন আর ভেবে লাভ নেই। পানি আনা দরকার।
আমিই যাই,' বলে আনারসের খালি টিনটা নিয়ে উঠল সে। ঝর্নায় চলল পানি
আনতে।

কুলকুল করে বইছে ঝর্না। চমৎকার এই সকালে ভারি মিষ্টি লাগছে
আওয়াজটা।

'পানি বওয়ার শব্দ সত্যিই ভাল,' ভাবতে ভাবতে চলেছে কিশোর। ঝর্নার
কিনারে পৌছে নিচু হেঁঠে টিনে পানি ভরার সময় তাকাল বাঁকের দিকে। সাদা
পাথরটায় চোখ পড়ল। হঠাতে যেন ঘণ্টা বেজে উঠল মনের কোথাও। পানি!
ওয়াটার! ওয়াটার! পাথরের ফলক! যে সাইজের পাথর উল্টে উল্টে দেখেছে
চোরগুলো, এটা ও তার সমান। পানিও আছে কাছে। তবে কি ওটা র নিচেই
লুকানো আছে সেই মহামূল্যবান জিনিস, যেটা এত খোজাখুঁজি করছে লোকগুলো?

টিনটা নিয়ে সোজা হলো সে। প্রায় দৌড়ে চলল ঝোপের দিকে।

তাকে ওভাবে ছুটে আসতে দেখে সবাই অবাক।

মুসা জিজেস করল, 'কি হয়েছে, কিশোর?'

'বোধহয় পেয়ে গেছি!'

'কী! রনিকে?'

'না। পাথরটা।'

সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল রবিন, কোন পাথরটার কথা বলছে কিশোর। লাফিয়ে
উঠল সে, 'কই? কোথায়?'

দল বেঁধে পাথরটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

মুসা বলল, 'সত্যি আছে তো এর নিচে?'

'না তুললে বুঝি কি করে?' কিশোর বলল, 'তবে আমার ধারণা, এটাই সেই
পাথর। আকার, সাদা রঙ, পানি, সব মিলে যাচ্ছে।'

'তাহলে তো তোলা দরকার।'

অনেক টানাহেঁড়া করল ওরা। নড়াতে পারল না। পাথরটা সাংঘাতিক ভারি,
মাটিতে অনেকখানি দেবে আছে।

'একটা শাবল হলে ভাল হত,' কিশোর বলল। 'এমনি নড়াতে কষ্ট হবে।'

'টেক্ষে আছে,' ডনি বলল। 'দাঁড়াও, নিয়ে আসি।'

'তোমার পায়ে যাখা,' মুসা বলল। 'তাড়াতাড়ি করতে পারবে না। তুমি

খাকো, আমিই যাচ্ছি।'

দৌড় দিল সে।

কিসের পাথর, কেন সেটা তুলতে চায়, জানে না ডনি। সংক্ষেপে তাকে জানাল কিশোর ও রবিন। রনিকে কেন খরে নিয়ে গেছে চোরেরা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো ডনির কাছে।

মুসা গেল তাড়াতাড়ি করার জন্যে, কিন্তু আসতে অনেক দেরি করতে লাগল। অনেকক্ষণ পর এল, তা-ও খালি হাতে।

'শাবল কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল মুসা, একটা শাবলও খুঁজে পায়নি। মাটি খোঁড়ার কোন যন্ত্রই নেই ট্রেশে।

'রিন হয়তো অন্য কোথাও রেখে গেছে,' কিশোর বলল।

'সবগুলো গর্তে খুঁজেছি। কোথাও নেই।'

'আচর্য! কি করল?...ডনি, তুমি জানো?'

মাথা নাড়ল ডনি, 'না। গতেই তো ফেলে রাখে। কি করল? চুরি হয়ে গেল না তো?'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, 'পুরানো শাবল-বেলচাও চুরি হয় নাকি এখানে? এত হাঁচড়া চোরও আছে?'

গাল চুলকাল ডনি। 'তা তো জানি না। পাওয়া যখন যায়নি, চুরি ছাড়া আর কি হবে?'

'ওই তিন চোরই হয়তো নিয়েছে,' মুখ বাঁকাল রবিন। 'পাথর তুলে তুলে খোজে তো। শাবল ওদের দরকার। ও-ব্যাটারা ছাড়া আর কেউ না।'

'শাবল দরকার,' কিশোর বলল, 'কিন্তু বেলচাওলো নয়। ওগুলো নেবে কে? আর কেনই বা নেবে?'

'কিশোর, মাটির নিচে গুণ্ডন খুঁজছে না তো কেউ? এখানে তো খালি খোজার্খেজির কারবার।'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না।'

'এ তো দেখি আরেকে রহস্য।'

জিরানো হয়ে গেল মুসার।

কিশোর বলল, 'এসো, হাত লাগাও। শাবল ছাড়াই সরাব।'

অনেক কায়দা-কসরৎ, অনেক চাপাচাপি-ঠেলাঠেলির পর পাথরটা সরাতে পারল ওরা। ঝপাত করে পড়ল ওটা পানিতে। পানি ছিটকে এসে লাগল গায়ে। কেয়ারই করল না ওরা।

পাথরের নিচে একটা গর্ত। খুঁকে বাসে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। অস্ফকার। কিছু দেখা যায় না। কোমর থেকে টর্চ খুলে নিয়ে আলো ফেলল ভেতরে। অন্য তিনজন খুঁকে এল তার কাঁধের ওপর দিয়ে। কুকুরটা ও দেখার চেষ্টা করল।

একবার দেখেই ফিরে তাকাল কিশোর। 'সুড়ঙ্গ!'

'ভেরি গুড়! উড়ুতে চাপড় মারল মুসা। পেয়ে গেলাম তাহলে! দেরি কেন

আৱ? চলো, নেমে পড়ি।'

গতটাৰ মুখটা তেমন চওড়া নয়। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হলো। কিছুদূৰ
যাওয়াৰ পৱই সামনে পাওয়া গেল একটা গুহা। বেশ বড়। দুদিকে দুটো সুড়ঙ্গ
বেরিয়ে গেছে ওটা থেকে। কোনটা ধৰে যাবে?

ডানেৰটা দিয়েই যাওয়া উচিত, একমত হলো সবাই।

এই সুড়ঙ্গটা উঁচু, আৱ চওড়া। চলতে অসুবিধে হলো না। কিন্তু গজ বিশেক
যাওয়াৰ পৱই শেষ হয়ে গেল ওটা। সামনে দেয়াল। আৱ এগোনো যাবে না।

আবাৰ ফিৰে আসতে হলো গুহায়।

'আৱ আছে একটা পথ,' মুসা বলল। 'যদি এটাৰ বন্ধ থাকে?'

'তাহলে আৱ কি,' কিশোৱ জবাৰ দিল, 'ফিৰে আসতে হবে। তবে আমাৰ
মনে হয় না এটা বন্ধ হবে।'

তাৰ কথাই ঠিক হলো। চলেছে তো চলেছেই ওৱা, শেষ আৱ হয় না।
সাংঘাতিক আঁকাৰাকা সুড়ঙ্গ, ছাত নিউ হতে হতে একেক জায়গায় এত নেমে
আসছে, হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হচ্ছে। ওসব জায়গায় যদি সামনে পথ রুদ্ধ দেখা
যায়, ভীষণ অসুবিধেয় পড়তে হবে। পথ এটাই সৱৰ, শৱৰীৰ ঘুৱিয়ে যে ফিৰে যাবে,
তাৰ উপায় নেই। যে-ভাবে রয়েছে সেই অবস্থায় থেকেই পেছন দিকে চলতে
হবে।

তবু হাল ছাড়ল না ওৱা। আৱেকটা গুহায় পৌছল। কয়েকটা মুখ বেৰিয়ে
গেছে এখন থেকে। কোনটা দিয়ে যাবে ওৱা ভাবছে, টুচেৰ আলো ফেলে ফেলে
দেখছে, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'দেখো, চিহ্ন!'

একটা মুখেৰ পাশে দেয়ালে চক দিয়ে আঁকা বড় একটা তীৱ্ৰচিহ্ন।

'ঠিক পথেই চলেছি আমৱা,' উত্তেজিত কষ্টে বলল কিশোৱ। 'এটা দিয়েই
যেতে হবে।'

এই সুড়ঙ্গটা বেশি লম্বা নয়। শেষ হয়ে গেল তৃতীয় আৱেকটা গুহায় এসে।
দেয়ালে কোন সুড়ঙ্গমুখ দেখা গেল না। এত কষ্ট কৱে এসে তবে কি সব বিফল
হলো? ফিৰে যেতে হবে?

ওপৱ দিকে টুচেৰ আলো ফেলে চেঁচিয়ে উঠল কিশোৱ, 'একটা ফোকৱ! মনে
হয় ওটাই পথ!...হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো তীৱ্ৰচিহ্ন আঁকা!'

ওখানে উঠতেও কোন অসুবিধে নেই। পাথুৱে দেয়ালেৰ গায়ে খাঁজকাটা,
সিঁড়িৰ ধাপেৰ ঘত হয়ে আছে। মানুৰেৰ কাটা নয়, প্ৰাকৃতিক ভাবেই তৈৱি হয়ে
গেছে সিঁড়িটা।

'সহজেই উঠে যেতে পাৱ,' টুচ হাতে এগিয়ে গেল কিশোৱ।

ফোকৱটাৰ কাছে পৌছে মাথা গলিয়ে দিল তাতে। ওপৱতলাৱ আৱেকটা
গুহায় চুকল মাথা। টুচটা দাঁতে কামড়ে দু-হাতে ওপৱেৰ গুহাটাৰ মেঝেৰ কিনাৰ
ধৰে টেনে তুলে আনল শৱৰীটা।

মুসা উঠল তাৰ পৱে। সব শেষেৰ রবিন ও ডনি। না না, কুকুৰটা রয়ে গেছে
নিচে। নিজে নিজে উঠতে পাৱবে না। তুলে আনাৰ ব্যবস্থা কৱতে হবে।

মুসা বলল, 'কিশোর, চিতাকে উঁচু করে ধরছি আমি। তোমরা তুলে নেবে।' নিচে থেকে ঘট ঘট শুরু করেছে ততক্ষণে চিতা। ভয় পেয়েছে, ভেবেছে তাকে ফেলে দিয়ে চলে গেছে ছেলেরা।

'আরে বাবা আসছি,' বলে আবার নিচে নেমে গেল মুসা।

বেজায় ভারি কুকুর। দূর্হাতে ধরে ফোকরের ডেতর দিয়ে উঁচু করে ধরল সে।

ওপর থেকে তুলে নিল ওটাকে কিশোর ও রবিন।

হাঁপাতে হাঁপাতে আবার ফোকর গলে উঠে এল মুসা। হাত ঝাড়তে বলল, 'বাপরে বাপ, কুস্তা তো না, একটা গুরু।'

'কুস্তা আবার গুরু হয় কি করে?' হেসে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'দূর, কিছু বোঝে না! বললাম, গুরুর মত ভারি।'

'তো এটা বুঝিয়ে বললেই হয়।'

'যত কম কথা বলে বেশি বোঝানো যায়, রচনার ক্লাসে বলেন না, স্যার। বেশি বলতে গেলে ঢিলে হয়ে যায়...'

'কিন্তু বোঝার মত করে বলতে হবে তো?'

ওদের কথায় কান নেই কিশোরের। শুহাটা দেখছে। লম্বাটে একটা ছেট হলঘরের মত শুহাটা। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে বিশাল এক পাথর, আরেক দিকের দেয়ালে একটা তাকমত হয়ে আছে। তাকে কি যেন একটা জিনিস। পাথরের মত লাগছে না।

ভাল করে দেখার জন্যে এগিয়ে গেল কিশোর।

চিনতে আর অসবিধে হলো না। বাদামী রঙের একটা চামড়ার ব্যাগ। গায়ে আঁকা রয়েছে একটা তৌরচিহ্ন।

'অ্যাই পেয়েছি, পেয়েছি!' চিৎকার করে বলল সে।

দৌড়ে গেল অন্য তিনজন।

ব্যাগটা নামিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে কিশোর। ঝাঁকি দিয়ে দেখল। নড়ল না কিছু। আনমনে বিড়বিড় করল, 'এত হালকা! ডেতরে কিছু আছে বলে তো মনে হয় না!'

ঘোলো

'চাবি ছাড়া খোলা যাবে না!'

জোরে জোরে ব্যাগটা ঝাঁকাতে লাগল কিশোর, যেন ঝাঁকিতেই ঝটকা দিয়ে মুখ খুলে গিয়ে ডেতরের জিনিস সব ছিটকে পড়বে।

'তার মানে ডেতরে কি আছে জানতে পারব না!' চরম হতাশ হয়ে বলল মুসা। 'এমনও তো হতু পারে, ঝাঁকি দিয়েছে বোধাম না বোতাম, সেই লোকটা? ডেতরে কোন জিনিসই নেই। আসল জিনিসটা সরিয়ে খালি ব্যাগটা ফেলে রেখে গেছে। অন্যদের বোকা বানানোর জন্যে?'

'কেটে খোলা যায় না?' ছুরি বের করার জন্যে পকেটে হাত দিল রবিন।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, খুব শক্ত চামড়া। সাধারণ পকেট-নাইফ দিয়ে এ-জিনিস কাটা যাবে না। আমার আটফলার ছুরিটা আনতে ভুলে গেছি।'

'এমনই হয়। যখন যে জিনিসটা বেশি প্রয়োজন, সেটাই হাতের কাছে পাওয়া যায় না।'

ব্যাগটার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল মূসা, যেন তেতুরের জিনিসটা দেখার ওপরই নির্ভর করছে তার জীবন-মরণ।

'যা পাওয়ার তো পেয়েছি, এখন কি করা?' ভোঁতা গলায় যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল রবিন, 'আবার ওই ছুঁচোর গর্তে চুকব? যা চিপার চিপা, আসার সময় একেকবার মনে হয়েছে দম আটকেই মরে যাব। এত সরু সুড়ঙ্গে চলা যায়?'

'কি আর করা। বেরোতে তো হবে...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' কিছু দেখতে পেয়েছে মুসার তীক্ষ্ণ চোখ। 'ওগুলো কি?'

দেয়ালে দুই সারি তৌরিচিহ্ন আঁকা। একসারি নির্দেশ করছে নিচের দিক, আরেক সারি এগিয়ে গেছে দেয়াল ধরে।

'কি মানে এর?' জবাবটাও নিজেই দিল রবিন, 'যারা জানে না তাদেরকে ধাঁধায় ফেলার চেষ্টা?'

'উহ,' ছিঙুলোর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'নিচের দিক নির্দেশ করে বোঝাচ্ছে ওদিক দিয়ে বেরোনোর পথ আছে, যেদিক দিয়ে আমরা উঠে এলাম। তার মানে অন্য সারিটাও কোন পথই নির্দেশ করছে।'

চিহ্নের ওপর উচ্চের আলো ফেলে ফেলে এগোল সে।

দেয়াল দৈঘ্যে পড়ে থাকা বড় প্যাথরটার ওপাশে চুকে গেছে চিঙুলো। কাছাকাছি এসে পাথরের অন্য পাশে উঁকি দিয়েই চিংকার করে উঠল, 'এই তো আছে পথ! দেখে যাও।'

দেখল সবাই। সরু আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ। মুখের কাছে এসে শেষ হয়েছে তৌরিচিহ্ন। বুঁবিয়েছে, এই মুখ দিয়েও ঢোকা যায়।

'কিন্তু,' প্রশ্ন তুলল রবিন, 'এটা যে সহজ পথ, কি করে বুঁব? যেটা দিয়ে এসেছি, তার চেয়ে খারাপ হতে পারে।'

'তার চেয়ে খারাপ আর কি হবে?'

সুড়ঙ্গটা দেখার পর থেকেই কি যেন ভাবছিল ডনি। বলল, 'আমার বিশ্বাস, ক্যাম্পের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। সুড়ঙ্গটা ওদিকেই গেছে, তবে কোনখান দিয়ে বেরিয়েছে বলতে পারব না।'

মুসা বলে উঠল, 'কিশোর, সেদিন একটা গর্ত দেখেছিলাম রনির ট্রেক্সের কাছে, মনে আছে? খরগোশ উঁকি দিতে দেখে যেটা বের করেছিলাম। ওটা দিয়ে বেরোয়নি তো?'

'স্প্যানিশরা যেটাকে স্টোরকুম হিসেবে ব্যবহার করত, সেটার কথা বলছ?' ডনি জানতে চাইল।

'হ্যাঁ।'

মাথা দোলাল ডনি, 'তা বেরোতে পারে। এখানকার পাহাড়ের নিচে গুহারও

অভাব নেই, সুড়ঙ্গেরও অভাব নেই। আবরা বলেছে, সুড়ঙ্গগুলো জালের যত ছড়িয়ে গেছে, একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত। আমি আর রনিও অনেকগুলোতে চুকেছি। তবে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে বেশি ঘোরাঘুরি করতে সাহস পাইনি। যে গতটার কথা বলছ, ওটাতেও চুকিনি কখনও।'

'ক্যাম্পের কাছাকাছি হলে এটা দিয়ে এগোনোই ভাল,' সুড়ঙ্গমুখটা দেখিয়ে বলল কিশোর। 'রাত্রা অনেক কম হবে।'

সরু মূখ। কুকুরটাকে আগে চুকিয়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তার মধ্যে চুকে পড়ল মুসা। হাতে টর্চ। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে চলল। পেছনে একে একে চুকে পড়ল অন্য তিনজন।

বেশিদুর এগোতে হলো না, চওড়া হয়ে গেল সুড়ঙ্গ। চলতে আর কোন অসুবিধে নেই। স্বত্তির নিঃখাস ফেলল ওরা।

কিছুদুর সোজা এগিয়ে নিচের দিকে প্রায় খাড়া হয়ে নেমেছে সুড়ঙ্গ। বসে পড়ে পিছলে নামিতে শুরু করল গোয়েন্দারা। কুকুরটা দৌড়ে চলল। নেমে গেল সবার আগে। কয়েক গজ গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল যেন ধাক্কা খেয়ে। সামনে পথ বন্ধ। দেয়াল নয়, ছাত ধসে পড়েছে।

'খাইছে!' শুণিয়ে উঠল মুসা। 'এইবার মরেছি! নেমেছি ঢাল বেয়ে, উঠে যেতেও বারোটা বাজে এখন!'

সামনে খুব খারাপ অবস্থা। ছাত থেকে ধসে পড়া পাথর, বালি আর মাটির স্তুপ হয়ে আছে। রক্ষ করে দিয়েছে পুরো সুড়ঙ্গটা। এগোনোর চেষ্টা করে লাভ হবে না।

'দূর!' স্তুপের গায়ে লাধি মারল মুসা।

'পাথরকে গালাগাল করে লাভ নেই,' শুকনো গলায় বলল কিশোর। 'বেরোতে হলে নিজেদের চেষ্টাই বেরোতে হবে। ফিরেই যেতে হবে। যত জলদি পারা যায়। টর্চের ব্যাটারিও ফুরিয়ে আসছে। আলো না ধাকলে সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যাব।'

যাওয়ার জন্যে ঘুরল ওরা। একেবারে দমে গেছে। গা ঘেঁষে আসা সরু সুড়ঙ্গ ধরে আবার বেরোনোর কথা ভাবতেই ঘেমে যাচ্ছে হাতপা।

'অ্যাই চিতা, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়,' ডাকল মুসা।

কিন্তু এল না কুকুরটা। দাঁড়িয়েই আছে স্তুপের কিনারে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে কি যেন। কান খাড়া। অবাক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

হঠাতে করেই চেঁচিয়ে উঠল ঘাউ ঘাউ করে।

বন্ধ জাঙ্গায় বিকট শব্দ হলো। চমকে গেল সবাই।

'কি হয়েছে? চেঁচাছিস কেন? ওদিক দিয়ে বেরোতে পারবি না। আয়।'

তবু এল না কুকুরটা। স্তুপের মাটি আঁচড়াতে শুরু করল। একনাগাড়ে চেঁচিয়ে চলল, হউ! হউ! হউ! হউ!

মুসার পাশে এসে দাড়াল কিশোর। 'নিশ্চয় কিছু দেখেছে।'

আঁচড়ে চলল চিতা। মাটি আর ছোট ছোট পাথর ছিটাচ্ছে।

'স্তুপের ওপাশে কিছু আছে,' রবিন বলল, 'ওটার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে

সে। মুসা, ওকে থামতে বলো। দেখি, কিছু শোনা যায় কিনা?’

অনেক কষ্টে কুকুরটাকে থামাল মুসা।

কান পাতল সবাই। হ্যাঁ, মদু একটা শব্দ এখন ওদের কানেও আসছে।

থাট! থাট! থাট! থাট!

‘আরে, এ তো কার্ব!’ সবাইকে আরেকবার চমকৈ দিল ডনি। ‘নিচয় রনিও আছে তার সঙ্গে! কক্খনো তার কাছছাড়া হয় না কুকুরটা।’ গলা ঢড়িয়ে ডাকল, ‘কার্ব! এই কার্ব!’

আবার চিংকার শুরু করল চিতা। মাটি আঁচড়ানো বেড়ে গেছে।

ভীমণ আওয়াজ হচ্ছে। আরও জোরে চঁচিয়ে কথা বলতে হলো কিশোরকে, ‘কার্বের ডাক যখন শোনা যাচ্ছে, সৃপটা বেশি পুরু নয়। এর ভেতর দিয়ে পথ করে ঢোকার চেষ্টা করব। এসো, হাত লাগাও, মাটি খোঁড়ো।’

পাশাপাশি চার্জনের জায়গা হয় না, কুকুরটা বাদে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দুজন দাঁড়াতে পারে। ফলে চারজন একসঙ্গে কাজ করতে পারল না। প্রথমে শুরু করল মুসা ও কিশোর।

পালা করে মাটি খুঁড়ে চলল ওরা। একই সঙ্গে চলল পাথর সরানো। ধীরে ধীরে ছেট একটা ফোকুর দেখা দিল।

মাথা চুকিয়ে দিয়ে খুঁড়তে গেল মুসা।

বাধা দিল কিশোর, ‘উহ, ঢোকো না। অনেক পুরু সৃপ। মাটি আর পাথরগুলোও আলগা। বেশি চাপ্পাচাপি করতে গেলে ওপর থেকে বসে গিয়ে জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে।’

ককিয়ে উঠল ডনি, ‘তাহলে যাব কিভাবে ওপাশে?’

তার প্রশ্নের জবাবেই যেন সৃপের চূড়ায় দেখা দিল একটা মুখ। ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

উঠে এসেছে কার্ব। ছাত আর সৃপের ওপরে সরু একটা ফাঁক আছে।

এপাশে লাফিয়ে পড়ল কুকুরটা।

‘কার্ব, কার্ব, রনি কোথায়?’ ভাইয়ের খবর জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল ডনি।

তার হাত চেটে দিতে লাগল কুকুরটা।

‘রনি!’ চিংকার করে ডাকল কিশোর, ‘ওপাশে আছ তুমি?’

দুর্বল কষ্টে জবাব এল, ‘আছি! কে?’

‘আমরা, রনি,’ জবাব দিল তার ভাই। ‘আমি ডনি।’

নিচে ফোকুর করে যাওয়ার চেয়ে সৃপের ওপরের মাটি সরিয়ে পথ করে যাওয়া সহজ ও নিরাপদ মনে হলো কিশোরের। সৃপের ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল সে। তবে তার আগেই কয়েক লাফে ওপরে উঠে গেল চিতা। সরু ফাঁকটা গলে চলে গেল ওপাশে।

ওপরের মাটি সামান্য সরাতেই মানুষ যাওয়ার পথও তৈরি হয়ে গেল। সৃপটা পাড় হয়ে অন্যপাশে চলে এল ওরা।

সৃজনের মেঝেতে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে রনি। উর্চের আলোয়

ফ্যাকাসে দেখাল তার মুখ।

‘কেমন আছ, রনি?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘ভাল। শধু গোড়ালিটা...’

ভাইকে ঢিয়ে জড়িয়ে ধূরল ডনি, ‘সব আমার দোষ, রনি! তোর সঙ্গে ঝগড়া না করলে এমন হত না...’ কেন্দে ফেলল সে।

রনির চোখও শুকনো রইল না। আবার মিল হয়ে গেল দু-ভাইয়ে।

ডাক্তারি শুরু করে দিল মুসা। রনির পা-টা দেখতে বসে গেল। টিপেটুপে দেখে বলল, ‘হ্যাঁ, তোমারটার অবস্থা ডনির চেয়ে খারাপ।’

‘ওরও ভেঙেছে নাকি?’

‘ভাঙ্গেনি কারোরটাই। তোমারটা মচকেছে, ও শধু শক্ত ব্যথা পেয়েছে। ওরটা সেরে গেছে। তোমারটাও যাবে।’

‘কিন্তু দাঁড়াতেই তো পারি না।’

‘পারবে,’ অভয় দিল মুসা, ‘আমরা সাহায্য করব। দরকার হলে বয়ে নিয়ে যাব। খিদে-টিদে পেয়েছে?’

মাথা ঝাকাল রনি।

পকেট থেকে চকলেট বের করে দিল রবিন, ‘নাও, এটা খাও।’

ডনির পকেটে বিস্তুটি আছে। নাস্তা করার সময়ই রেখে দিয়েছিল, ভাইকে পাওয়া গেলে দেয়ার জন্যে। বের করে দিল।

খেয়েদেয়ে শরীরে বল পেল রনি। তার গোড়ালিটা ও রুমাল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে মুসা।

কিশোর জানতে চাইল, ‘এখন বলো তো, কি করে এলে এখানে?’

রনি বলল, ‘সকালে ঘুমিয়ে ছিলাম। পায়ের কাছে ওটিসুটি হয়ে আছে কার্ব। হঠাতে চেঁচাতে শুরু করল। অবাক হলাম। ওরকম করে কেন? উঠে বসলাম। এই সময় দেখি তিনজন লোক...’

বাধা দিল মুসা, ‘তাদের একজন মহিলা, না?’

‘চেনো নাকি?’

‘চিনি। কি করে চিনলাম, পরে বলব,’ কিশোর বলল। ‘তোমার কথা বলো।’

‘লোকগুলো এলেই খালি খোজাখুজি করে। ওদের এই ছোঁক ছোঁক ভাল নাগে না আমার। একবার এসে পাথর উল্টে উল্টে তচনছ করে দিয়ে গিয়েছিল ক্যাম্প এলাকা। তাই আবার ওদের আসতে দেখে ভৌষণ রাগ হতে লাগল। কার্বকে লেলিয়ে দিলাম। নাথি মেরে উল্টে ফেলে দিল ওকে একটা লোক। আর কি ছাড়ি, গিয়ে ঝাপিয়ে পড়লাম ওর ওপর।’

‘সাহস আছে তোমার,’ মুসা বলল। ‘তারপর? একআধটাকে কাবু করতে পেরেছিলে?’

‘না, কি করে? ওদের সঙ্গে কি গায়ের জোরে পারি নাকি? একজন ঠাস করে এক চড় মারল। আরেকজন কি দিয়ে জানি বাড়ি মারল মাথায়। বোঁ করে চক্ক দিয়ে উঠল মাথাটা। বলতে শুনলাম, এই বিষ্টুটাকে ছেড়ে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। গিয়ে লোক ডেকে নিয়ে আসবে। সর্বনাশ করে দেবে আমাদের। আরেকজন

বলল, একে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। টানতে টানতে আমাকে গর্তের
কাছে নিয়ে চলল ওরা।

‘কোন গর্ত?’ ডনি জিজ্ঞেস করল।

‘ওই যে, স্টোরকুম...’

‘ওখানে নামাল কি করে? দড়ি ছাড়া তো নামা যায় না...’

‘দড়ি ওদের সঙ্গেই ছিল। এক মাথা বাঁধল গাছের গোড়ায়। অনেক চেঁচামেচি
করলাম, নাধি মারলাম, কিন্তু আমাকে ছাড়ল না। গর্তে নামতে বলল। কিছুতেই
রাজি হলাম না। না হয়ে ভুল করেছি, পরে বুঝলাম। আমি নিজে নির্জে না নামায়
শেষে জোর করে আমার কোমরে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিল। বাঁধটা শত হয়নি,
আমি অর্ধেক পথ নামতেই খুলে গেল গিট। অনেক ধস্তাধস্তি করেছি, মাথায় বাড়ি
খেয়েছি, মাথার ডেতের গোলাছে তখন। গিট খুলে গেলে দড়িটা আর ধরে রাখতে
পারলাম না। পিছলে গেল হাত থেকে। গর্তের নিচে পড়ে গেলাম। মনে হলো পা-
টা ডেডে গেল। ব্যথায় গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

‘নেমে এল লোকগুলো। আমার পা-টা একবার দেখলও না। নিজেদের
ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে বসল। আমি তখন ব্যথায় ককাছি...’

‘জানোয়ার!’ দাতে দাত চেপে বলল ডনি, ‘আস্ত জানোয়ার!’

‘সুড়ঙ্গ, বোধামের নকশা, কি কি সব বলতে লাগল ওরা, কিছুই বুঝলাম না।
মাথা চুক্র মারছিল। ব্যথায় জান হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখানে কি করে এসেছি
জানি না। নিচয় হিচড়ে নিয়ে এসেছে। হঁশ ফিরলে দেখলাম, পড়ে আছি।’

‘তারপর? জিজ্ঞেস করল কিশোর। লোকগুলোকে আর দেখোনি?’

‘দেখেছি। ওরা তখনও যায়নি। পথ বন্ধ দেখে খেপে গেছে। গালাগাল করছে
সুপটাকে। উটার ওপরে উঠতে গেল একজন। ছাত থেকে একটা পাথর খসে পড়ল
মীথায়। আউ করে উঠে নেমে এল তৃত্বাতড়ি, মাথার একপাশ চেপে ধরে। এরপর
আর ওঠার সাহস করল না কেউ। ঠিক করল, ফিরে গিয়ে শাবল, বেলচা, এসব
নিয়ে আসবে, পথ পরিষ্কার করার জন্যে।’

‘ও, শাবল আর বেলচা তাহলে ওরাই নিয়ে এসেছে,’ মুসা বলল। ‘এ-জনেই
পাইনি।’

‘পাওনি মানে?’

‘তোমার ট্রেংক থেকে একটা শাবল আনতে গিয়েছিলাম। পাইনি।’

‘পাবে কি করে, ওগুলো নেই তো ওখানে। এক রাতে দুটো শাবল ছুরি হয়ে
গিয়েছিল। তারপর থেকে আর বাইরে ফেলে রাখি না। কাজ শেষ করে ঘুমাতে
যাওয়ার আগে লুকিয়ে রাখি। এমন জায়গায়, সহজে ঝুঁজে পাবে না কেউ।’

‘হ্তি,’ মাথা দোলাল কিশোর, ‘ওই ব্যাটারাই ছুরি করেছে, ওদেরই দরকার
হয়েছিল। তা লোকগুলো আর এসেছে?’

‘না।’

‘তোমাকে ফেলে গেছে তো অনেকক্ষণ, এখনও আসছে না কেন?’

‘কাছাকাছি কোথাও ওসব যন্ত্রপাতি পাবে না ওরা, যেতে হবে দূরের গাঁয়ে।
ওখান থেকে আসতে সময় লাগবে। এতক্ষণে আসার সময় অবশ্য হয়ে গেছে।’

‘সর্বনাশ! আমাদের পালানো উচিত।’

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু তোমাকে এখানে ফেলে গেল কেন?’

‘ওরা জানে আমার পা ভেঙেছে। ভাঙা পা নিয়ে পালাতে পারব না। কোন দিকে যেতে পারব না। ফলে আর তেমন মাথা ঘামায়নি। ওরা কাজ সেরে ফেরত যাওয়ার সময় হয়তো বাইরে বের করে নিয়ে যেত।’

শয়তান লোকগুলো যে কোন সময় এসে হাজির হতে পারে জেনে অস্বাস্থিতে পড়ে গেল স্বাই।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, ‘গর্ত থেকে এ-জ্যায়গাটা কত দূরে, আন্দাজ করতে পারো?’

‘খুব বেশি হবে বলে মনে হয় না।’

‘জলদি করা দরকার,’ বলিন বলল। ‘যে পথে চুকেছে ওরা, নিশ্চয় সে-পথেই বেরিয়েছে। দড়িটা ঝুলিয়ে রেখে যাওয়ার স্থাবনা বেশি, কারণ আবার নামতে হবে। বার বার খোলা-বাঁধার ঝামেলা করবে না।’

‘আমরাও তাই মনে হয়,’ একমত হলো কিশোর। ‘এখান থেকে কাছে হলে আমরাও ওদিক দিয়েই বেরোনোর চেষ্টা করব।’

‘চলো না যাই,’ তাগাদা দিল মুসা। ‘ব্যাটারা চলে এলে বিপদে ফেলে দেবে।’

তাবছে কিশোর, ওদিক দিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক। লোকগুলো কখন আসবে জানে না ওরা। এমনও হতে পারে, ওরা দড়ি বেয়ে উঠেছে, ঠিক ওই সময় এসে হাজির হলো। নিরাপদ হত, যে পথে এসেছে সে-পথে যদি ফিরে যাওয়া যেত। কিন্তু টর্চের ব্যাটারি প্রায় শেষ। বেশিক্ষণ আর চলবে না। তার ওপর সুড়ঙ্গ জ্বায়গায় জ্বায়গায় এত সরু, সেখান দিয়ে রানিকে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন হবে। অতএব সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

মুসার দিকে তাকাল সে, ‘ওকে তোলো।’

রানির ওপর ঝুঁকল মুসা। কগলের নিচে হাত চুকিয়ে দিতে দিতে বলল, ‘কাঁধে তর দিয়ে ঝেঁড়াতে পারবে তো? না বয়েই নিতে হবে?’

‘দেখি চেষ্টা করে।’

কিন্তু পারল না সে। মুসার কাঁধে তর দিয়ে দাঁড়িয়ে, আহত পা-টা মাটিতে ফেলেই আউ করে উঠল। রাখতেই পারে না।

‘দূর, মিয়া, পারবে না,’ মুসা বলল। ‘অত শরমের দরকার নেই। দেখি, আমার গলা ধরে ঝুলে পড়ো।’

বস্তাৱ মত করে রানিকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে এগোল মুসা। টর্চ হাতে আগে আগে চলল কিশোর। বলিন, ডনি ও কুকুর দুটো রইল মসার পেছনে।

সুড়ঙ্গ এখানে যথেষ্ট চওড়া, উচুও খুব, মাথা ঠেকে যায় না, ফলে হাঁটতে অসুবিধে হলো না। দেয়ালে একটু পর পরই তীর চিহ্ন দেয়া, ওরা যেদিক থেকে আসছে সেদিকে নির্দেশ করা।

কয়েক মিনিটেই বিশাল এক গুহায় এসে চুকল ওরা। অনেক ওপরে গর্তের মুখ

দিয়ে আলো আসছে। এত নিচে পৌছাচ্ছে না সেই আলো। গর্তের দেয়ালেও তীরচিহ্ন দেখা গেল—সুড়ঙ্গমুখের দিকে নির্দেশ করছে।

মুসা বলল, ‘কিশোর, আলোটা ধরো তো?...ওই তো, আছে দড়িটা। বাঁচা গেল।’

কিশোর বলল, ‘রনি, কোমরে আবার দড়ি বেঁধেই তোমাকে উঠতে হবে। মুসা, ওকে নিয়ে তুমি থাকো। আমরা উঠে যাই। ওকে প্রথম পাঠাবে। তারপর কুতা দুটোকে। টেনে তুলে নেব আমরা।’

দড়ির দিকে এগোল সে। খোদা, লোকগুলো যেন এখন এসে না পড়ে! দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল ও। বেয়ে উঠতে শুরু করল।

নিরাপদেই গর্তের বাইরে বেরিয়ে এল কিশোর। পরিষমে হাঁপাচ্ছে, ঘামছে দরদর করে। তবে কোন ঝামেলা হয়নি। চট করে তাকিয়ে নিল আশেপাশে। লোকগুলোকে আসতে দেখল না। নিচে উকি দিয়ে তাড়াতাড়ি করার নির্দেশ দিল রবিন ও ডনিকে।

ওরা দুজনও উঠে এল।

তারপর কোমরে দড়ি বেঁধে পাঠানো হলো রনিকে। ওপর থেকে তাকে টেনে তুলে নিল কিশোররা তিজনে।

কুকুর দুটোকে তোলাও কঠিন হলো না। ব্যাগটাও দড়িতে বেঁধে পাঠানো হলো।

সব শেষে উঠল মুসা।

সে উঠেও সারল না, কিশোরের কাঁধে হাত রেখে রবিন বলে উঠল, ‘আসছে ব্যাটারা!’

এতক্ষণ ব্যন্ত ছিল বলে নজর রাখতে পারেনি ওরা, লোকগুলোকে আসতে দেখেনি তাই। অনেক কাছে চলে এসেছে। তবে গোয়েন্দাদের দেখেনি।

তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ার নির্দেশ দিল কিশোর। বলল, ‘মুসা, সবাইকে নিয়ে ট্রেক্সে নেমে যাও। কুতা দুটোকে শান্ত রাখবে। টুঁ শব্দ যেন না করে।’

‘তুমি?’

‘আমার কাজ আছে। তোমরা যাও। আহ, তাড়াতাড়ি করো।’

রনিকে আবার পিঠে তুলে নিল মুসা। ট্রেক্সে নার্মার আগে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দেখল, গর্তের কাছেই একটা ঘন ঝোপে চুকে যাচ্ছে কিশোর।

চূপ করে ট্রেক্সে বসে আছে মুসা। তার সঙ্গীরাও চূপ। কয়েক মিনিট পর নিকের ঘড়ঘড়ে কঠ কানে এল, ‘এসব আর দড়িতে র্ধাধতে হবে না। ফেলে দাও নিচে।’

শাবল-বেলচাগুলো গর্তে ফেলতে বলছে লোকটা, বুঝতে অসুবিধে হলো না মুসার।

আরও কিছুক্ষণ ওদের কথাবার্তা শোনা গেল। তারপর সব চুপচাপ।

আরও প্রায় মিনিট পাঁচেক পর ট্রেক্সের একপাশ থেকে উকি দিল কিশোর পাশার মুখ। হাত নেড়ে হাসিমুখে ডাকল, ‘উঠে এসো।’

সতেরো

হত্তদন্ত হয়ে ধানায় এসে চুকল গোয়েন্দারা। অফিসেই পাওয়া গেল ক্যাপ্টেন ইয়ান
কুচকে। ভুক্ত কুচকে তাকালেন তিনি, ‘কিশোর, তোমরা? কি ব্যাপার?
একেবারে সদলবলে?’

হাতের ব্যাগটা টেবিলে নামিয়ে রাখল কিশোর। ‘আগে এটা খুলুন, স্যার।’
অবাক হলেন ক্যাপ্টেন, ‘কি আছে এতে? কোথায় পেলে?’

‘পেয়েছি একটা শুভায়। কি আছে জানি না। খুলনেই বোঝা যাবে।’

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। আস্তে মাথা
ঝাঁকালেন একবার। সামনের চেয়ারওলো দেখিয়ে ছেলেদের বসতে বললেন।

বসল ওরা।

ড্যার থেকে একটা রিঙ বের করলেন ক্যাপ্টেন। চাবির রিঙের মত, তবে
আরও বড়। তাতে নানা রকমের যন্ত্রপাতি চাবির মত করেই আটকানো। একটা
যন্ত্র বেছে নিয়ে ব্যাগের তালায় ঢুকিয়ে কয়েকবার মোচড় দিলেন। কাজ হলো না।
আরেকটা যন্ত্র বেছে ঢোকালেন তালার ফুটোয়। দুই বার মোচড় আর কয়েকবার
ওপরে নিচে করতেই মন্দ কিট করে একটা শব্দ হলো। গোয়েন্দাদের উদ্ধিয় মুখের
দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘খুলেছে।’

কি আছে দেখোর আর তার সহিছে না ছেলেদের। আগাহ, উজ্জেনায় সামনে
খুঁকে এল।

তাড়াহড়া না করে ব্যাগের মুখের ঢাকনা তুললেন ক্যাপ্টেন। ডেতরে
দেখলেন।

‘কি আছে, স্যার!’ একসঙ্গে জানতে চাইল তিন-চারটে কষ্ট।

মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন, ‘কিছু না। একেবারে খালি।’

চেয়ার থেকে উঠে গিয়েছিল মুসা, ধপ করে বসে পড়ল। হতাশ ভঙিতে
হেলান দিল রাবিন। কেবল কিশোরের কোন ভাবাত্তর নেই। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে
রয়েছে ব্যাগটার দিকে। ঘন ঘন চিমটি কাটল দু-বার নিচের ঠোঁটে।

‘এবার বলো,’ জিজেস করলেন ক্যাপ্টেন, ‘ব্যাগটা কোথায় পেলে? এর
ডেতরে জিনিস আছে কেন মনে হলো?’

‘সে-এক লৱা গৱ, স্যার,’ কিশোর বলল।

‘বলো, শুনি।’ ড্যার থেকে বড় একটা নোটবুক টেনে বের করলেন
ক্যাপ্টেন। ‘হ্যা, শুরুটা কি করে হলো?’

‘শুরুটা হয়েছে স্যার, চিতার কান দিয়ে,’ জবাব দিল মুসা।

নোটবুকের পাতায় পেসিলের সীস স্থির হয়ে গেল। কুচকে অনেক কাছাকাছি
হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের ভুক্ত জোড়া। ‘কিসের কান?’

‘এই কুকুরটা, স্যার। এর নাম চিতা। বী কানে কোপ মেরেছিল শয়তান
পোলাপান। পও ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বলে দিলেন, চুলকালে ক্ষতি

হবে, কুকুরটার গলায় শক্ত দেখে একটা হার্ডবোর্ডের কলার পরিয়ে দিতে, যাতে নাগাল না পায়।'

নোটবুকে লিখে নিতে নিতে ধৈর্যে গেলেন ক্যাপ্টেন। মুখ তুলে বললেন, 'দেখো, অথবা সময় নষ্ট কোরো না আমার। কুকুরের গলার হার্ডবোর্ড নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আসল কথা বলো।'

'এটা আসল কথাই, স্যার।'

মুসা, কিশোর ও রবিন মিলে বলে গেল এক অসামান্য অ্যাডভেঞ্চার আর রহস্যের কাহিনী। লিখতে লিখতে কখনও ভুরু কঁচকালেন ক্যাপ্টেন, কখনও ভীষণ গভীর হলেন, পরশ্ফেই হয়তো মুঢ়ি হাসি খেলে গেল ঠোটের কোণে।

ভৃত্যড়ে আলো আর শব্দের কথা বলল মুসা।

হাসলেন ইসপেষ্টের। 'তোমাদের ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চৈয়েছে, এ-তো বোঝাই যায়। কিন্তু তোমরা ভয়ও পাওনি, তাড়িতও হওনি। কারা করেছে এসব?'

দই চোরের কথা বলল গোয়েন্দারা।

নিক ও জেরির নাম আলাদা করে টুকে নিলেন তিনি।

জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কেউ?'

'এক মহিলা ছিল ওদের সঙ্গে।'

'তার নাম?'

'জানি না, স্যার। ওরা একবারও বলেনি।'

'কোন প্রমাণ আছে তোমাদের কাছে?'

পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজটা বের করে দিল কিশোর, যেটাতে জুতোর ছাপ এঁকে এনেছে।

একবার দেখলেন ক্যাপ্টেন। আবার ভাঁজ করে একটা ফোন্ডারে চুকিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'থাক, কাজে লাগতেও পারে। তারপর কি ঘটল?'

গভীর মনযোগে ওদের সুড়ঙ্গ-অভিযানের কাহিনী শনলেন তিনি। চুপ করে ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে রইলেন পুরো পনেরো সেকেণ্ড। আবার টেনে নিলেন কাছে। 'খালি কেন বুঝতে পারছি না। বোধামের মিথ্যে বলার কোন কারণ দেখি না। তাদের ফাঁকিই বা দিতে যাবে কেন? সে ওদের কজায় রয়েছে। ফাঁকি দিলে আবার চেপে ধরতে পারবে তাকে।' ব্যাগটা তুলে জোরে জোরে ঝাকালেন। ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন আরেকবার।

হঠাতে কিশোর বলল, 'স্যার, আমার হাতে দিন তো। আর আপনার ছুরিটা, শীজ!'

ব্যাগটা ঠেলে দিলেন ক্যাপ্টেন। ছুরি বের করে দিলেন ঢ্রয়ার থেকে।

খুব সাবধানে ব্যাগের লাইনিং কেটে ফেলল কিশোর। আঙুল চুকিয়ে দিল ডেতরে। হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। টেনে বের করে আনল কয়েক পাতা মোটা কাগজ। টেবিলে রাখল।

সবাই ঝুঁকে এল দেখার জন্যে। প্রচুর অঙ্ক, অঁকিবুকি, নকশা আর রেখায় ভরা কাগজগুলো। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, অলস মুহূর্তে কাগজ-কলম সামনে পেয়ে, অহেতুক আকাঞ্চকি করেছেন কোনও অক্ষের প্রক্ষেপ।

কিছু না জানলে অবশ্য ফালতুই ভাবত, কিন্তু এখন তা ভাবতে পারল না কেউ। ফালতু হলে ব্যাগে ভরে এত কষ্ট করে শুহায় লুকাতে যেত না বোধাম। আর এটা পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠত না তিন চোর।

রবিন বলল, ‘আমার বিশ্বাস, এটা কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। কোনও ধরনের ফর্মুলা।’

মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন, ‘ঠিক বলেছ। তাই হবে। আর ফর্মুলা হয়ে থাকলে কার, তা-ও আন্দাজ করতে পারছি।’

‘কার?’ মুসার প্রশ্ন।

‘ডষ্ট্র আবু নাসের চৌধুরীর নাম শুনেছ?’

‘কোন আবু নাসের, স্যার? বিখ্যাত ফিজিসিস্ট?’ জিজ্ঞেস করল রবিন।

‘শুনেছ তাহলে?’

‘শুনব না কেন? পত্রিকা আর টিভির কল্যাণে বিখ্যাত এই বাংলাদেশী বিজ্ঞানীকে কে না চেনে। এক সাংঘাতিক আবিষ্কার করে বসেছেন তিনি। ম্যাটার ট্র্যাপমিট করার পদ্ধতি। এর উন্নতি হলে মানুষকেও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্র্যাপমিট করে দেয়া যাবে। সৌরজগতের যে কোন গ্রহে তখন চলে যাওয়াটা কিছুই না মানুষের জন্যে। এমনকি আমাদের সৌরজগতের বাইরেও চলে যেতে পারবে। শুও-বদমাশের হাতে এই জিনিস পড়লে ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়ে যাবে। পুরো পৃথিবীর মানচিত্র বদলে দেয়া যায় এর সাহায্যে।’

মাথা ঝাকালেন ক্যাপ্টেন। সামনের কাগজগুলোর দিকে তাকালেন অনেকটা ভয়ে ভয়ে, ‘আমার বিশ্বাস, এটাই সেই ফর্মুলা,’ টেবিলে রাখা যেন আর নিরাপদ নয়, এমন ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি চুকিয়ে রেখে দিলেন ড্রয়ারে। ‘দুই মাস আগে থানায় ডায়েরী করিয়েছেন ডষ্ট্র চৌধুরী—তাঁর একটা মহাম্যবান ফর্মুলা চুরি হয়ে গেছে বলে। অস্ত্রির হয়ে আছেন। হল্যে হয়ে খুঁজেছে কিছুদিন পুলিশ, বের করতে পারেনি। তিনি নিজেও খুঁজেছেন অনেক। এটা যদি সেই ফর্মুলাই হয়ে থাকে, তাহলে একটা কাজের কাজই করেছ তোমরা।’

‘কিন্তু এটা যে তাঁরই ফর্মুলা, শিওর হলেন কি করে?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘এখনও হইনি, এসব জটিল জিনিস তো আর বুঝি না। তবে হব। ফোন করছি ডষ্ট্রকে।’

রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন ক্যাপ্টেন। কথা বললেন। লাইন কেটে দিয়ে রিসিভার রাখতে রাখতে হাসিমুখে বললেন, ‘এখনই রওনা হচ্ছেন তিনি। বিশ মিনিটেই পৌছে যাবেন।... তোমরা শুধুমুখে বসে না থেকে কোক খাও। আনাই?’

কারোরই আপত্তি নেই।

ঠিক বিশ মিনিটের মাধ্যায় ঘরে ঢুকলেন ড. চৌধুরী।

রবিন বলেছে, পত্রিকা আর টিভির দোলতে ডষ্ট্র কারও অচেনা নন, কিন্তু মুসাই কখনও তাঁর ছবি দেখেনি, চিনত না। সে ভেবেছিল এতবড় বিজ্ঞানী, বয়েস নিচয় সন্তরের কাছাকাছি, গোলাল মুখ, চকচকে টাক, মুখভর্তি দাঙি-গোফ, ভারি লেপের চশমা, কিছুটা পাগলাটে স্বত্বাবের এবং দুনিয়া সম্পর্কে উদাসীন—জিনার

বাবার মত।

কিন্তু তার কল্পনার সঙ্গে কিছুই মিল না। ঘরে যিনি চুকলেন, বড়জ্জোর পেয়াজিশ-ছাঁচিশ বয়েস হবে তাঁর, লম্বা, সুন্দরীন, ক্লিনশেভ্ড, মাথায় চুলের অভাব নেই, চোখে দামী সানগ্লাস, সিনেমার হিরো বলে চালিয়ে দেয়া যাও অনায়াসেই। পাগলাটেও নন, বদমেজাজীও নন।

উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন, 'আসুন, ডষ্টর, আসুন।' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

হাত মেলালেন ড. নাসের। চেয়ারে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফর্মুলাটা কোথায়? দেখিয়ে আশো নিশ্চিন্ত করুন, তারপর কথা।'

ড্র্যাইর থেকে কাণ্ডজন্তুলো বের করে দিলেন ক্যাপ্টেন।

মৃত প্রতিটি পাতায় একবার করে চোখ বোলালেন ড. নাসের। হাসলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই আছে। পেলেন কোথায়?'

ইঙ্গিতে গোয়েন্দাদের দেখালেন ক্যাপ্টেন, 'এরা খুঁজে বের করেছে।'

সংক্ষেপে সব জানালেন ডষ্টরকে।

মাঝখানে একটিও কথা না বলে চুপচাপ সব শুনলেন ডষ্টর। তারপর হাসিমুখে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরাই তাহলে তিন গোয়েন্দা। দেখা হয়ে ভাল হলো। শুধু আমার নয়, সমগ্র মানবজাতির একটা মন্ত্র উপকার করলে তোমরা।' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

হাত মেলাতে মেলাতে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আমাদের নাম শনেছেন, স্যার?'

'শনেছি। ভালমত শনেছি। তোমাদের কোন কাহিনীই আমার অজানা নেই, অস্তত বই যে কটা বেরিয়েছে। বেরোলেই বাংলাদেশ থেকে পাঠিয়ে দেয়া হয় আমার নামে।'

এত বড় একজন বিজ্ঞানী 'তিন গোয়েন্দা' পড়েন শুনে হাঁ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

সেটা বুঝতে পেরে মুচকি হেসে বললেন ডষ্টর, 'কি মনে করো তোমরা, বিজ্ঞানী হলেই বুঢ়ো হতে হবে, আধিপাগলা হতে হবে, বিজ্ঞান ছাড়া দুনিয়ার আর কোন খবর রাখবে না? ভুলটা এবার ভাঙা উচিত তোমাদের। না বলে পারছি না, আমি একজন অ্যাডভেঞ্চরার, বিগ গেম হাটার, বিগ ফিশ হাটার, প্রদ্রুতাত্ত্বিক, এবং বিজ্ঞানী। আরও বলি? ছেটাবেলা থেকেই রহস্যের প্রতি অদ্যম্য আকর্ষণ আমার, কিশোর, তোমার মত নেশাই বলতে পারো। আমি তিন গোয়েন্দা পড়ব না তোকে পড়বে?'

ধাক্কাটা সামলাতে কিশোর পাশারও সময় লাগল। বলল, 'আরও আগেই আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত ছিল স্যার, আমাদের। আপনার নাম শনেছি, তিভিতে চেহারাও দেখেছি, কিন্তু শুই বিজ্ঞানী হিসেবে। আরও এতসব শুণ আছে আপনার জানলে, সত্যি বলছি, যত কঠোর প্রহরায়ই থাকতেন, আমাদের ঠেকাতে পারতেন না। ঠিকই শিয়ে হাজির হতাম আপনার দুর্ঘে।'

হাসলেন ডষ্টর। 'খুব সুন্দর করে কথা বলো তুমি, কিশোর। আসলে আমারও অন্যায় হয়েছে। জানি রকি বীচে থাকো, বাংলাদেশী, তোমার গোয়েন্দাগিরিও

আমার ভাল লাগে, একদিন শিয়ে দেখা করে আসা উচিত ছিল।'

'তাতে কি, স্যার? দেখা তো হয়েই গেল।'

'বরং এভাবে দেখা হওয়াটাই ঠিক হয়েছে,' হেসে বললেন ক্যাপ্টেন—**বুব** উপভোগ করছেন তিনি এক অসাধারণ বিজ্ঞানী আর তিনি গোয়েন্দার কথাবার্তা। 'বুব নাটকীয় হয়েছে।'

সবাই একমত হলো সে-ব্যাপারে।

'আরও ভাল হত,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'যদি চোরগুলোকে পাকড়াও করতে পারতে। তবে ছাড়ব না আমি, ব্যাটাদের ধরবই।'

রহস্যময় হাসি হাসল কিশোর। 'শেষ কথাটা বলা হয়নি আপনাকে, স্যার।'

'শেষ কথা মানে?'

'ব্যাটাদের ধরার ব্যবস্থা করেই রেখে এসেছি। দড়ি বেয়ে গুহায় নেমেছে বটে ওরা, কিন্তু আর বেরোতে পারবে না।'

ভুক্ত কুঁচকে গেল ক্যাপ্টেনের, 'পারবে না কেন! দড়ি বেয়ে আবার উঠে চলে যাবে।'

'পারত, সেই দড়িটা যদি থাকত জায়গামত তাহলে। খোপের মধ্যে বসে দেখছিলাম আমি। তিনজনে নেমে গেল। বৌরিয়ে শিয়ে দড়িটা তখন তুলে ফেললাম। এমন জায়গায় ফেলে এসেছি ওটা, অলৌকিক ভাবে ডানা গজিয়ে যদি বেরিয়ে আসতে পারে ওরা, তাহলেও খুঁজে পাবে না।'

কিশোর থামতে রাবিন বলল, 'বেরোনোর আরেকটা যে পথ আছে, ঝর্নাৰ পাড়ের সুড়ঙ্গমুখ, সেটাও বন্ধ করে এসেছি বিরাট পাথর দিয়ে। সারা জনম ধরে ঢেললেও ওটা সরাতে পারবে না ব্যাটারা।'

'ভুলে যাছ, একজন বেটিও আছে তাদের সঙ্গে,' সংশোধন করে দিল মুসা।

দীর্ঘ একটা মৃহূর্ত নীৰব হয়ে রাইলেন ক্যাপ্টেন। হাসি ফুটতে শুরু করল মুখে। বাড়তে বাড়তে হা-হা হাসিতে রূপ নিল সেটা। বললেন, 'তোমরা সত্যি একেকটা রত্ন!... বোসো, আরেকটা করে কোক খাও, কেক খাও, ততক্ষণে আমি লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করি। ব্যাটাদের ধরে নিয়ে আসুক।'

বিজ্ঞানীও হাসছেন। বললেন, 'আমি তাহলে যাই। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।'

'এক মিনিট, ডেক্টর। একটা রেজিস্টার সই করতে হবে।'

যাওয়ার আগে ডেক্টর বললেন তিনি গোয়েন্দাকে, 'এসো না একদিন, চলে এসো আমার ওখানে। অনেক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শোনাব। তোমাদের ভীষণ অরণ্য কিংবা অদ্যুত সাগরের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয় সেগুলো।'

একটা কার্ড বের করে দিলেন তিনি। তাতে লেখা ছিকানাটা পড়ল কিশোর:

ড. আবু নাসের চৌধুরী

ডি঱েক্টর: গুয়াহাটী অ্যাটমিক সেন্টার

ডিয়ার ক্রীক

লস অ্যাঞ্জেলেস।

'আসার আগে কষ্ট করে একটা ফোন করে নিয়ো আমাকে,' আবার বললেন আলোর সঙ্গেত

তিনি। 'তাহলে আর চুক্তে অসুবিধে হবে না তোমাদের।'

অবশ্যই যাবে, কথা দিল কিশোর। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ডও দিল ডষ্টেরকে।

'এই তাহলে তোমাদের সেই বিখ্যাত কার্ড।' যত্ন করে কার্ডটা নিজের ব্যাগে রেখে দিলেন ডষ্টের। চিতাকে দেখিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা তোমাদের চার নম্বর গোয়েন্দা হতে যাচ্ছে নিচয়?'

'ভাবছি, স্যার,' বলল কিশোর। 'দেখি, কি করা যায়।'

সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডষ্টের।

চোরগুলোকে ধরে আনতে লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করতে অফিস ছেড়ে বেরোলেন ক্যাষ্টেন।

তাঁর ঘরে বসে আরেক প্রস্তু কোক আর কেক চালাল তিন গোয়েন্দা।

ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসলেন ক্যাষ্টেন, 'ফোর্স রওনা করিয়ে দিয়ে এলাম।'

'আমরা তাহলে উঠি, স্যার। তাদের ফিরে আসতে তো কয়েক ঘণ্টা লাগবে। কি হলো, পরে ফোন করে জেনে নেব।'

'ফোন আয়িছ কৰব। চোরগুলোকে শনাক্ত করতে হবে' তোমাদের। আদালতে সাক্ষিও দেয়া লাগতে পারে।'

চেয়ার থেকে উঠল ছেলেরা।

আজুল তুললেন ক্যাষ্টেন, 'ও হ্যাঁ, ভাল কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম। রনি-ডনিকে কি করেছ?'

'ডাক্তারখানায় পৌছে দিয়ে এসেছি। ডাক্তার বললেন, তেমন কিছু হয়নি রনির পায়ে, সেরে যাবে।'

'গুড়।'

ধানা থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে চিতা।

মুসা বলল, 'সব তো ভালয় ভালয় সারল, এখন কুভাটাকে নিয়েই চিতা।'

'কোনো চিতা নেই,' কিশোর বলল। 'প্রথমে যাব তোমাদের বাড়িতে। আন্তির হাতে-পায়ে ধরব। রাজি করাতে না পারলে মুখ কালো করে বেরিয়ে আসব, তাঁকে দেখাব যে আমরা ভীষণ অসম্ভৃত হয়েছি। তিন-তিনটে ছেলেকে অবৃশি করে খুশি হওয়ার মত মনের জোর যদি তাঁর থাকে, ভাল কথা। মাপ করে দেব। বাড়িতে কুভা জায়গা দেয়ার বিরক্তি আর সহ্য করতে হবে না তাঁকে। তারপর গিয়ে চাটীর ওপর চড়াও হব। ভাল ভাবে রাজি হলে হলো, না হলে আজই চুরি হবে স্যালভিজ ইয়ার্ডে।'

'তিন গোয়েন্দা থেকে তিন চোর?' হাসল রবিন।

'হলো না। তিন গোয়েন্দা ইকুয়ালটু তিন চোর।'

হা-হা করে হেসে উঠল তিনজনে। না না, চারজন। চিতাও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। তবে তার হাসির শব্দটা অন্য রকম, অনেকটা মানুষের কাশির মত: খুফ! খুফ!
